# কেয়াবাৎ মেয়ে

শ্রীপান্থ

*কেয়াবাৎ-মেয়ে মানে—শাবাশ মেয়ে। বাহাদুর মেয়ে। নব্যকালের নতুন নায়িকা সে। যে মেয়েরা সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত নিত, আদর করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দিত, এ-মেয়ে তাদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। যেমন সাজপোশাকে তেমনই চালচলনে। বাঙালি বলে যেন চেনাই যায় না।*

সাতটি নিবন্ধে আসলে সাতটি নারী, মানে সাতটি প্রতীক, সাত রকমের জীবন এবং যন্ত্রণা, একটি সমাজ ও কয়েকটি সময়কে ধরার জন্য সাত-সাতটি প্রেক্ষিত। সমাজ-উত্তরণের সাতটি ছবি শ্রীপান্থর বিশ্লেষণী কলমে।

স্কুল-কলেজে পড়া উনিশ শতকের নতুন বাঙালি মেয়েদের আবির্ভাব এবং সাবেক সমাজের ভারী পশমের পর্দা ভেদ করে তাদের বাইরে বেরিয়ে আসার রোমাঞ্চকর উপাখ্যান যেমন, ধরা যাক, 'কেয়াবাৎ মেয়ে' রচনায়, সমাজের মধ্যে অন্য সমাজের অন্য ধরনের নারীজীবনের রূপালেখ্যও ধরা আছে অন্যান্য নিবন্ধে। যে-রকম একটি রচনা 'কালাবিবি'। এদেশের মেয়ে যখন ঘর করছেন সফেদ সাহেবের সঙ্গে তখন তাঁর প্রাপ্ত জীবন ও জগৎ।

কিন্তু মেয়েদের নিয়ে এইসব সমাজ-ঐতিহাসিক রচনা শুধু সেকালের নারীকেই বিস্মিত করে না, করে তাদের নিজস্ব পুরুষ, পরপুরুষ এবং পার্শ্বস্থ পুরুষকেও। কিশোরী-ভজনার অধিকার নিয়ে যে পুরুষসমাজ এককালে সভা ডেকেছিল ময়দানে মনুমেন্টের তলদেশে। পটের বিবিদের নিয়ে রচনায় পট, পটুয়া ও পটস্থ পটীয়সীদের পাশাপাশি লেখক তুলে ধরেন বিবিদের দ্বারা আমোদিত, আলোড়িত বাবুদের বাড়ি ও বাগানবাড়ির পটভূমিকাও। লেখক লিখেছেন ধবলাঙ্গী, ধূম্রকেশী বিদেশিনীদের জন্য উন্মাদ ভারতীয় যুবসমাজের কথা। প্রশ্ন তুলেছেন অন্যত্র— বাঙালি শিল্পীদের মধ্যে সিক্তবসনা সুন্দরী আঁকার রেওয়াজ প্রচলিত হল কেন? লেখকের অসংখ্য কৌতূহলের মধ্যে একটি— কালীঘাট পটের ওই সুন্দরীরা কারা? বাঙালি বাবুদের মধ্যে ইউরোপীয় মর্মর সুন্দরীদের জন্য ওই ব্যাকুলতা, কেন?

বর্তমান গ্রন্থটি একটি সপ্তপর্ণী শাখালতা। যেখানে সাতটি প্রসঙ্গের আধারে সাত-সতের চিন্তাভাবনা। বহু প্রশ্ন, বহুতর উত্তরের উদ্যোগ। বাঙালির মনোজগতের আলোছায়ার একটি চিত্রপ্রতিবেদন। যে বর্ণাঢ্য রচনাকে রোমাঞ্চকর করেছে দুষ্প্রাপ্য সব ছবি।

বাংলা ভাষায় এ-হেন একটি গ্রন্থও অদৃষ্টপূর্ব।

ISBN 978-81-7066-126-9

# কেয়াবাং মেয়ে

## শ্রীপান্থ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

এ-বইয়ের সব কয়টি রচনাই প্রকাশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। প্রথমটি আনন্দবাজারের বার্ষিক সংখ্যায়, শেষটি রবিবাসরীয় বিভাগে। বাদবাকি শারদীয়া আনন্দবাজারে। শেষ রচনাটি অবশ্য অনেক সম্প্রসারিত। অন্য সব কয়টি রচনাই হু-বহু পুনর্মুদ্রিত। ইচ্ছে থাকলেও নতুন করে লেখার বা সম্পাদনার সময় এবং সুযোগ ছিল না। ফলে কোথায়ও কোথায় পুনরুক্তি রয়ে গেল। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সাতটি রচনার মধ্যে মিল একটাই, সবই মহিলাদের নিয়ে লেখা। অন্যভাবে বললে ঔপনিবেশিক আমলের মেয়েদের নিয়ে। সাধারণভাবে উনিশ শতকের বাঙালি 'ভদ্রমহিলা'দের প্রসঙ্গই বইয়ের অনেকখানি জুড়ে আছে। তবে কোনও কোনও লেখায় অন্য এলাকার ভারতীয় মহিলারাও এসেছেন। এসেছেন ঔপনিবেশিক আমলে নরনারীর সম্পর্কে যেসব সমস্যা বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা তারই রূপরেখা স্পষ্টতর করার তাগিদে। এ-বই অবশ্যই নারী-প্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস নয়। গত দুই শতকের কয়েকটি খণ্ডচিত্র। সবগুলো মিলিয়ে দেখলে সেকালের ভাবলোকের একটা আভাস মিলে, এই যা। উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের নিয়ে ইতিমধ্যে বিস্তর লেখা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। এ-বইয়ের কয়েকটি বিষয় বোধহয় কিঞ্চিৎ নতুন। প্রধানত মুদ্রিত পুথি পুস্তকের ভিত্তিতে লেখা হলেও পুরানো বিষয়গুলোও দেখার চেষ্টা করা হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে। চেষ্টা ছিল বিরোধীদের বক্তব্যের আলোকে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলনগুলির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা। সফল কি বিফল জানি না। যে-সব বইপত্রের ওপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে হয়েছে, রচনায় সেগুলি উল্লেখিত। সুতরাং স্বতন্ত্র কোনও গ্রন্থপঞ্জি যুক্ত হল না। পরিবর্তে যুক্ত হল বিশদ চিত্রতালিকা।

বইটি প্রকাশযোগ্য করার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন নবীন সহকর্মী অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিক প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন আর এক সহকর্মী অধীর বিশ্বাস। নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন কমলেন্দু সরকার। তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ। গ্রন্থের রূপসজ্জার কৃতিত্ব আদ্যোপান্ত বিপুল গুহের। সহযোগিতা করেছেন সন্তোষ দত্ত। প্রাক-মুদ্রণ পর্বে বিশেষ কারিগরি নৈপুণ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রথীন দত্ত। ধন্যবাদ তাঁদেরও।

১ বৈশাখ, ১৩৯৫

শ্রীপান্থ

ছবি দিয়ে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন :
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, রূপনারায়ণ শাস্ত্রী, সিদ্ধার্থ ঠাকুর, নীহার চক্রবর্তী
অভীক সরকার, সেবতি মিত্র, পারমিতা বিশ্বনাথন, শীতল চৌধুরী
রবীন্দ্র ভারতী সোসাইটি, পার্থ বসু, ইন্দ্রনাথ মজুমদার, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, রীনা মুখোপাধ্যায়
মার্বেল প্যালেস, জয়ন্ত বাক্‌চি, অমিত রায়, সুরেশ নেউটিয়া, সুনীল বন্দোপাধ্যায়
এবং প্রকাশ কেজরিওয়াল ।

প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৮৮
ষষ্ঠ মুদ্রণ মে ২০১৯



ISBN 978-81-7066-126-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপিও সেক্টর ৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

KEYABAT MEYE
[Social History]
by
Sripantha

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

৬০০,০০

প্রিয় শিল্পী মীরা মুখোপাধ্যায়কে

# কেয়াবাৎ মেয়ে

কেয়াবাৎ-মেয়ে মানে—সাবাস মেয়ে। বাহাদুর মেয়ে। নব্যকালের নতুন নায়িকা সে। যে মেয়েরা সাঁজ-সেঁজুতির ব্রত নিত, আদর করে পিঁড়ি পেতে অন্ন দিত, এ-মেয়ে তাদের থেকে পুরোপুরি আলাদা। যেমন সাজপোশাকে তেমনই চালচলনে। বাঙালি বলে যেন চেনাই যায় না।

কেয়াবাৎ-মেয়ের সঙ্গে আমাদের প্রথম যখন দেখা হয় তখন সে সেজেগুজে দাওয়ায় মোড়ার উপর বসে আছে। হাতে একখানি চিঠি। বিড় বিড় করে সে বলছে—"আহা, বাগবাজারের রসগোল্লার ন্যায় তাঁর পত্রখানি রসে চোবানো, বোধহয় পত্রখানি নিংড়ালে টস টস রস পড়ে।..." অচিরেই বোঝা যায় চিঠিটি প্রেমপত্র। পয়ারে সেটি লিখে পাঠিয়েছে কেয়াবাৎ-মেয়ের "প্রেমের আপিসের উমেদার, চিরদাস বিশ্ববখা সাধু খাঁ।"

এদের পরিচয় দরকার। তার আগে শ্রীমান সাধু খাঁর প্রণয়িনীটির দিকে একবার তাকানো যাক্। গরানহাটার শিল্পীরা আমাদের জন্য তার একখানা প্রতিকৃতি রেখে গেছেন। অলঙ্কৃত একখানি উডকাট। ফুলের তোড়া হাতে পালঙ্কে বসে আছে কেয়াবাৎ-মেয়ে। সামনে একটি তেপায়া। তাতেও ফুল। একপাশে ভারী পর্দা ঝুলছে। যেন থিয়েটারের কোনও দৃশ্য। কেয়াবাৎ-মেয়ে যেন আসলে কোনও থিয়েটারওয়ালী।

আমার মনে হয়, কালীঘাটের পটুয়ারা ওর যে ছবি রেখে গেছেন সেটি অনেক বেশি জীবন্ত। বব-করা কালো চুল। ডাগর ডাগর চোখ। টুসটুসে গাল। কানে মস্ত দুটি রিং। গায়ে আটসাঁটো জ্যাকেট। (কবির ভাষায়—'বডি-আঁটা-বুক বঁধু! বি,এ'র বন্দিতা তুমি!') পটুয়ারা নাকি সে নায়িকার নাম রেখেছিলেন—'জুম্পা'। নাকি চম্পা?

নামে কিছু আসে যায় না। আমাদের বটতলার এই কেয়াবাৎ-মেয়ের নাম মালতীমঞ্জরী। সে মেদিনীপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ জলধর ঘোষালের মেয়ে। তবে জয়নারায়ণের ছোট ভাই গুলিখোর ন'কড়ি ঘোষাল বলে—মালতী নাকি আসলে ওদের গাঁয়ের পাঁচী ধোবানির পেটের মেয়ে। জয়নারায়ণ তাকে শহরে এনে মানুষ করেছেন এই আশায় যে, বিয়ের সময় সুদে আসলে সব আদায় করে নেবেন। বস্তুত বাড়িতে ঘটকের আনাগোনাও চলেছে। সেদিন পাকা কথাও হয়ে গেছে। মালতীর দর ঠিক হয়েছে নগদ পাঁচ শ' টাকা। সে খবর নিয়ে কাকা ন'কড়ি বাড়িতে ঢুকেই দেখে মালতী চিঠি পড়ছে আর বিড় বিড় করছে: তিনিই এখন আমার প্রাণের গোবর ও প্রেমরূপ পিঁজরার বুলিধরা হিরেমন। কবে যে সোহাগের বাটিতে প্রেমের ছাতু মেখে দেবো তা বলতে পারি না। আমার পিতা একজন ঘোর মূর্খ ও এক নম্বরের খাঁটি অসভ্য। আমার অন্তরের উচ্চভাব বোঝবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। উলুবেড়ের হাটে পাইকেরে যেমন গরু বেচে, তেমনি তিনি

১· স্বামী ভক্তি বা পাতিব্রত্য চিত্র। এক সময় অনেক ঘরেই শোভা পেত এ ধরনের ছবি।

আমাকে বিক্রয় করে কিছু টাকা সংগ্রহ কর্ত্তে ইচ্ছা কচ্চেন, কিন্তু তাঁহার এই পাপ-বাসনা কিছুতেই পূর্ণ হবে না। কারণ আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে তিনি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন। এখন আমাদের চোখ-কান ফুটেছে, লজ্জা-সরম দুপুরে লোচ্চার মতন মুখে কাপড় দিয়ে সরে পড়েচে, ভাল ভাল নভেল পড়ে হৃদয়ক্ষেত্রে প্রেমের কলা গজিয়েছে, কালক্রমে মনের মত মানুষ মিলেচে, সুতরাং আর কি রক্ষা আছে! অচিরকাল মধ্যে বিশ্ববখারূপে স্যাওড়া গাচে আমি রূপ পেত্নি বিচরণ করিব। আমার বাবার তিন চোদ্দং বাহান্ন পুরুষ এলেও এর এক চুলও অন্যথা কর্ত্তে পার্ব্বে না।...

এ মেয়েটিকে হয়তো একালের পাঠক-পাঠিকারা স্কুল-ফেরা, নভেল-পড়া মেয়ে বলে গ্রহণ করতে চাইবেন না। তার কথাবার্তায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিহ্নমাত্র নেই। অবশ্য তার জন্য মালতীকে দায়ী করা ঠিক হবে না। সে কৃতিত্ব জনৈক পঞ্চানন রায়চৌধুরীর। "কেয়াবাৎ-মেয়ে"র তিনিই সৃষ্টিকর্তা। ১১০ নং চিৎপুর রোড গরাণহাটা ভিক্টোরিয়া পুস্তকালয় থেকে ছোট্ট এই প্রহসনটি প্রকাশ করেছিলেন অবশ্য রামলাল শীল। সে প্রায় চুরাশি বছর আগেকার কথা। বিশ শতকে পা দিয়েছে কলকাতা তবু কিছুতেই যেন ভোলা যাচ্ছে না উনিশ শতকের সেই দিনগুলো। ক্ষমা করা যাচ্ছে না লেখাপড়া-শেখা সেই মেয়েগুলোকে। কেয়াবাৎ-মেয়েকে।

কেয়াবাৎ-মেয়ে মালতী যখন প্রেমিকের চিঠি হাতে এসব আকাশ-পাতাল ভাবছে আর 'উহু মরি রাগিণী'তে 'জ্বলে মলুম' তালে গাইছে 'পিরীতের এমন ঠেলা কে জান্তোরে বাপ' তখন কাকা এসে খবর দিলেন বিয়ে কিন্তু পাকা। খবর শুনে মালতী মূর্চ্ছা গেল। অবশ্য ভান মাত্র। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বাবা আর
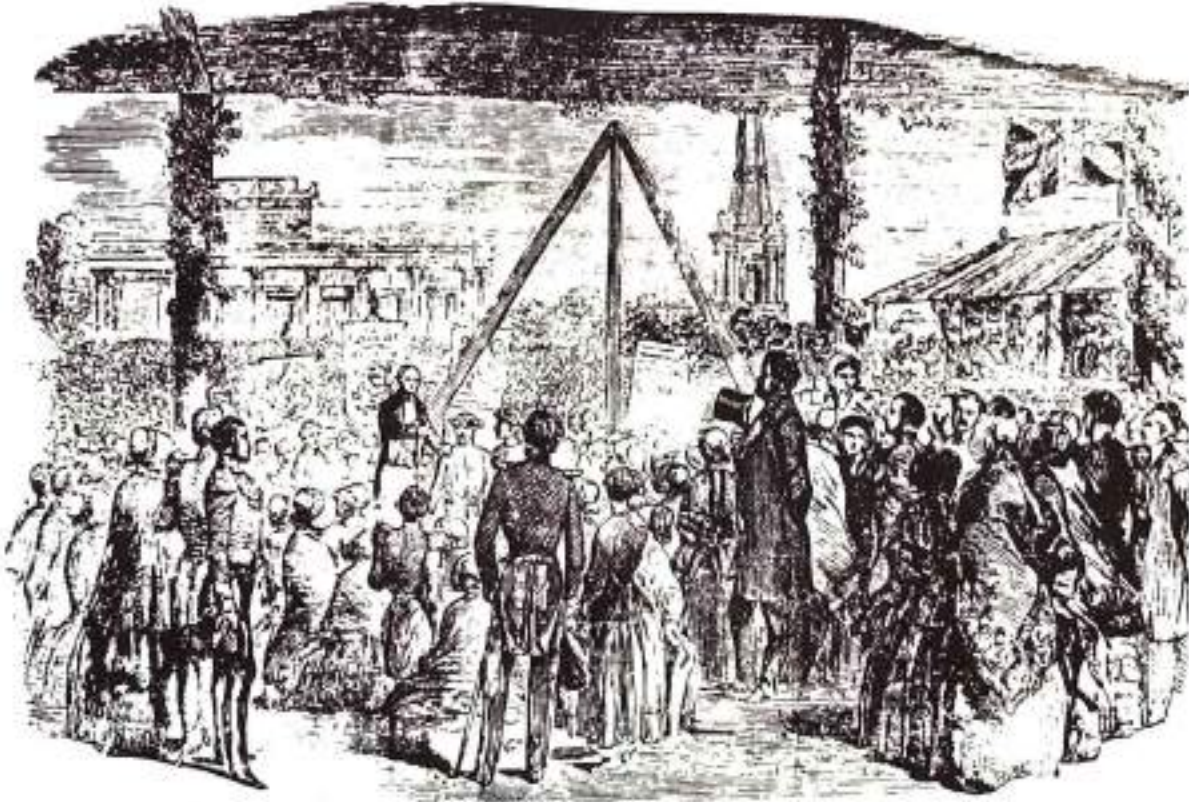


২. 'কেয়াবাৎ মেয়ে' প্রহসনের নায়িকা। বটতলার শিল্পীর চোখে।
৩. বেথুন স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : ১৮৫০।

কাকা ডেকে নিয়ে এল রোজাকে। কেন না, মেয়েটি 'পাঁচ শ' টাকার তোড়া'। একশ' টাকা বায়না পর্যন্ত নেওয়া হয়ে গেছে!

রোজা এসে খ্যাংরা নিয়ে কাজ শুরু করল। কিন্তু ভূত কিছুতেই সরতে চায় না। রোজা তখন বলছে: আরে মলো, এটা নবেলি ভূত, এই কচি মেয়েটাকে পেয়ে বসেচে। আজকালের দিনে এই শ্রেণীর ভূতের উপদ্রব বড় বেশী হয়েচে। সেইজন্য অনেক সংসারের সুখ-শান্তি প্রায় দশ হাত অন্তরে গিয়ে দাঁড়িয়েচে। কোনও পাকা রোজা এসে সহর থেকে এ-ভূতকে একেবারে না তাড়ালে আর ভদ্রস্থ নাই। স্ত্রী-শিক্ষা সুখের বিষয়, উন্নতির চিহ্ন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু একছিটে দম্বলে যেমন এক কলসী দুদ মাটি হয় তেমনি মাটির গুণে গুণ দোষে পরিণত হয়েচে।...

রোজা রীতিমত একজন নীতিবাগিশ বক্তা। মালতীকে খেংরাপেটা করতে করতে সে বলছে: আপনাদের কোনও ভয় নেই। আজ-কালের বাজারে ঘরে ঘরে এ-রকম ভূতের উপদ্রব। আমি মুড়ো খেংরা দিয়ে ঝাড়িয়ে অনেক ভূতে-পাওয়া মেয়েকে ভাল করেছি। কচি কচি মেয়েদের সৎ গ্রন্থের পরিবর্তে, জঘনা প্রণয়রসে পরিপূর্ণ নীতিবর্জ্জিত ইংরাজী ছাঁচে ঢালা নবেলনামা পুস্তক পাঠ কর্ত্তে দিলে তাদের ঘাড়ে এই রকম ভূতে এসে সোয়ার হয়। এইরূপ অপশিক্ষার বিষময় ফল স্বচক্ষে দেখেও লোকে যে সাবধান হয় না, হিন্দু ধর্মদ্বেষিণী; মায়াবিনীবিশেষ মেমদের করে নয়নপুতলি-সদৃশি তনয়াদের শিক্ষার ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়, ইহাই সমধিক বিস্ময়ের বিষয়।

মেয়ের বাবার উক্তি: আমিও বাবা ঝকমারি করে মেম রেখে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলুম। শেষে

৪. বাবুর হাতে পানপাত্র, বিবির হাতে গোলাপ। কালীঘাটের রেখাচিত্র।
৫. সনাতনপন্থীদের ব্যঙ্গের আর উপলক্ষ, 'মডেল ভগিনী'র নায়িকা কমলিনী।

কমলিনী. ও নগেন্দ্রনাথ

৬ কমলিনী ও নগেন্দ্রনাথ । 'মডেল ভগিনী'র একটি দৃশ্য ।

এমন হবে জানলে কখন তেমন কাজ কর্ত্তুম না । বাবা, মেয়ে লেখাপড়া শিখলে তাকে ভূতে পাবে তা কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি । এই আমি নাক-কানে মোচড় দিচ্ছি, আর কখন এমন ঝকমারি কাজ কর্বো না ।...

ভূত তখনকার মত নামল বটে । তবু কিন্তু শেষরক্ষা হল না । তৃতীয় অঙ্কে আমরা দেখি, গোলদিঘির একটি বেঞ্চে পুরুষবেশে মালতী বসে আছে । সঙ্গে বাড়ির পরিচারিকা মঙ্গলা । তারা বিশ্ববখার জন্য অপেক্ষা করছে । ও-দিকে খুঁজতে খুঁজতে বাবা কাকা এসেও হাজির । পাহারাওয়ালারও ডাক পড়েছিল । মালতীকে তবু আটকানো গেল না । সে বলছে : আমি সমগ্র জগৎ সমক্ষে আয়েষার ন্যায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে এই যুবকরত্ন আমার প্রাণেশ্বর । ইহার পরে আমি মনপ্রাণ জীবন-যৌবন সমর্পণ করেচি । আমি আমার সেই প্রিয়তমের সঙ্গে গমন কচ্চি, কার সাধ্য যে আমার গতিরোধ করে । লেখাপড়া শিখে আমাদের হৃদয়ে যথেষ্ট নৈতিক বলের সঞ্চার হয়েচে । অতএব পিতা ও কাকা, তোমাদের গুডবায় । চলুন প্রিয়তম, আমারা হানিমুন ভোগ করি গে !

বিশ্ববখার হাত ধরে মালতী চলে গেল । প্রহসনের যবনিকা টানল কাকা নকুড় :

"ছোঁড়া সেজে চলে গেল
ছোঁড়া সঙ্গে নিয়ে ।
কেয়াবাৎ-মেয়ে দাদা,
কেয়াবাৎ-মেয়ে ॥

সন্দেহ নেই, অতি নীচুস্তরের প্রহসন 'কেয়াবাৎ-মেয়ে' । স্থূল, নীরস, কৃত্রিম । তবুও পড়তে পড়তে তারিফ করতে হয় ওঁদের রণকৌশলের । আমরা সবাই জানি, উনিশ শতকের প্রথম দিকে এ-দেশে আধুনিক স্ত্রী-শিক্ষার যখন সূচনা তখন তার সপক্ষে যেমন অনেকে, ঠিক তেমনই বিপক্ষেও অনেকে । কেয়াবাৎ-মেয়ের লেখক স্পষ্টতই শত্রুপক্ষের । এই যুদ্ধের পটভূমিটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় ।

এদেশে প্রথম মেয়েদের জন্য নিয়মিত স্কুল খোলা হয় ১৮১৯ সনে । খুলেছিলেন মিশনারীরা । বাঙালির উদ্যোগে প্রথম মেয়ে স্কুল বারাসতের বিদ্যালয় খোলা হয় ১৮৪৭ সনে । বেথুন স্কুলের অঙ্গনে লেডি সিটলার অশোক চারাটি রোপণ করেন ১৮৫০ সনে । স্কুলের সূচনা অবশ্য আগের বছর । কিন্তু ক'জন ছাত্রী সেদিন ? স্কুল শুরু হয়েছিল তেইশটি মেয়েকে নিয়ে । বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারের ফলে ষোল জন নাকি পালিয়ে যান কয়েক দিনের মধ্যেই । বছরের শেষে অবশ্য ছাত্রীসংখ্যা চৌত্রিশে পৌঁছেছিল । সে স্কুলে পড়তে পয়সা লাগে না, বইয়ের জন্য দাম দিতে হয় না ; এমন কী পালকীও ফ্রি । তবু কী তার অপ্রগতি ! ১৮৬২-৬৩ সনে গোটা রাজ্যে সাকুল্যে মেয়ে স্কুল ছিল ১৫টি, ছাত্রী—৫০৩ জন । তার বেশ কিছুকাল পরে, সরকার যখন মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য পয়সা খরচ করতে রাজী হয়েছেন (১৮৬৯) তখনও দেখি মাত্র ২৩৫১ জন মেয়ে স্কুলে পড়েন । তাও ক'দিনের জন্য আসা-যাওয়া মাত্র । দশ এগারো বছর বয়স হলেই পড়া বন্ধ, ভাবনা—বিয়ে । স্কটিশ মিশনারীরা অবশ্য এ অসুবিধা কাটাবার জন্য একটা ফিকির বের করেছিলেন । ১৮৫৪ সন থেকে তাঁরা বাড়ি বাড়ি মেয়ে পাঠিয়ে মেয়েদের পড়াবার এক প্রকল্প চালু করেন । তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে (১৮৬৩) কেশব সেন এবং উমেশ দত্ত মশাইও একই ধরনের

সংগঠন গড়ে তোলেন। কিন্তু মেয়েদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসতে বসতে পরের দশকও গড়িয়ে গেল। মেয়েরা প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন ১৮৭৮ সনে, বি এ—১৮৮০ সনে, ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন—১৮৮৩ সনে। অবশ্য মাত্র দু'-একজন করে। ১৮৭৯-১৮৮৮ সনের মধ্যে এন্ট্রান্স পাস করেছেন ১২ জন, এফ এ—৬ জন, বি এ—৬ জন। ১৮৮১ সনে নানা স্কুলে পড়ছেন সাকুল্যে ৪১,৩৪৯ জন। অর্থাৎ, প্রতি ৯৭৬ জন মেয়ের মধ্যে একজন মাত্র তখন স্কুলে-পড়া। সম্ভবত আমাদের কেয়াবাৎ-মেয়ে তাদেরই একজন।

স্ত্রীশিক্ষার এই দশার পিছনে একটা কারণ সবাই জানেন, সনাতন সমাজের প্রতিরোধ। মিশনারীদের উদ্যোগের সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট বাঙালি সহযোগিতা করেছিলেন। এগিয়ে এসেছিলেন রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং আরও অনেকে। কিন্তু প্রতিবাদীরাও ছিলেন দলে বেশ ভারী। "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" থেকে তাঁদের প্রচারের কিছু নমুনা শুনলেই বোঝা যাবে তাঁরা কেমন সুকৌশলে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। বইখানি অবশ্য স্ত্রী-শিক্ষার সপক্ষে লেখা। তাতে একটি মেয়ে প্রশ্ন তুলছে : একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখাপড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়, এ কি সত্য কথা ? যদি এটা সত্য হয়, তবে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙা কপাল যদি ভাঙে !

অন্যত্র না পড়ার পক্ষে সে আর এক যুক্তি শোনাচ্ছে। সকলে কহে যে, এই মন্দা ঢেঁটি ছুঁড়ি বেটাছেলের
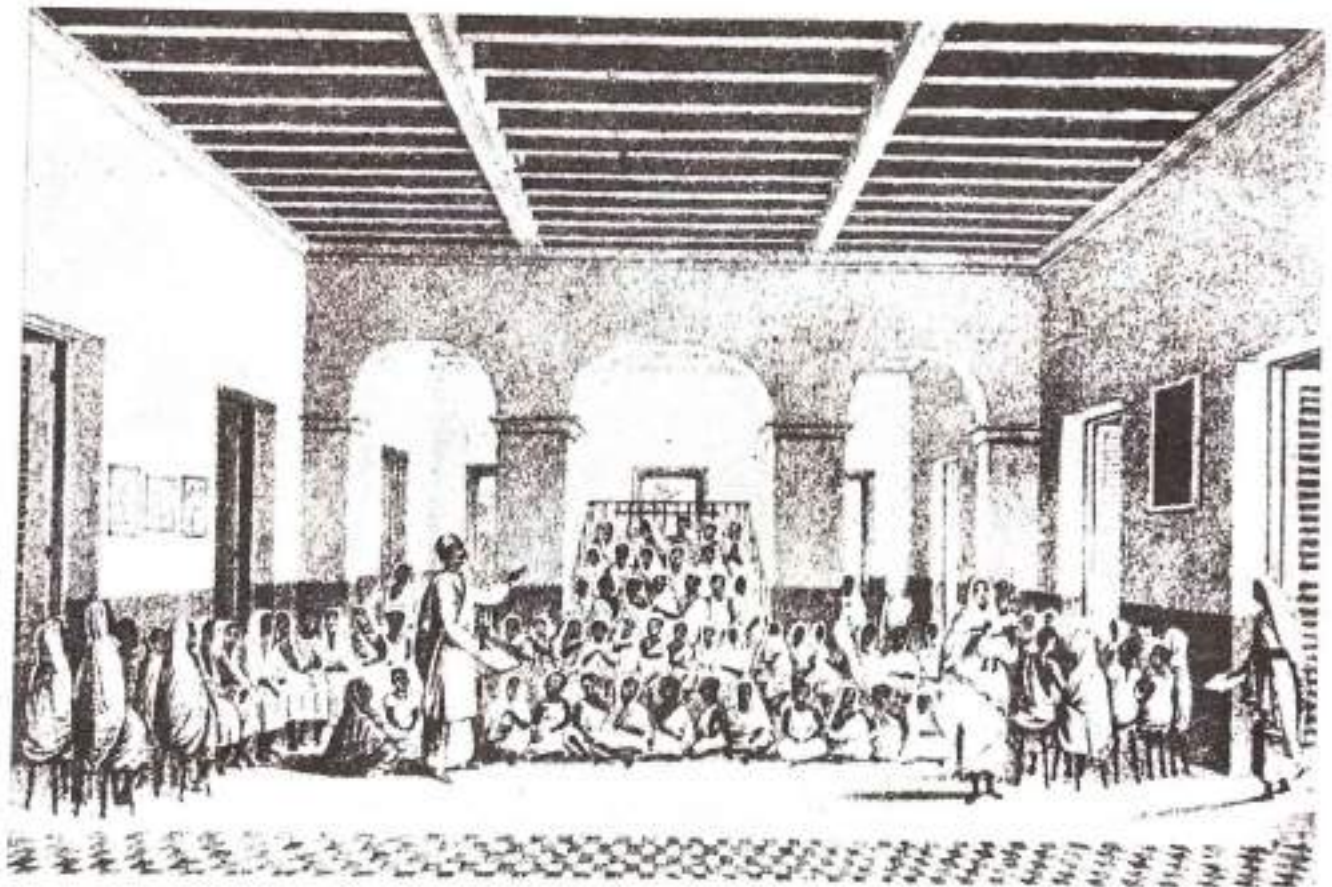
৭. বেথুন স্কুলের আগে। সেন্ট্রাল স্কুলের ভেতরে মেয়েরা পড়ছেন ; ১৮৩৯।
৮. 'পাশকরা মাগ'-এর আখ্যা পত্র। লেখাপড়া জানা মেয়েদের সম্পর্কে বটতলার বক্তব্য সার।

মত লেখাপড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। ইত্যাদি।

১৮৩১ সনে ধর্মসভার মুখপাত্র সমাচার চন্দ্রিকা লিখছে : হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইয়া যে বারাঙ্গণা করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না, যদি কোন ২ বাবু আপন ২ বিবিদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরুমহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন, তথাপি সে-সকল বাবুদিগের আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমরা এমন স্বীকার করি যে, যে পাঠশালায় ঐ বিবিরা পাঠার্থে গমন করিবেন আমরাও রাত্রিকালে বৈকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব।

এই কাগজটির মুখেই শোনা গিয়েছে আরও নানা কুযুক্তি। যথা : বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংগঠনের শঙ্কা আছে, কেন না বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎপুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্পর্ক।...ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে, কেন না রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবে।...

সমসাময়িক কাগজের পৃষ্ঠায় এ-জাতীয় নানা রুচিহীন আলোচনার ছড়াছড়ি। নানা অপপ্রচার, নানা কুৎসা। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যিনি, তিনিও সওয়াল করতে বসে স্বীকার করেন—"নারী জাতির মদন পুরুষাপেক্ষা অষ্ট গুণ প্রবল।" সুতরাং, এতে আর বিস্ময় কী যে, কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখীর "উপাধিপ্রাপ্তি
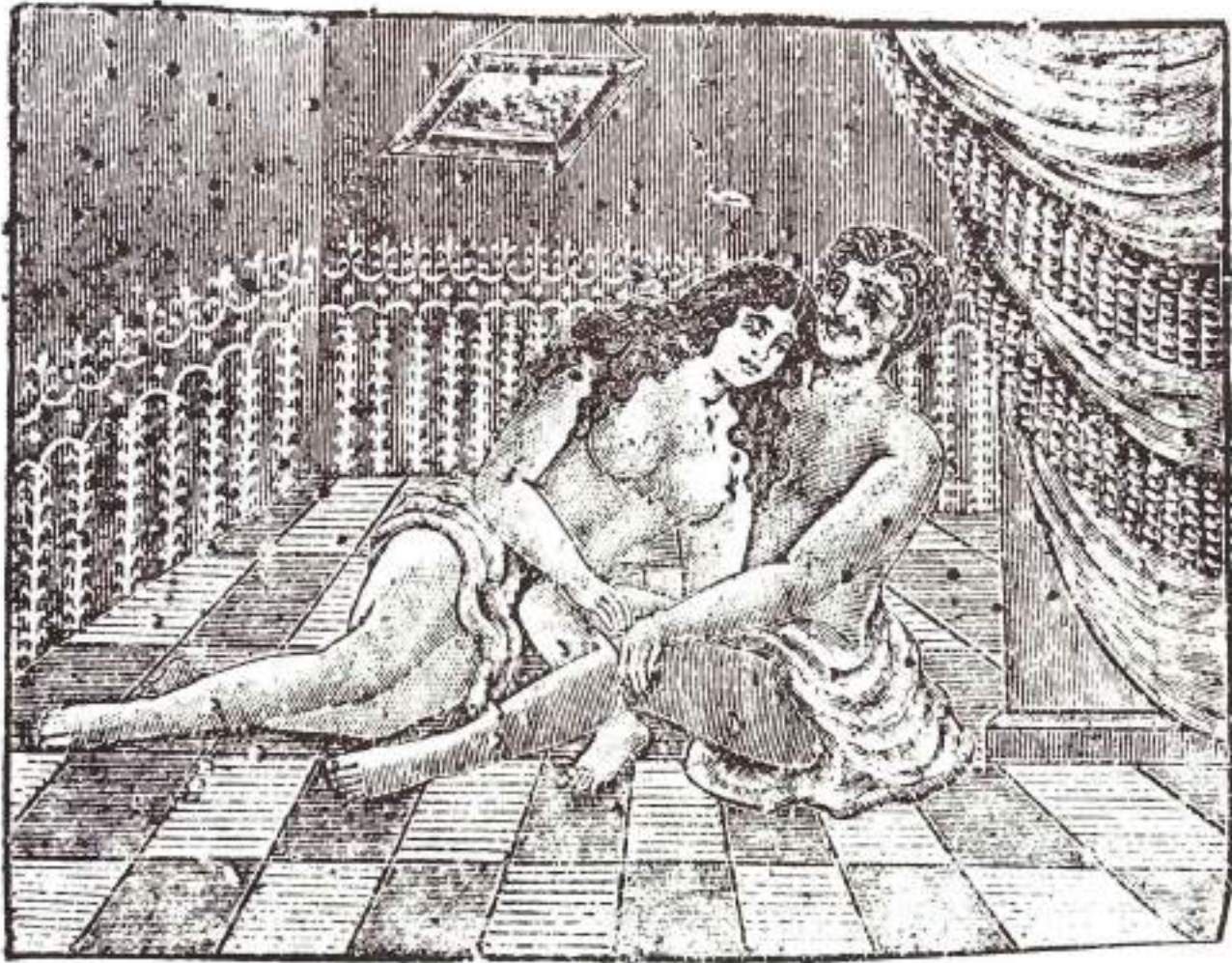
৯. নাগর এবং নগরনন্দিনী। কালীঘাটের শিল্পীর চোখে।
১০. কিরণশশী ও কৃষ্ণবাবু। 'পাশকরা মাগ'-এর একটি দৃশ্য।

উপলক্ষে" হেমচন্দ্র যখন "ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে" বলে প্রশস্তি গাইছেন সেই কাদম্বিনীই চিকিৎসক হওয়ার পর একটি কাগজ নির্লজ্জের মত তাঁকে আক্রমণ করবেন। সে অপরাধে অবশ্য 'বঙ্গ-নিবাসী'র সম্পাদক মহেন্দ্র পাল মশাইকে ফাটকে পাঠানো হয়েছিল (১৮৯১)। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের যে মুখ বন্ধ করা যায় নি তার প্রমাণ 'কেয়াবাৎ-মেয়ে'র মত সেকালের রাশি রাশি প্রহসন।

বাংলা প্রহসন বিষয়-বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। এমন কোনও সামাজিক আন্দোলন নেই যে বিষয়ে প্রহসন রচিত হয়নি। কেউ পক্ষে, কেউ বিপক্ষে—এই যা। বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, অসম-বিবাহ, কন্যাপণ ও বরপণ, নৈতিক ব্যভিচার, মদ্যপান—সর্ববিষয়েই সতর্ক নজর লেখকদের। স্বয়ং গিরিশ ঘোষ কলম ধরেছিলেন বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে পর্যন্ত, সেদিন। হেমচন্দ্রের 'বিধবা-রমণী'কে ব্যঙ্গ করে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"বিলাতী বিধবা।" তাঁর আর এক রচনার নাম—সধবা-বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব। বক্তব্য : বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিবার জো নাই। আমি প্রতিপন্ন করিব যে সধবা বিবাহ চতুর্গুণ শাস্ত্রসিদ্ধ।

১৮৯২ সনে 'কনসেন্ট বিল'। আইন হল, বারো বছর বয়স না হলে কনে স্বামীর ঘর করতে যেতে পারবে না। প্রতিবাদে গড়ের মাঠে নাকি মহতী সভা। কালীঘাটে লোকে লোকারণ্য। 'জন্মভূমি' লিখছে—"বিলের বিরুদ্ধে অন্তত দশ সহস্র দরখাস্ত বড়লাট ভবনে উপনীত হইবার সম্ভাবনা। বিলের বিরুদ্ধে দেশে সভা-সমিতি যে কত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।" পটলডাঙ্গার আলবার্ট হল, জানবাজারের সাবিত্রী সভা, বাগবাজারের নন্দলাল বসুর বাড়ি, মজলিস-সভা স্টার থিয়েটার, সিকদারবাগান লেন, ভাগীরথী তটে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাট—ইত্যাদি অনেক সভার বিবরণ দিয়েছে 'জন্মভূমি'। কিন্তু আসল অস্ত্র জোগালেন বুঝি অমৃতলাল বসু। তিনি লিখলেন—"সম্মতি সঙ্কট" প্রহসন। কনের মা তাতে বলছেন—"পুনর্বে হলে জামাই ঘরে শোবে না ত কি তিন ছেলের মা হলে শোবে!" লেখকের কথা : আম যেমন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ থেকে পাকে না, তেমনই মেয়ের যৌবন আসারও কোনও বয়সের নিয়ম নেই!

শুনে নিশ্চয় বিস্তর হেসেছেন দর্শক এবং শ্রোতারা। হাসির কথাই বটে। ঠিক তেমনই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সেদিন অন্যতম উপলক্ষ আধুনিক শিক্ষা। বিশেষ করে মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষা। অর্থাৎ, কেয়াবাৎ-মেয়েরা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নারী-প্রগতি সংক্রান্ত ব্যঙ্গ "ব্যঙ্গ দর্শন"-এ যে কোর্স বা পাঠক্রম সাজিয়েছেন তাতে অন্যতম—স্ত্রীশিক্ষা। "সঙ্গীত প্রকরণ ; নৃত্য প্রকরণ, প্রণয় প্রকরণ, বিরহ প্রকরণ, কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, পিতৃমাতৃ-ভ্রাতৃত্যাগ প্রকরণ, নাটক উপন্যাস, পদ্য রচনা, পত্র রচনা এবং গুরুজন লাঞ্ছনা। মেয়েরা এসব বিদ্যায় পটু হলে তাদের ক্ষেত্রে যে-সব বিয়ে সিদ্ধ সেগুলো হচ্ছে : বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ, বিবিধ বিবাহ। প্রগতিশীলা মেয়েদের পক্ষে অপ্শনাল বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন তিনি মদ ও মুর্গি।"

এর প্রত্যেকটির দায়ে প্রহসন রচয়িতারা সেদিন দায়ী করেছেন শিক্ষিত মেয়েদের। "পাশকরা মাগ"-এর নায়িকা বেথুন স্কুলে পড়া কিরণশশী বান্ধবীর কাছে গর্ব করে বলছে—যদিও আমি বাঙালীর মেয়ে—কিন্তু এখনকার বাঙালী মেয়ের মত মূর্খ নই।...যেদিন তোমার বিয়ে হয় সেইদিন তোমার পতি আমার মুখে ইংরাজী স্পীচ শুনে থাণ্ডারস্ট্রক হয়েছিল, আমার সেই ড্রেস দেখে ফেরারী মনে করে জগৎকে নাথিং জ্ঞান করেছিল।..."বউবাবু" নামে আর একটি প্রহসনের নায়িকা স্বামীকে বলছে—হরিশ! এ বড় দুঃখের বিষয় যে, আমার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা রমণীর পাণিগ্রহণ কোরে, আজও বিশুদ্ধরূপ বাক্যবিন্যাস করতে শিখলে না।...আবার চামচিকে হলে কিসে? স্বভাবতই কিরণশশীর স্বামীর উক্তি যেমন : "আমি মনে করেছিলাম, শিক্ষিতা স্ত্রী পেয়েছি—সুখী হব। তার খুব ফল পেলাম। হে হিন্দু ভ্রাতাগণ! যদি মর্যাদা চাও, জাতি চাও,

১১· বাবু-বিবি সংবাদ। কালীঘাটের রেখাচিত্র।
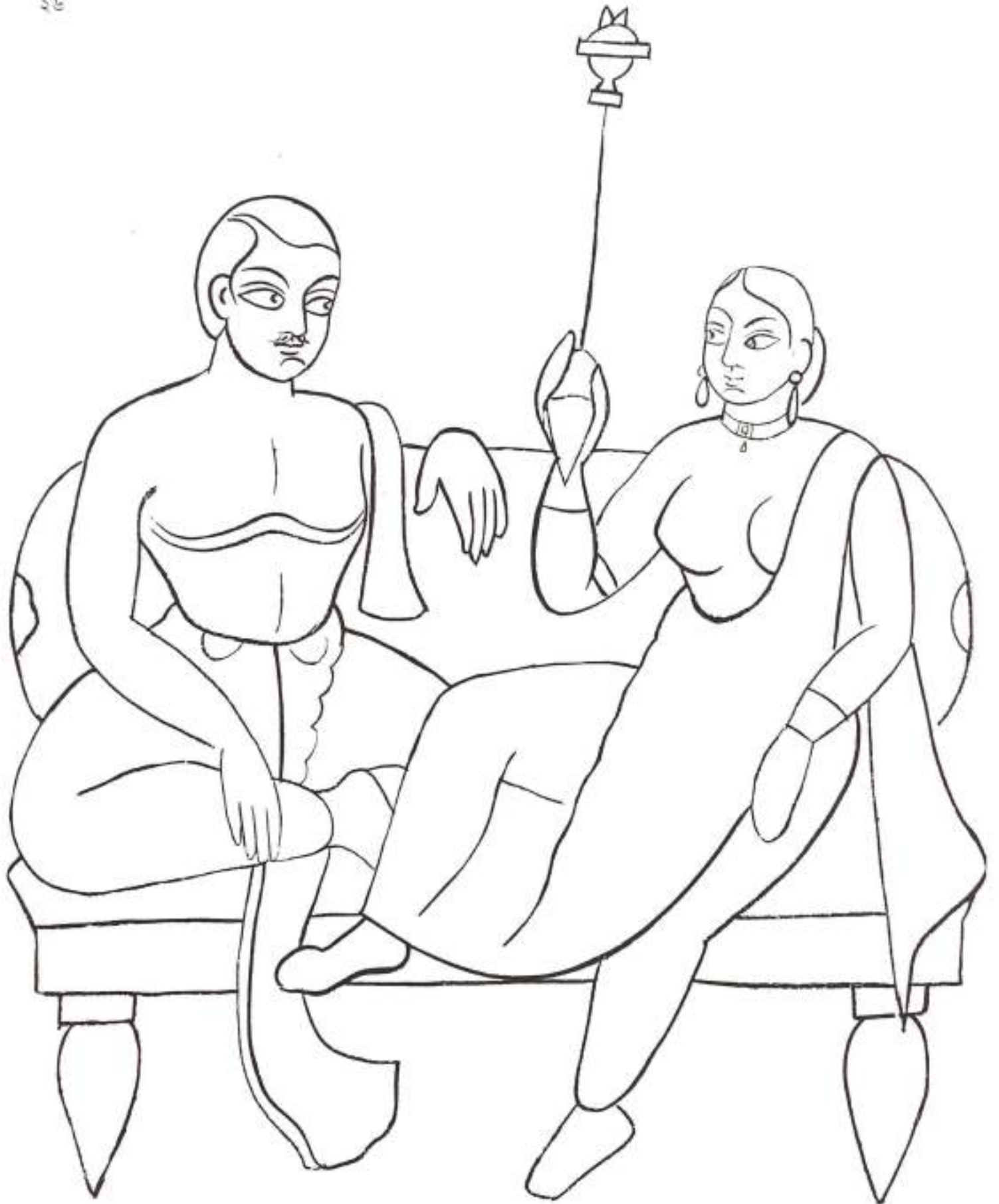
তবে কেউ যেন পাস করা মাগ না চায় !" "বউবাবু"র নায়কের উক্তিও তেমনি : পাশ্চাত্য শিক্ষানুরাগিণী কুহকিনী পত্নীর কুহক জালে জড়িত হলে লোকে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, এ অভাগাই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ! গলা কাঁপিয়ে তাঁর ঘোষণা—আর বাড়ি ঢুকব না, কলকাতায় আর থাকব না ।...আজকের মেলেই পশ্চিমে চলে যাব !

শিক্ষিতা মেয়েদের ব্যঙ্গ করে লেখা এই দুটি প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন—এ বই যখন লেখা হয় তার আগে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার প্রচেষ্টা, কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখকজীবন শেষ হতে চলেছে, গোরা সমেত রবীন্দ্রনাথের অনেক বিশিষ্ট রচনা প্রকাশিত, বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের যুগ আরম্ভ হয় হয় ! তার পরেও এসব ?

কেয়াবাৎ-মেয়ে বোধহয় আরও ক'বছর পরের রচনা । বোঝা যাচ্ছে—নারী শিক্ষার অগ্রগতি যত বাড়ছে, আক্রমণ ততই তীব্র হচ্ছে । চূড়ান্ত পরাজয়ের আগে মরিয়া হয়ে শেষ যুদ্ধ করতে চাইছে কুযুক্তি আর কুসংস্কার । ১৮২৯ সনে সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে চিতার ধোঁয়ায় যেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল চতুর্দিক, অনেকটা সেই ধরনের দৃশ্য যেন ।

কেয়াবাৎ-মেয়ে মালতীর অপরাধ সে নিজে পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে চায় । আর সব কেয়াবাৎ-মেয়ের অপরাধ কিন্তু আরও গুরুতর । যোগেন্দ্রনাথ বসুর "মডেল ভগিনী" তার এক দৃষ্টান্ত । ডেপুটির মেয়ে কমলিনী অবশ্য পাস-করা ছিল না, তার ছিল "ঘরাও-শিক্ষক" ।—"ফিটফাট ছোকরা, ইংরাজীতে লায়েক ।" ইন্দ্রনাথের এক নায়িকা কামিনীসুন্দরী বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফেরেন । স্বামী (দ্বিতীয় পক্ষের পরিবার) ভৈরব সভয়ে তাঁর সেবা-যত্ন করেন । কামিনী আদর করে তাঁকে বলেন—ভর্য্যা । ইন্দ্রনাথ বলতে চান—টেবিল ঘুরে গেল বলে ! লেখাপড়া করতে দিলে অচিরেই দেখা যাবে ছেলেরা অন্তঃপুরে বন্দী হয়েছে, মেয়েরা করছে অফিস আদালত ।

পাসকরা মেয়েদের দ্বিতীয় বরে কেন, তৃতীয় চতুর্থ পক্ষেও আপত্তি নেই ।—আপনার সন্তান সন্ততি কয়টি, এই প্রশ্নের উত্তরে 'অবলাব্যারাক' নামে একটি প্রহসনে এক নায়িকা চপলা দেবী বলছেন—ছেলেতে মেয়েতে সবে সাতটি । তার মধ্যে প্রথম পক্ষের বড় ছেলে চাকরি-বাকরি করে ; দ্বিতীয় পক্ষের একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রায় সাবালক হয়ে উঠলো । তৃতীয় পক্ষের দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে এখনও নাবালক ; তাদের জন্যই কিছু ভাবনা । আর কয় পক্ষের কোনও সন্তানাদি হয়নি ! প্রহসনে দেখানো হয়েছে এই মহিলার ছেলেরা মায়ের বিয়ে নিয়ে অতিশয় ব্যতিব্যস্ত ।

উচ্চশিক্ষিত মেয়েদের বিরুদ্ধে আর এক নালিশ তাঁরা ঘরকন্না করেন না । সব সময় জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর খাতা-পেন্সিল নিয়ে পদ্য লেখেন । "হরি ঘোষের গোয়াল" (১২৯২) নামে একটি প্রহসনে নায়িকা জ্ঞানদাকে দেখা যাচ্ছে পাখির খাঁচার সামনে বসে বলছেন—হে বুলবুল, হে নাইটিঙ্গেল ! আজ আমি তোমার ব্রত করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে আমার গণ্ড সিন্দুরের মত করিয়া দাও, কারণ তুমি অনেক সিন্দুর-রঙের তেলাকুচা খাইয়া থাক ।...তোমার স্বরের মতো আমার স্বর করিয়া দাও । তাহা হইলে আমি সমাজে বসিয়া মধ্যে মধ্যে পিউ পিউ করিতে পারি ।...শাশুড়ি এসে হাজির । জ্ঞানদা তখন বলছে—তোমরা তো আর উন্নত দলের মেয়ে নও, তোমরা উনিশ শ শতাব্দীর ব্রতের খবর কি রাখবে ? তবে আজকালকার ব্রতের নাম শুনবে ? তবে শোন—নাইটিঙ্গেল ব্রত, কার্পেন্টার ব্রত, ওয়াসারম্যান ব্রত, বার্ব্বর ব্রত ।

আর একটি প্রহসনে দেখছি (কষ্টিপাথর—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত, ১৮৯৭) গৃহস্থ বধূ কবিতা লিখে

১২· বাবু বিলাস সেদিন কালীঘাটের শিল্পীদের অন্যতম প্রতিপাদ্য ।

স্বামীকে পীড়াপীড়ি করছেন শোনার জন্য। স্বামী বলছে—ক্ষমা কর, এত বেলায় তোমার লেখা দেখতে গেলে চাকরি থাকবে না। পরিচারিকা বামীর মন্তব্য : "ধন্যি আমাদের বাবুর সহ্যি, আমরা তো ছোটলোক, আমারও ও রকম মাগ হলে আমি তাজ্যপুত্তুর কত্তুম!"…এই প্রসঙ্গে তাঁর ভায়রাভাই উমেশের উক্তি : আহা বেচারা রমানাথের কি অবস্থা, ভাবলে জ্ঞান থাকে না। ঘরের মাগ যেন গিরিশ ঘোষ, কথায় কথায় "নাহি জানি ভাইরে লক্ষ্মণ!" গেছি আর কি।

এ-দোষ তবু হয়তো বা মার্জনীয়। পাস-করা মেয়েদের অমার্জনীয় দোষ পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা। তারা নির্লজ্জা। তাদের মধ্যে অনেকে মদ খায়। প্রায়শ তারা ব্যভিচারিণী। সুতরাং, রীতিমত উদ্বিগ্ন সেদিনের সমাজপতিরা। নদীয়ার অন্তর্গত গঙ্গাতীরস্থ মেটিরি গ্রামের কবি বিষ্ণুরামের "কুলকন্যার দ্বিরাগমন" পুঁথিতে বলা হচ্ছে—মনে রাখবে, স্বামীই সব। "রমণীর পতি বিনা গতি নাই।/পতির বিষয়ে বিশেষ জানাই॥/পতি যা বলেন তাহাই করিবে।/পরম যতনে পতিকে সেবিবে॥/পতি খেলে খাবে, না খেলে খাবে না।/পতি শুলে শোবে, না শুলে শোবে না॥" বইটিতে বলা হচ্ছে শিক্ষিত মেয়েদের ধরন-ধারণ অন্য রকম, সে রকম যেন করো না বাপু। ওদের "নাহি লজ্জা, নাহি ভয়, মাথা খুলে কথা কয়,/বলে আমি চিনি নাকো কারে।" তারপর ঘরবাড়ি দেখে বলে "ছি-ছি, কী অপরিষ্কার, থাকিতে না পারি/…কহিছে চেয়ার নাই, বসি কিসে কি বালাই,/জানি না, এ ভবন না বন…।" কবির পরামর্শ—"শেষে বলি শোন দিয়া মন।/কাল যদি হয় পতির বরণ,/ধটী দিয়ে যদি কটি হয় ঢাকা,/হয় যদি দেহে কোন ঠাঁই বাঁকা/ভাগ্যদোষে যদি করেন রাখালি,/রাধা ভাবে ভেবো সেই বনমালী!" সমসাময়িক চিৎপুরের চিত্রকরেরাও একই সুপরামর্শ বিতরণ করছে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে। হাজারে হাজারে ছাপিয়ে তারা বিলি করছে "স্বামী ভক্তি বা পাতিব্রত্য চিত্র।" তার বক্তব্য :

পতি ধর্ম্ম, পতিকর্ম্ম
পতি সারাৎসার।
পতি ভিন্ন রমণীর গতি নাই
আর॥…
পতি আজ্ঞা, সতী পক্ষে,
বেদের সমান।
পতি তুষ্ট হলে,
তুষ্ট প্রভু ভগবান॥
পতিকে করিলে স্তব
হয় ইষ্ট তপ।
পতি গুণ কীর্ত্তনেতে
হরিনাম জপ॥…

একই কালের সাহিত্যে এবং চিত্রে কিন্তু পতি-দেবতার জীবনলীলা বৃত্তান্ত একটু অন্য রকম। স্ত্রী যখন এক শিশি পাঁচ আনা দরে সুগন্ধি পমেটম কিংবা ছয় আনা দরের গোলাপ দন্তমঞ্জনে দাঁত মেজে তাম্বুলীনে ঠোঁট রাঙিয়ে স্বামীর জন্য সেজেগুজে বসে গোলকধাম খেলায় সময় কাটাচ্ছেন, পতি-দেবতা তখন

১৩· ভেড়া বানানো। মেয়েদের হাতে পুরুষের পরিণতি। কালীঘাটের রেখাচিত্র।

FEMALE
NICK
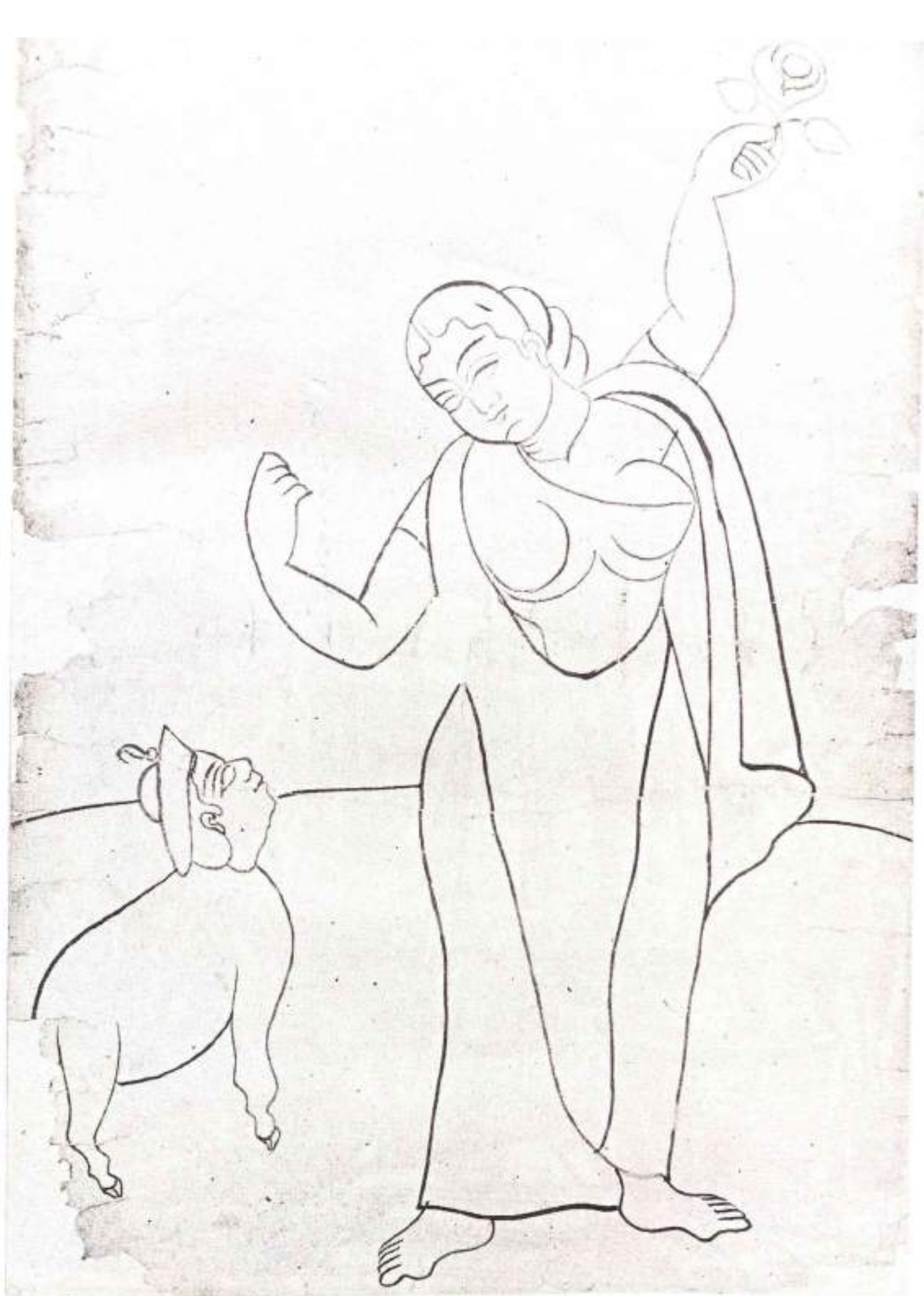
বারবনিতার সঙ্গে বাগানবাড়িতে নানা লীলায় নিশি যাপন করছেন। তাঁর পাঠ্য তালিকায় তখন গোলেবকাওয়ালী, উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্ত কথা, কিংবা নারী দেহতত্ত্ব। অথবা, হয়তো বা কামরত্ন তন্ত্র। সেখানে অঙ্গুলী-নির্ণয় থেকে শুরু করে দুষ্টা স্ত্রী বশীকরণ, আকর্ষণ প্রকরণ, হুড়কো মেয়ে জব্দ করার নানা করণকৌশল। শহর কলকাতায় স্কুল তখন গুটিকয় বটে, কিন্তু বারবণিতা অসংখ্য। ১৮৫৩ সনে কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেট জানাচ্ছেন, চার লাখ মানুষের শহরে তাদের সংখ্যা ১২৪১৯। ১৮৬৭ সনে পৌরসভার বিবরণে জানা যাচ্ছে সংখ্যাটি ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। তুড়ি ঘুড়ি বুলবুলি আখড়াই হাফ আখড়াইয়ের মত, গুলি গাঁজা মদের মত, বারবধূ সেদিন বাবুকুলের আর এক নেশা। ওদিকে ১৮৭১ সনে হুগলির খবর তেত্রিশ জন কুলীন বিয়ে করেছেন ২১৫১টি মেয়েকে। এই ঘোর তমসায় হঠাৎ আলোর সম্ভাবনায় আঁধারের প্রাণিকুল যে বিচলিত বোধ করবে তাতে আর বিস্ময় কী! এক-একটা আন্দোলন শুরু হচ্ছে আর আমাদের এঁদো পুকুরটিতে যেন এক একটি ঢিল পড়ছে। ১৮৫৬ সনে এল বিধবা-বিবাহ আইন। সে বছরই শুরু হয়েছে কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। ১৮৬৬ থেকে ১৮৭২ সনের মধ্যে বিয়ে সংক্রান্ত আইন উপলক্ষ করে আন্দোলন। ১৮৯২ সনে তথাকথিত সহবাস সম্মতি আইন। প্রতিবাদীরা জানেন সব কিছুর মূলে রয়েছে ইংরাজী শিক্ষা। সর্বনাশা সে শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে প্রসারিত হলে কী কাণ্ড হতে পারে, ভেবে স্বভাবতই তাঁরা শিহরিত। "জন্মভূমি" (১২৯৮) বলছে—ইংরাজ রাজ অনেকগুলি দেশী নারদ ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ নারদগুলির শিক্ষাদীক্ষাও ইংরাজপ্রদত্ত। এখন তাঁহারা ভারত রমণীর ধর্ম্মলোপ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রশংসা, অবরোধ প্রথার নিন্দা, বাল্যবিবাহের অপযশ, যৌবনবিবাহের খোসনাম, কালোপযুক্ত লেখা-পড়ায় প্রবৃত্তিপ্রদান, স্বামীস্ত্রীর সমান অধিকার-খ্যাপন, বিবাহের অর্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা—। পাতিব্রত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী এই সকল ব্যাপারে নারদগণ স্ত্রীজাতির মন ভুলাইতেছেন।...বিষ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমণী মজিতেছে, পুরুষও মজিতেছে। সুতরাং আতঙ্কিত "জন্মভূমি" অন্যের মনেও ভয় জন্মাতে চায়। দুর্গোৎসবের সময় তার পাতায় ব্যঙ্গচিত্র—দেবীর ঠাঁই অধিকার করেছেন " মহিষমর্দ্দিনীরূপিণী শিক্ষিতা স্ত্রী"। এবং "স্বামী বিপদ বুঝিয়া স্ত্রী-দেবীর স্তব আরম্ভ করিয়াছেন—কৃপা কর কমলিনি! কাতর পরাণ মোর,/কহ কিছু কমনীয় কথা।"...

১৪. আধুনিক কৃষ্ণ। বাঁশিতে মধুর ধ্বনি—নারী শিক্ষা। চারপাশে সুন্দরীর ভিড়। ব্যঙ্গচিত্র, ১৮৭৫।
১৫. উলটপুরাণ। শিল্পী : যতীন্দ্রকুমার সেন, ১৩২৬।

১৬· মূর্তিমতী বিদ্যা । বিদ্যাসুন্দরের নায়িকা চিত্রিত লেখাপড়া জানা মেয়ে হিসাবে ।

কিন্তু মেয়েরা কি সত্যই "কমনীয় কথা" ছাড়া আর কিছু বলতেন ? অবোলা বদনাম কি তাঁদের সত্যই রাতারাতি ঘুচে গিয়েছিল ? কেয়াবাৎ-মেয়ে রোজার সামনে কিছু পয়ার আউড়েছিল বটে, কিন্তু সমসাময়িক ইতিবৃত্ত তন্ন তন্ন করে হাতড়ালেও আমরা বোধহয় কোনও টাইগ্রেস অ্যাটকিনসন, জারমেইন গ্রীয়ার, কিংবা কেট-মিলেট-এর সন্ধান পাব না আমাদের নারী সমাজে। বিদ্রোহিনী অবশ্যই ছিলেন। কেউ "সতী" হয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন, কেউ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার খতিয়ানটি তাৎপর্যপূর্ণ। একজন গবেষক জানিয়েছেন—১৮৭২ সনে প্রতি দশলক্ষ মেয়ের মধ্যে ২৯·৩ জন হারে বাংলার মেয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। (উমা চক্রবর্তী, কনডিশান অব বেঙ্গল উইমেন অ্যারাউন্ড দি সেকেন্ড হাফ অব নাইনটিনথ সেঞ্চুরি, ১৯৬৩।) ১৮৭৪-এ নিজের হাতে নিজে প্রাণ নিয়েছেন লক্ষে ৪৩·৬ জন! আরও একটি দরকারি খবর। ১৮৭৮ সনে বাংলা দেশের জেলগুলোতে ৮০ জন মেয়ে কয়েদী ছিলেন ; ১৮৯৭ সনে তাঁদের সংখ্যা ৯৭, ১৮৮০ সনে—১০৪ এবং ১৯০০ সনে—১৫০৪। শেষোক্ত বছরে ডাকাতে-মেয়ে আছেন, আছেন ২৯ জন খুনী মেয়েও। নিজেকে বা অন্যকে খুন করতে প্ররোচিত হয়েছিলেন কেন ওঁরা ? সেদিন কী ওঁদের জীবনযন্ত্রণা ?

কেয়াবাৎ-মেয়ে বোধ হয় ওঁরাও। কিন্তু আমাদের স্মৃতির চিত্রশালে এখনও বেঁচে আছেন প্রধানত তাঁরাই, যাঁরা নতুন কিছু, অভিনব কিছু করেছিলেন সেদিন। ঘোড়ায়-চড়া ঠাকুরবাড়ির বউ, স্বামীর সঙ্গে লাটভবনে চলেছেন ঠাকুরবাড়ির আর এক বউ, ডাঃ রবসনের বাড়িতে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখতে সমবেত মহিলারা, মাঘোৎসবে পুরুষের পাশাপাশি বসা মেয়েরা, মফস্বল শহরে সমাজের প্রচারবেদীতে দণ্ডায়মান নারীমূর্তি···কেয়াবাৎ-মেয়ের অনেক ছবি সেদিনের ইতিহাসের পাতায়। ১৮৭০ সনে কে এক কুলীনের বউ স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোষের মামলা দায়ের করে পনের টাকা মাসোহারার অধিকার লাভ করেছিলেন, এবং টাকা না পেয়ে স্বামীকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, কিংবা কারা অন্য ধরনের বিয়ের কনে হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আছে সেই কালীমতি, কমলমণি, সুনীতি, কিংবা মৃণালিনীর কথাও। সন্দেহ নেই প্রত্যেকেই তাঁরা বিশিষ্ট, প্রত্যেকেই স্মরণীয়। তবু মনে হয়, আমাদের কেয়াবাৎ-মেয়েরা নামেই কেয়াবাৎ-মেয়ে, তাঁদের প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। অন্তত 'সবোলা' মেয়েদের কথাবার্তা শুনলে তাই মনে হয়।

মেয়েদের প্রথম কাগজ নাকি "বঙ্গ মহিলা" (১৮৭০)। তার আগে ছেলেরা মেয়েদের জন্য যে সব

১৭. 'এতদিন করিনি তাই!' অফিসের পথে মহিলা। শিল্পী : বিনয়কুমার বসু, ১৩৩৪।

কাগজ প্রকাশ করেছেন সেগুলোর নাম স্বভাবতই "বামাবোধিনী", "বালারঞ্জিকা", "অবলাবান্ধব"—ধরনের কিন্তু মেয়েরাও যেন সেই ঘরানাতেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। তাঁদের পত্র-পত্রিকা—'অনাথিনী', 'বিনোদিনী', 'পরিচারিকা', 'অন্তঃপুর', ইত্যাদি। জনৈক মহিলা সম্পাদিত 'বঙ্গ মহিলা'য় প্রবন্ধ লিখেছেন কোনও মহিলা (?)। প্রবন্ধের নাম—"স্বাধীনতা"। লেখিকার কথা—···· প্রকৃত স্বাধীনতা কী ?

ইউরোপীয় কামিনীগণের যেরূপ স্বাধীনতা আছে বঙ্গীয় স্ত্রীলোকদিগকে ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা এ দেশীয় কতকগুলি লোকের বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ মহিলাদের সে ইচ্ছা নাই। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান স্ত্রীজাতির যেরূপ স্বাধীনতা দেখা যায়, তাহাকে আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া থাকি। স্ত্রীলোক মনে করিলেই যে ঘোড়ায় চড়িয়া যায়, ইচ্ছামত পরপুরুষের সহিত হাস্যকৌতুক অথবা নৃত্যাদি করে, লজ্জাহীনার ন্যায় পুরুষের সঙ্গে গান ও আহার করে, যখন তখন ভিন্ন পুরুষের হাত ধরিয়া যথাতথা বেড়াইয়া বেড়ায়, এমন স্ত্রীলোকদিগকে কী বলা যায় ? তাহাদিগকে মেয়ে বলিতে তো আমাদের সাহসে কুলায় না !···"

এ কণ্ঠস্বর অবশ্যই বিদ্রোহিনীর নয়। সুখী, তৃপ্ত, আনন্দিত গৃহস্থকন্যা কিংবা বধূর, পোষা আদুরে মিনির। তিনি কলম ধরতে শিখেছেন, কিন্তু কলমকে এখনও তলোয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শেখেন নি। ব্যবহার করতে ইচ্ছাও যেন তাঁর নেই। সেটা অবশ্যই অবাক-কাণ্ড নয়। "উইমেনস লিব" আন্দোলন যখন চরমে, তখনও শোনা যায়, একদল আধুনিকা গড়ে তুলেছেন নতুন প্রতিষ্ঠান—"মম", (MOM)—"মেন আওয়ার মাস্টারস !" ছেলেরা গড়েছেন—"ওয়াও" (WOW)—"উইমেন আওয়ার ওয়াণ্ডারস"। স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়ে উঠছে—"পুসি-ক্যাট লীগ"। স্বভাবতই উনিশ শতকের বাঙ্গালী মেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। কার্যকারণে তাঁদের রচনায় স্বভাবতই সেদিন "চিত্তবিলাসিনী", "আধ আধ ভাষিণী" ধরনের সম্ভারই বেশী। তারই মধ্যে ক্ষণিকের জন্য তলোয়ারের ঝিলিক দেখিয়েছিলেন অবশ্য বউবাজারের মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়। হেমচন্দ্রের বিখ্যাত পদ্য "বাঙ্গালীর মেয়ের (কে যায়, কে যায় ওই উঁকি ঝুঁকি চেয়ে···ইত্যাদি) উত্তরে ইনি লিখেছিলেন—"বাঙ্গালীর বাবু"। হায় হায় অই যায় বাঙ্গালীর বাবু !/দশ্‌টা হতে চারটাবধি দাস্য বৃত্তি করা/সারা দিন বইতে হয় দাসত্ব পসরা।/···সারা দিন খেটে খেটে, রক্ত উঠে মুখে/পেগের বড়াই হয় ঘরে এসে সুখে।···"

ইনিও নিশ্চয় সেদিন অনেকের চোখে 'কেয়াবাৎ-মেয়ে'। তবে দূর থেকে তাকালে সেই আবছা অতীতে সত্যি সত্যি কেয়াবাৎ-মেয়ে মনে হয় যেন জয়নারায়ণ ঘোষালের মেয়ে ওই মালতীকেই, যে থিয়েটারি ঢঙে হলেও বলতে পেরেছিল—"অতএব পিতা ও কাকা তোমাদের গুডবায় !" কিংবা উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবাবিবাহ" নাটকের সুলোচনা নামে সেই বিধবা মেয়েটিকে, যার বিরুদ্ধে মায়ের নালিশ—"কথায় কথায় বিধবা বিয়ের কথা বলেছিলুম, তা একেবারে নেচে উটলো !" অথবা রামনারায়ণ তর্করত্নের "চক্ষুদান" নাটকের নায়িকা বসুমতীকে; ব্যাভিচারী স্বামীকে চক্ষুদান করার ইচ্ছায় কপট ব্যাভিচারিণী সেজে যার প্রশ্ন—"কেন ? আমি কি মানুষ নই ? আমার রক্ত-মাংসের শরীর নয় ? আমার মন নাই ? ইন্দ্রিয় নাই ? সুখ-দুঃখ নাই ?"
সাবাস মেয়ে !—কেয়াবাৎ-মেয়ে।

১৮. 'কেহ কেহ উকিল··· ।' তির্যক চোখে দেখা
আধুনিকা শিল্পী : যতীন্দ্রকুমার সেন
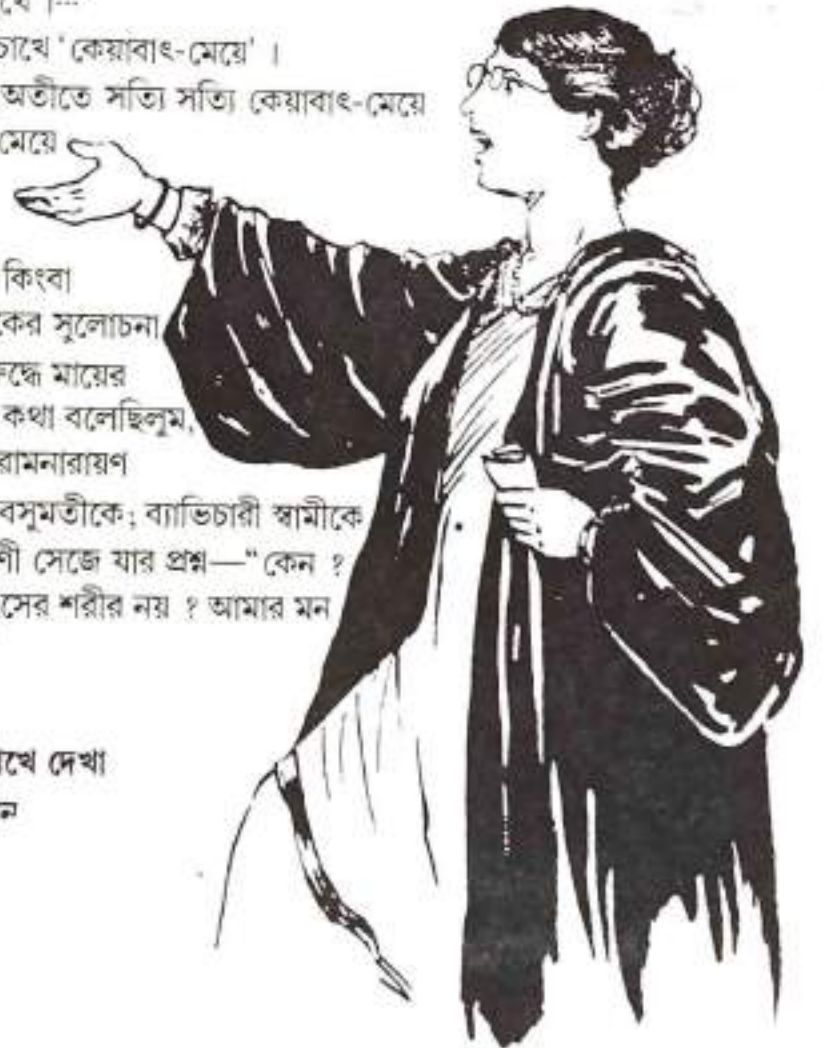
# কিশোরী ভজনা

অথবা

## বাবুদের প্রণয়-প্রকরণ

"জাহাজডুবি। একটি প্রবাল দ্বীপ। একজন ডুবে যাওয়া যাত্রীর সন্তানকে নিয়ে নিঃসঙ্গ আমি। সে কাঁপছে। সোনামণি, এতো শুধুই একটা খেলা! কী দারুণ ব্যাপারই না ছিল আমার কল্পিত অভিযানগুলো! পার্কের শক্ত বেঞ্চিতে বসে ভান করতাম যেন হাতে থর থর কম্পমান বইটিতে ডুবে আছি। আর সেই নীরব পড়ুয়ার চারপাশে পরীরা স্বচ্ছন্দে খেলে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছে এই পড়ুয়া যেন একটি পরিচিত স্ট্যাচু। কিংবা একটি প্রাচীন বৃক্ষের আলোছায়ার মতো কিছু। একটি ছোট্ট নিখুঁত সুন্দরী, পরনে তার চৌকো নকশা-কাটা পশমী ফ্রক, আমার পাশেই বেঞ্চিতে তার স্কেটের-জুতো-পরা পা-টা আওয়াজ করে ফেলল এবং তার তন্বী নিরাভরণ হাত দুটি আমার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে রোলার-স্কেটের ফিতে বাঁধতে লাগল। আমি যেন গলে যাচ্ছি। সূর্যের আলোয় আমার মুখের সামনে বইটি পত্রপল্লবের মতো মেলে ধরা। গোল গোল আংটির মতো পাকানো চুল ছড়িয়ে পড়ল তার রোগা হাঁটুতে। যে পত্রচ্ছায়ায় আশ্রিত আমি তা তখন কাঁপতে কাঁপতে সঞ্চারিত হচ্ছে তার শরীরে। সে দ্যুতিময় অঙ্গ তখন ক্ষণে ক্ষণে আলক্ত আমার গালের পাশে। আর একবার একটি স্কুলের মেয়ে মেট্রোতে ঝুলে পড়ল আমার গলায়। তার মাথা ভর্তি লাল চুল। তার বগলের কাছে কাপড়ের ঘসায় সে কী তূরীয় বোধ! সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার স্মৃতি জড়িয়ে ছিল আমার রক্তে।...স্কিপিং আর হপস্কচ খেলা চলছে। কালো পোশাকের সেই বৃদ্ধা এসে বেঞ্চিতে বসলেন। আমার পাশে। আমার আনন্দলোকে। কারণ, একটি পরী তখন আমার নিচে, বেঞ্চির তলায় তার হারানো মার্বেল খুঁজছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন আমার কি খুব পেট ব্যথা করছে?...আঃ, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও না আমার এই রজঃস্বলা পার্কে, আমার এই শ্যাওলাধরা বাগানে। আমার চারপাশে ঘিরে ওদের খেলতে দাও চিরদিন। ওদের কখনই বড় হয়ে উঠতে দিও না।"
লোলিতা, ভি নবকভ, ১৯৫৯

ন নবকভ-এর দেওয়া 'এইচ-এইচ', ওরফে হাম্বার্ট হাম্বার্ট একালের মধ্যবিত্ত মার্কিনী। তাঁর 'পরী'রাও সবাই জাতে পশ্চিমী। ঠিকানা তাদের অতলান্তিকের এপারে, কিংবা ওপারে। 'এইচ-এইচ' পরীদের দেশের মানুষ। তাঁর চারপাশ ঘিরে কিশোরীর মেলা। অতএব খেলার অফুরন্ত সুযোগ। উনিশ শতকের বাঙালির সে সুযোগ কোথায়? শতক যখন শেষ প্রহরে তখনও এ দেশ খাঁ খাঁ। এখানে গাঁয়ে গঞ্জে শহরে কোথায়ও পরী নেই। কিশোরী নেই। কলকাতার মতো শহরে পার্ক ছিল অবশ্য। বাগান ছিল। কিন্তু সেখানে ঝাঁক বেঁধে নেমে আসত না ফ্রক-পরা পরীরা। আজকের মতো বেঞ্চির তলায় মার্বেল খুঁজত না।

১৯. দুলালী। উনিশ শতকের শেষ দিকে শিক্ষিত সম্পন্ন ঘরের কন্যা।

দোলনায় দুলত না। শরীরে ঢেউ তুলে বাস্কেটবল খেলত না। কলকাতায় যখন প্রথম মেয়েদের জন্য পার্ক হয়, পর্দাপার্ক (১৩২৩), তখন তা জেলেপাড়ার সঙদের আলোচ্য বিষয়,—পর্দা ফাঁক! '—বসে সেথা রূপের হাট,/সেটা পর্দা মাঠ!' ইত্যাদি। কলকাতায় তখন হাম্বার্ট হাম্বার্টরা নিশ্চয় খুবই মনমরা। তাদের মুখের দিকে তাকানো যায় না।

কলকাতায় তখন মেয়েদের স্কুল নেই। কারণ, কে এক নীলকণ্ঠ মজুমদার বলেছেন—'প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা পুত্রপ্রসবযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়! বিদুষী নারীর বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায় এবং তাহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না।' তদুপরি লেখাপড়া শিখলে বিধবা হওয়ারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'-এর সেই মেয়েটিকে মনে পড়ে? সে বলেছিল—'সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে, লেখাপড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয়, এ কি সত্য কথা, যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।' তাছাড়া অন্য ভয়ও কি কম? 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছেন—'বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের আশংকা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎ পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্পবয়স্ক বলিয়া ছাড়িয়া দিবে না, কারণ খাদ্যখাদক সম্পর্ক।' তাছাড়া কালি কলমের অনেক দোষ। হাতে কাগজ কলম পেলে মেয়েরা কী করবে কে জানে! দাশু রায়ের পাঁচালীতে আছে—'বাল্য হতে বন্দীশালে মেয়েমানুষকে পাঠশালে/লিখতে দেয় না, কেন জান কান্তা।/যদি লেখাপড়া শিখতে লুকিয়ে লুকিয়ে পত্র লিখতে/ঘটত ভাল পীরিতের পন্থা॥'

সুতরাং, স্কুল ছিল না। স্কুলের ফ্রক ছিল না। জুতো ছিল না। মোজা ছিল না। বলিষ্ঠ উরুর ফালি বা পুরুষ্ট পায়ের গোছা ছিল না। উত্তমাঙ্গে ছিল না অন্তর্বাসের আভাস। সুতরাং স্কুলের আনাগোনার পথে দল বেঁধে রোয়াকে বসে থাকার সুযোগ ছিল না। অথবা, কদম গাছের তলায় ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার। স্কুল নেই অতএব স্কুলের বাসের পিছু পিছু নিষ্ঠাভরে সাইকেল চালিয়ে দু-এক ক্রোশ অহেতুক ক্রিং ক্রিং করাও নেই। নেই যেসব কিশোরী ট্রামে বাসে যাতায়াত করে ভিড় ঠেলে তাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ। গা ঘেঁসে দাঁড়ানো। ঝাঁকুনির সুযোগে ঢলে পড়েই সামলে নেওয়া। অনিচ্ছার আড়াল দিয়ে হঠাৎ ছুঁয়ে ফেলা। নাক ভরে গন্ধ নেওয়া। সেদিন কোনও সুযোগই নেই। বাংলা মুলুকের হাম্বার্ট হাম্বার্টরা সেদিন ন্যায্য কারণেই হুকোমুখো হ্যাংলা। তারা বঞ্চিতের দল। শতকের শেষদিকে দু' চার দশখানা স্কুল যে নেই এমন নয়। কিন্তু ইস্কুল নয়তো যেন কয়েদখানা। তাছাড়া ক'টি মেয়েই বা পড়তে যায় সেখানে? ১৮৫১ সনে বেথুন স্কুল যখন হল্লা তুলে শুরু হল তখন সেখানে ছাত্রী ছিল মাত্র একুশজন। উনিশ বছর পরেও শুনি ছাত্রী মাত্র তিরিশজন। সত্য, মেয়েরা বাইরে থেকেও আসত। বেথুন সাহেব একখানা ঘোড়ার গাড়িও দিয়েছিলেন দূরের মেয়েদের নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর তার গায়ে খোদাই করে দিলেন একটি সংস্কৃত বাক্য : কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ! সুন্দর বাক্য! অর্থ—পুত্রের মতো কন্যাকেও যত্ন করে পালন করবে, শিক্ষা দেবে। কিন্তু পর্দা ঢাকা সে গাড়ি বাঙালি বাবুর লুব্ধ চোখে চলমান নিষেধের মতো। কে জানে, এই সংস্কৃত বাক্যটি কতখানি কর্কশ। হয়তো কারও কারও কানে সেটি বাজত ক্রুদ্ধ ঋষির রূঢ় অভিশাপের মতো। কেননা, গাড়ির জানলা দুয়ার সর্বক্ষণ বন্ধ। কস্মিনকালেও কোনও চোরা চাউনি চোখে পড়ত না!

বাড়ির অলিন্দে কিংবা ছাদে দাঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। অবশ্য কলকাতায় তখনও ছাদ ছিল। একালের সুখ, স্বাধীনতা,—যমুনা পুলিনতুল্য ছাদ। ছাদের ওপরে আকাশ। আকাশে বাহারি ঘুড়ি। ওপারে সার সার জানালা। চিলেকোঠা মুক্তির দরজা। কিন্তু সেখানে পরীদের

২০. নতুন কালের নবীনা। নতুন পোষাক, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

আনাগোনা নেই। ঠিক দুপুরবেলা ভূতরা সেখানে মিছেই ঢিল মারে। কারও সাড়া মেলে না। কিশোরীদের সেখানে আসতে মানা। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় কলকাতার আকাশে যখন বঙ্গোপসাগরের হু হু হাওয়া, তখনও না। শরতের ভোরে রাতের শিশিরে ছাদ যখন স্নান সেরে শীতল, তখনও না। এমন কি বিজয়াদশমীর রাতে গোটা শহরের বাবুরা যখন সেজেগুজে পথে, কিংবা নদীর ঘাটে, তখনও না। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়মেয়ে সৌদামিনী তাঁর 'অন্তঃপুরের আত্মকথা'য় জানিয়ে গেছেন এমন কি ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের কাছে ছাদ ছিল বলতে গেলে নিষেধের গণ্ডি টানা। সৌদামিনী লিখেছেন, একবার বিজয়াদশমীর রাতে ছাদে উঠে বাড়ির মেয়েদের সে কী বিপত্তি! মহর্ষির পিসতুতো ভাই চন্দ্রবাবু এসে নালিশ জানালেন দেবেন্দ্রনাথের কাছে—'দেখ দেবেন্দ্র, তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাদে বেড়ায়। আমরা দেখিতে পাই। আমাদের লজ্জা করে। তুমি বারণ কর না কেন?' মেয়েরা বলতে প্রধানত বাড়ির বৌরা। তাঁদেরই যখন এই হাল, তখন মধ্যবিত্ত ঘরের অবস্থা অনুমান করতে অসুবিধা নেই। ছাদ তাদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা। বাড়ির বারান্দা জানালাও তা-ই। সেকালের বাড়িতে বাড়িতে ফ্রস্টেড কাচ আর ভেনিসিয় ব্লাইন্ড-এর এই যে ছড়াছড়ি সে কি শুধুই অলঙ্কার? সদর অন্দরের সীমানা তখন স্পষ্ট। স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত নিষেধের এলাকাগুলোও।

তখন সিনেমা হল নেই। সুতরাং, পাশের সিটে বসা কোনও পরীর কনুইয়ের ছোঁয়া পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। থিয়েটারে যখন ভদ্রঘরের মেয়েরা দর্শকের আসনে তখনও তাঁরা চিকের আড়ালে। এসব ব্যাপারে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর ব্যবস্থাদিতে মৌলিক কোনও পার্থক্য নেই। যেমন করে হোক পরপুরুষের নজর থেকে আড়াল করতে হবে মেয়েদের। এমন কি কিশোরীদেরও, মার্কিনী উপন্যাসে যারা 'পরী'। সুতরাং, যদিও উনিশ শতক তখন শেষ যামে, তবু ময়দানবের কীর্তির মতো এত বড় যে শহর কলকাতা সেখানে পরীদের খুঁজে পাওয়া ভার। তারা অদৃশ্য। যেন সম্পূর্ণ অশরীরী কোনও অস্তিত্ব। স্বভাবতই খবরের কাগজে তখন কিশোরী মেয়েদের ছবি দেখা যায় না। না অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনের ছলে, না কোনও বালিকাবধূর রূপসজ্জায়। এমন কি যোগাভ্যাসের ভঙ্গিতেও না। তখন দূরদর্শন নেই। সুতরাং, লহমার জন্য নরম পানীয়ের বিজ্ঞাপনে তাদের কলকল সুরের হিল্লোল, ফেনিল উচ্ছ্বাসেও তাদের ভেসে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বুভুক্ষু হাম্বার্ট হাম্বার্ট সেদিন এশহরে পা দিলে সম্ভবত পাগল হয়ে যেতেন। এখানে সবই ছিল। খোলা আকাশ। সে-আকাশ কখনও তপ্ত তামার পাতের মতো কখনও মেঘে ঢাকা, কখনও বা নীলাম্বরিতে মোড়া। এখানে বাতাস ছিল। কখনও ঝড়ো, কখনও শান্ত। কখনও গরম, কখনও শীতল। এখানে গাছগাছালি ছিল। গাছে ফুল ছিল, পাখি ছিল। নদী ছিল, পুকুর ছিল, জলা ছিল। এখানে শহর ছিল। শহরে অসংখ্য ঘরবাড়ি ছিল। পথে পথে ছিল মানুষজন। অগণিত মানুষ। কিন্তু পরীরা ছিল না। 'এইচ-এইচ' কথিত পরীরা। কলকাতা সেদিন কিশোরীহীন। অথচ এই বাংলারই 'কিশোরী-ভজা' দলের গান ছিল—

> 'কিশোরী চরণে গয়াগঙ্গা কাশী।
> বৃথা পিণ্ডদান বৃথা একাদশী ॥...
> অধরে অধরে করিয়া মিলন।
> অধরামৃত রস কর আস্বাদন ॥
> প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন।
> দেখ যেন শশী না হয় পতন ॥'

কোথায় হারিয়ে গেল তারা ? বাংলামুলুকের মুকুলিত কিশোরীরা ? বাংলা কেন, উনিশ শতকের অন্তিমপর্বে ভূভারতেই তাঁদের খুঁজে পাওয়া ভার। বিশেষত, অপরিচিতজনের পক্ষে। কেননা, তারা সবাই তখন মাথায় ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়িতে। অথবা বাপের বাড়িতে। কিংবা মামার আশ্রয়ে। তবে যে যেখানেই থাক না কেন, প্রায় সবাই তারা বিবাহিত। ভেঁপু বাজিয়ে প্রায় সকলেরই মালাবদল হয়ে গেছে। কারও কারও ক্ষেত্রে অবশ্য সেটা স্মৃতিমাত্র,—হয়েছিল। কোনও একসময় বিয়ে হয়েছিল বটে!



একালের কিশোরীরা যারা দল বেঁধে স্কুলে কলেজে যাচ্ছে, পার্কে হৈ হৈ করে খেলছে, পথেঘাটে ঘুরছে সিনেমা থিয়েটার দেখছে, রেস্টুরেণ্টে খাচ্ছে, আড়ালে আবডালে না রেখেই বারবারা কার্টল্যাণ্ড বা সুনীল-সমরেশ পড়ছে, ইস্তক 'ললিতা',—তারা স্বপ্নেও বোধহয় ভাবতে পারবে না সেদিনের কথা। সে যেন অন্য জন্মের উপাখ্যান।

এদেশের বিয়ে, বলাই বাহুল্য, এখনও আদর্শ নয়। এখনও বাবা মা এ-ব্যাপারে শেষ কথা। আত্মীয়স্বজন বা পাড়ার পাঁচজন অবশ্য এখন কিছুটা গা আলগা করে দিয়েছেন। মাথা ঘামাবার সময় নেই। অবান্তরও বটে। কিন্তু বাবা মা এখনও সুপ্রিম কোর্ট। তাছাড়া রয়েছেন ঘটকরাও। তাঁদের এখন চেয়ার টেবিল সাইনবোর্ড হয়েছে। ওদিকে আবির্ভূত হয়েছে সুপার ঘটক—খবরের কাগজ। দু এক সেণ্টিমিটারে আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কথাবার্তা। কান পাতলে বোঝা যায় বল্লাল সেন বা দেবীবর এখনও পুরোপুরি বিস্মৃত নন। বলতে গেলে পুরোপুরি বিস্মৃত বরং বিদ্যাসাগর। পাত্রপাত্রী কলমে অন্তত।

তবু মানতেই হবে পরিস্থিতি অনেক উন্নত। কিছুকাল আগে ভারত সরকার একটি জাতীয় কমিটি

**২১. পঞ্চকন্যা। প্রগতিশীল ঘরের এই কিশোরী-তরুণীরা ছিল অন্ধকার বৃত্তে বাইরে।**

বসিয়েছিলেন এদেশের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। ১৯৭৪ সনে তাঁদের প্রতিবেদন (টুওয়ার্ডস ইক্যুয়ালিটি, রিপোর্ট অব দি কমিটি অন দি স্টেটাস অব উইমেন ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৭৪) প্রকাশিত হয়। তা থেকে কিছু দরকারী খবরাখবর শোনা যেতে পারে।

ওঁরা বলছেন—হাল আমলে বিয়ের বয়স বেশ বেড়েছে। ছেলেদের এবং মেয়েদের, দু' তরফেরই। ১৯০১-১১ সনের মধ্যে বিয়ের সময় পুরুষের গড় বয়স ছিল ২০·২ বছর, মেয়েদের ১৩·২ বছর। ১৯৬১-৭১ সনে তা বেড়ে যথাক্রমে দাঁড়ায় ২২·২ বছর এবং ১৭·২ বছর। এ হিসাব ১৯৭১ সনের লোকগণনার প্রাথমিক ফলাফলের ভিত্তিতে। গড় বলতে এখানে বলা হচ্ছে সর্বভারতীয় গড়। প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছে ভারতের অনেক এলাকারই বিয়ের সময় মেয়েদের গড় বয়স ছিল ১৫-এর নিচে। হিসাব থেকে স্পষ্ট বর কনের বয়সের ব্যবধানও ক্রমে কমছে। তার মানে কি এই যে, দেশ থেকে শিশু বা কিশোরীর বিয়ে কি পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে ? বাল্যবিবাহ বলতে কিছুই কি আর নেই। ১৯৭১-এর লোকগণনার ভিত্তিতেই প্রতিবেদকরা জানিয়েছেন এদেশের মেয়েদের মধ্যে যাদের বয়স ১০ থেকে ১৪, তাদের শতকরা ১৩·৭৯ জনই বিবাহিত ! পুরুষদের ক্ষেত্রে অনুপাত ৫·৩১%। অর্থাৎ, চৌদ্দর মধ্যেই শতকরা চৌদ্দজন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এবং, আরও খবর, এই বিবাহিতদের দলে বেশ কিছু বিধবাও রয়েছে। ০-১০ এই বন্ধনীর মধ্যে যাদের বয়স আদমসুমারিতে তাদের বিয়ে সংক্রান্ত কোনও তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি। করলে হয়তো দেখা যেত ওই দলেও রয়েছে কিছু কিছু বিবাহিত, এমন কি বিধবা মেয়ে। কমিটি জানিয়েছেন তাঁরা দ্বারভাঙ্গার গাঁয়ে তিন বছর বয়সের কুলবধূর দেখা পেয়েছেন। তার কপালে সিঁদুর। আর, ইন্দোরের এক কারখানার ক্রেসে-র ভিড়ে পেয়েছেন আর এক বধূকে যার বয়স মাত্র আঠারো মাস !

আইন মানলে কিন্তু এত কম বয়সে কোনও মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। সারদা আইন বা বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনটি পাস হয় ১৯২৯ সনে। সে আইনে বরের নিম্নতম বয়স ধার্য হয়েছিল ১৮ বছর, কনের ১৪। ১৯৪৯ সনে আইনটি সংশোধন করে কনের বয়স এক বছর বাড়িয়ে হয়। বলা হয় পনেরোর আগে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া চলবে না। ১৮৭২ সনে ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলে যখন বিশেষ আইন চালু হয়, তখনও বলা হয় চৌদ্দ না হলে কোনও মেয়েকে এ আইনে বিয়ে করা যাবে না। ১৯৫৪ সনের বিশেষ বিবাহ আইন বর-কনের নিম্নতম বয়স ধার্য করেছে ২১ আর ১৮ বছর। পরের বছরের হিন্দু আইন অনুযায়ী অবশ্য বয়স কিছুটা কম হলেও বিয়ে করা যেতে পারে। তবে বরের বয়স হওয়া চাই কমপক্ষে ১৮ এবং কনের ১৫ বছর। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে দেশের কোনও আইন অনুসারেই পনেরোর কম বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বা বিয়ে করা চলে না। আইন অমান্য করলে বিয়ে অবশ্য নাকচ হয়ে যাবে না, তবে শাস্তি হতে পারে বই কি ! কিন্তু হচ্ছে কি ? বোধহয় না। ওই প্রতিবেদনেই দেখা গেছে ১৯৭১ সনে এদেশে দশ বছরের ওপর যত মেয়ে তাদের শতকরা ৬৪·৯ জনের বিয়ে হয়ে গেছে। অবিবাহিত শতকরা ২২·০ জন, বিধবা ১২·৫ জন, এবং বিয়ের পর স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন ০·৭ জন। ওই সব সংখ্যাতত্ত্ব থেকে কেউ কখনও জানতে পারবেন না যাদের বিয়ে হয়ে গেল তাদের সকলেরই কি পছন্দমতো বিয়ে হল ? এই দলে কি অসম বিয়ে, অর্থাৎ বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা নেই, দোজবর তেজোবর নেই, সতীন নেই, বালিকা বধূ নেই ? জানতে পারবেন না যাদের তখনও বিয়ে হয়নি সে কি কম বয়স বলেই ? দলে নিশ্চয় এমন অনেক মেয়ে আছে যাদের আর কোনদিনই বিয়ে হবে না। হয়তো তাদের মধ্যে একদল অবিবাহিত থাকবেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু অন্যদের পক্ষে সেটা বাধ্যতামূলক হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। হয়তো সমাজ ঘর মেলেনি, হয়তো পারানির কড়ি জোগাড় হয়নি ? মুদ্রারাক্ষসদের ক্ষুধা মেটানো সম্ভব হয়নি। এমনি আরও অনেক ভাবনাই মাথায় আসে।

ওই যে শতকরা বারো তেরোজন বিধবা তাদের মধ্যে বিবাহযোগ্য ক'জন, তা-ই বা কে জানে ! তাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন ? আইন তো পাশ হয়ে গেছে সেই কবে, ১৮৫৬ সনে ! তখন কিন্তু মনে হয়েছিল আঠারশ' সাতান্নর মতোই যুগান্তকারী ঘটনা ছাপ্পান্নর বিবাহ আইন । '—আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে । শঙ্খ শাড়ি পরিয়া প্রস্তুতভাবে রবে ॥' —আর কতকাল ? বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনাই বা এত কম কেন ? ১৯৭১ সনে শতকরা ০·৭ জন স্ত্রীকে বাদ দিলে আর সবাই কি সুখী গৃহিণী ? সন্দেহ হয় । কারণ ওই প্রতিবেদনেই রয়েছে আরও কিছু কিছু অস্বস্তিকর খবর । প্রথম তথ্য : এদেশে পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি । দ্বিতীয় : ১৫ থেকে ৩৪ বছরের মেয়েদের মধ্যেই আত্মঘাতিনী বেশি । তার পরেই জীবনে যাদের আগ্রহ কমে যায় তাদের বয়স ৩৪ থেকে ৫৪ বছর ! তৃতীয় সংবাদ : শতকরা ৮·৬ ভাগ মেয়ে আত্মঘাতী হন শ্বশুরবাড়ির আবহাওয়া সহ্য না করতে পেরে । শতকরা ৬·৩ ভাগ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ বা বোঝাপড়ার অভাবে । বিবাহ-বিচ্ছেদ অন্তত এদের একাংশকে বাঁচাতে পারত নিশ্চয় !

সত্য বলতে কী, এই অতিসংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় স্পষ্ট,দিন পাল্টাচ্ছে বটে, কিন্তু মূল নকশাটি এখনও পাল্টায়নি । কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র । সেকালে ছিল সতীদাহ । ঢাকঢোল পিটিয়ে যুবতী মেয়েকে অগ্নিতে সমর্পণ । একালে অনুষ্ঠান শ্মশানে নয়, ঘরে । কখনও ফ্ল্যাট বাড়িতে, কখনও শ্বশুরের আপন অট্টালিকায় । সে মারণোৎসবে একালের সংকীর্তনে যোগ দেন শাশুড়ি, দেবর আর ননদেরা—এই যা ।

একবিংশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে যখন এইসব দৃশ্য, তখন উনিশ শতকের শেষ প্রহরে অন্ধকার যে আরও গাঢ় হবে তাতে আর বিস্ময় কী ! বাঙালির জাতীয় বুরুঞ্জিতে সেই প্রলম্বিত অমাবস্যাকে বোধহয় বলা চলে কিশোরী ভজনার যুগ । আদিবাসী আর নিম্নবর্গের মানুষকে বাদ দিলে, বলতে গেলে প্রায় গোটা

২২. বর আর কনেকে ঘিরে আপনজনেরা । এই শতকের প্রথম দিকের একটি পারিবারিক ছবি ।

ভারতই সেদিন কিশোরী ভজনায় মগ্ন। তবু বিশেষ করে বাঙালির কথাই এখানে বলা হচ্ছে, কারণ তার আগে এ মুলুকে ডিরোজিও-রামমোহনের যুগ অতিক্রান্ত,বিদ্যাসাগরের কালও প্রায় অন্তিমে। তা সত্ত্বেও শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে নির্লজ্জের মতো চলছিল বিকৃত যৌনাচার। গৌরীদান এবং গ্রহণের নামে ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের মতো উৎকট সাধনা—যদৃচ্ছ কিশোরী ভজনা।

আগেই বলেছি, 'পরী'রা সেদিন আলোয় অদৃশ্য। তারা ঘোমটার আড়ালে আঁধারলোকের বাসিন্দা। কেননা, শাস্ত্রে বলেছে—'অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।/ দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা উর্ধ্বং রজঃস্বলা ॥' ইত্যাদি। শুধু ওই দুটি বাক্য নয়, আরও কিছু বাক্য এসেছে ছন্দ মিলিয়ে পর পর। সরল বাংলায় তার মর্ম ভয়াবহ। যথা : আট বছরের কন্যাকে গৌরী বলে, নয় বছরের কন্যাকে রোহিণী, আর দশ বছরের কন্যাকে—কন্যা। তারপরে, অর্থাৎ দশের ওপরে যারা তাদের বলে—রজঃস্বলা। বারো বছর হয়ে গেলেও যিনি কন্যাদান করেন না তাঁর পিতৃলোকের মানুষরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজঃস্বলা দেখলে মা বাবা এবং বড় ভাই নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতাবশত অন্ধ হয়ে সেই কন্যাকে বিয়ে করেন, তিনি সম্ভাষণের অযোগ্য, তাঁর সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে ভোজন করতে নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং, মেয়েরা মায়ের কোল থেকে নামতে না নামতে শুরু হয়ে যেত দৌড়াদৌড়ি। কার আগে কে মেয়েকে বলিদান করতে পারেন তার জন্য ছুটোছুটি। তাই বুঝি বাংলা প্রবাদের কথা—বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র! সকলেরই চেষ্টা ভোরের প্রথম গাড়িটি ধরার জন্য। অর্থাৎ, আট বছরের মেয়েটিকে দান করার জন্য। একান্ত না পারলে দশের জন্য অপেক্ষা। তাও ধরতে না পারলে এগারোয়। কিন্তু বারোর পরে কিছুতেই নয়!

'আমার ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। হিন্দুর নিয়ম মত এক বৎসর বাপের বাড়ি ছিলাম। তারপর ১০ বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ি আসি। শ্বশুরবাড়ি ও বাপেরবাড়ি এ-পাড়া ও-পাড়া বলিলেই হয়। বাবা আমার বিবাহের পর আমায় শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া কাশীধামে গিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ি আসিবার পূর্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিংবা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া একমাস পর্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা যখন জোর করিয়া শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন।' এ জবানবন্দী কেশব সেনের মা সারদাসুন্দরীর। (জন্ম ১৮১৯)।

'গৌরী', 'রোহিণী' বা 'কন্যা'রা সবাই নিজেদের আত্মকথা লিখে যাননি। তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন। শিখলেই বা আট নয় বছরের মধ্যে কতটুকু আর শিখতে পারতেন। যাঁরা নিজের চেষ্টায় বা খুব উদার স্বামীদের উৎসাহে পড়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরাও বই লিখবেন বলে তা শেখেন নি। এখনই বা লেখাপড়া জানা মানুষের মধ্যে আত্মকথা বলার তাড়না কয়জনের থাকে। অথচ ভেবে দেখলে সব মানুষের জীবনই অভিজ্ঞতার একটি কুবেরের-ভাণ্ডার। সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, আশা নিরাশা, ভয়ভাবনার কত উপাখ্যান। তবু উনিশ শতকের কিছু কিছু বাঙালি মহিলা তাঁদের নিজেদের কথা শুনিয়ে গেছেন আমাদের। সংখ্যায় গোনাগুনতি হলেও সেগুলো, বলা নিষ্প্রয়োজন, এক একখানা অমূল্য দলিল। তবে মনে রাখা দরকার ওঁরা সবাই আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন পরিণত বয়সে। অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশের খাতা যখন বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। স্বভাবতই কোলে পিঠে চড়ে বাপেরবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাত্রার স্মৃতি তখন অনেকের কাছে ধূসর। কিংবা অবান্তর। অথবা নিছক কৌতুক। তার মধ্যেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোপন নেই বিষাদ। গা ছমছম ভয়। বিভীষিকা।

বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাত্রার কাহিনী শোনাচ্ছেন রাসসুন্দরী দেবী (জন্ম-১৮০৯)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মচরিত লেখিকা।

**২৩. বিস্ময় বিহ্বল দুই শিশুকন্যা। এরা আলোকিত পরিবারের সন্তান।**

'আর কাঁদিতে পারিনা। ইতিমধ্যে ঘোর নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে কোথায় গিয়াছি তাহার কিছুই জানিনা। পর দিবস প্রাতে জাগিয়া দেখিলাম আমি এক নৌকোর উপরে রহিয়াছি। আমার নিকট আত্মীয়বর্গ কেহই নাই; আর যত লোক দেখিতে লাগিলাম ও যত লোকের কথা শুনিতে লাগিলাম, তাহার মধ্যে একজন লোকও আমি চিনি না এবং কাহাকেও কখনও দেখি নাই। তখন আমি কাঁদিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম, আমার মা কোথায় রহিলেন, আমার পরিবারগণ বা কোথায় রহিল··· । এই ভাবিয়া এককালে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এ প্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ···আমার চক্ষের জল একবারে শতধারে পড়িতে লাগিল, কিছুতেই রক্ষা হয় না। কাঁদিতে

২৪. কনের বেশে। এই পরিবারে সেদিন বইছে পশ্চিমী হাওয়া।

কাঁদিতে আমার প্রাণ শ্বাসগত হইল, আর কাঁদিতেও পারি না। ...আহা আমি যে তখন কী ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহা কেবল সেই বিপদভঞ্জনই জানেন ; অন্য কেহ জানে না।—এখন কখন মনে পড়ে সেই দিন।/ পিঞ্জরেতে পাখি বন্দী, জালে বন্দী মীন ॥'

রাসসুন্দরীর তবু বিয়ে হয়েছিল দশ পেরিয়ে। কারও হত আরও আগে। বড়ঘর হলে ওই সব শিশুবধূদের সঙ্গে যেত বাপের বাড়ির দাসী। অবস্থা অনুযায়ী এক বা একাধিক। আর যেত ঝুড়ি ঝুড়ি খেলার পুতুল। দিশি, বিদেশি। বেশির ভাগই বর কনে। সাহেব মেম। কিংবা সন্তান কোলে মা। হাতে পো, কাঁধে পো। কলকাতার অনেক বনেদি বাড়িতে খোঁজ নিলে হয়তো দেখা যাবে এখনও কাচের আলমারিতে সাজানো রয়েছে সেসব পুতুলের অবশিষ্ট। ঠাকুমা কিংবা তাঁর আগেকার দিনের স্মারক। পড়ন্ত বাড়ি থেকে সন্ধানী অ্যান্টিকডিলাররা সেসব স্মৃতি স্বল্পমূল্যে কিনে নিয়ে একালের বড়মানুষদের কাছে মোটা টাকায় বিক্রি করেন। কেননা, ইউরোপেও সেসব পুতুলের নমুনা এখন দুষ্প্রাপ্য। শ্বশুরঘরের পরিবেশ অনুকূল হলে এসব পুতুল ঘিরে তখন শুরু হয়ে যেত পাড়াপড়শির শিশুকন্যাদের জটলা। নতুন বৌয়ের সঙ্গে এভাবেই ক্রমে গড়ে উঠত কারও কারও বন্ধুত্ব।

আর বরের সঙ্গে ? সে সখ্য গড়ে উঠত কখন ? সত্য বলতে কী, ধাঁধা তা-ই নিয়ে। নিচের তালিকাটির দিকে একনজর তাকালেই বোঝা যাবে স্বামীস্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে সেদিন কী হিমালয়তুল্য বাধা। এই বাধা, বলাবাহুল্য, বয়সের। একদিকে উনিশ শতকের কয়জন শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ও বিয়ের সময় (কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রথম বিয়ের) তাঁদের বয়স দেওয়া হল। পাশাপাশি দেওয়া হল কনেদের বয়স। পরিস্থিতি বিবেচ্য।

| নাম | বয়স | স্ত্রীর বয়স |
|---|---|---|
| দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৪/১৫ (১২) | ৬ |
| ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | ১৪ | ৮ |
| রাজনারায়ণ বসু | ১৭ | ১১ |
| কালীপ্রসন্ন সিংহ | ১৪ | — |
| শিবনাথ শাস্ত্রী | ১২/১৩ | ১০ |
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১১ | ৫ |
| কিশোরীচাঁদ মিত্র | ১৮ | ১১ |
| রমেশচন্দ্র দত্ত | ১৬ | — |
| সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৭/১৬ | ৭(৮) |
| বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী | — | ৬ |
| জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯ | ৮(৯) |
| রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ২২ | ১১ |
| হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯ | ১০(১২) |
| জানকীনাথ ঘোষাল | ২৭ | ১৩ |
| কেশবচন্দ্র সেন | ১৮ | ৯(৮) |
| ডব্লিউ সি ব্যানার্জি | ১৫ | ১০(১১) |

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই তালিকার মূল ভিত্তি গোলাম মুরশেদ-এর গবেষণাপত্র। (রিলাকট্যান্ট দেবুতাঁত, রেসপনস অব বেঙ্গলি উইমেন টু মডার্নাইজেশন, ১৯৮৩) অবশ্য কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। বন্ধনীতে উল্লিখিত বয়স দ্বিতীয় মত মাত্র। তাতে অবশ্য পরিস্থিতির খুব হেরফের হচ্ছে না। অনেকের ধারণা, বিয়ে যখনই হোক, কনে সোমত্ত না হলে দ্বিরাগমন হত না। বউ ততদিন বাপের বাড়িতেই থাকত। কিন্তু সব পরিবারে সে নিয়মের চল ছিল না। ঠাকুরবাড়িতে তো নয়ই। বিয়ের অনুষ্ঠানের পরই শিশু-বধূ দেউড়ি পেরিয়ে ঢুকত এসে ওই বিশাল বাড়িতে। মেয়েরা ভয়ে কাঁদবে বইকি।

দেবেন্দ্রনাথের বিয়ের গল্প শুনিয়ে গেছেন পুত্রবধূ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। '—তাঁর এক কাকা কলকাতায় শুনেছিলেন যে, আমার শ্বশুরমশায়ের জন্য সুন্দরী মেয়ে খোঁজা হচ্ছে। তিনি দেশে এসে আমার শাশুড়িকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন তাঁর মা বাড়ি ছিলে না—গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলেন। বাড়ি এসে মেয়েকে দেওর না বলে কয়ে নিয়ে গেছে শুনে উঠোনের গাছতলায় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।' এই মেয়ে পরবর্তীকালে রত্নগর্ভা সারদা দেবী। বিয়ের সময়, আগেই বলা হয়েছে, তাঁর বয়স ছয় বছর।

বরের তরফে অনেকটা ছেলেধরার ভঙ্গি, আর কনের বাড়িতে লোকেরা যেন বেড়াল পার করছেন। বর্ধমানের এক কুলীন ঘরের মেয়ে নিস্তারিণীর (জন্ম-১৮৩৩) বিয়ে হয়েছিল এক 'বিবাহ ব্যবসায়ী' কুলীনের সঙ্গে। তার বয়স দশ বছর। স্বামী ঈশ্বর চাটুজ্জের তার আগেই ত্রিশ চল্লিশটা বিয়ে হয়ে গেছে। তাতে কিছু আসে যায় না। কুলীনদের মধ্যে ওসব গা-সওয়া। স্বভাবতই নিস্তারিণীকে আর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হয়নি। কিন্তু তাঁর দাদার বৌকে শ্বশুরবাড়ি আনা হয়েছিল। বিয়ের দিন একরত্তি কনে জ্বরে ধুকছে। তার বিয়ে দিয়েছিলেন মামারা। তাঁরা মেয়েকে তখুনি শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে রাজি নন। কিন্তু নতুন জামাইয়ের জিদ। সে খালি হাতে ফিরবে না। এক মামা বললেন—জামাই চাইনে। কিন্তু আর একজন ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি বললেন—'যখন জামাই অত জিদ কচ্চে, তখন মেয়ে না বাঁচে জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে ; আমরা তো দান করেছি, আটকে রাখতে পারিনা।' নদীপথে শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতে জ্বরে কাতর বৌ কাঁদে, আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়—'এই দেখ কেমন চাঁদ উঠেছে। কেমন হাওয়া দিচ্ছে। কুমির চলে গেল। শুশুক ভাসছে।'

**২৫. দার্জিলিংয়ে মহারানী গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষিকারা। এই শতকের প্রথম দশকে।**

স্থির সৌদামিনী (জন্ম-১৮৪২) বিখ্যাত শিশিরকুমার মতিলাল ঘোষদের বোন। রাসসুন্দরীর নিকট আত্মীয়া। তাঁরও বিয়ে হয়েছিল বাল্যবয়সে। তার মায়ের বিয়ে আড়াই বছর বয়সে। 'আর দাদার বিয়ে হয় পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে। ন্যাড়া মাথায় চেলির শাড়ি পরে নাপিতের কোলে চড়ে সে বিয়ের আসরে এসেছিল। শুধু কি তাই? পরদিন 'বরকনে আমাদের বাটিতে আসিল। বৌ উলঙ্গিনী অবস্থায় সারা বাটি নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।'---(অন্তপুরের আত্মকথা, চিত্রা দেব, ১৯৮৪) চিত্রা দেব এ ধরনের আরও কিছু কিছু কাহিনী শুনিয়েছেন তাঁর বইয়ে।



এদের নিয়েই সেদিন বাঙালির ঘরসংসার। বাঙালি যুবকদের খেলাঘর। এরাই ধর্ম। এরাই অর্থ বা অনর্থ। এরাই পাতা খোলা কামসূত্র।

সেকালের বাংলা প্রহসনের (বাল্যদাহ নাটক, শ্যামাচরণ শ্রীমানি, ১৮৬০) একটি চরিত্র বিদ্যাহীন দাম্ভিক অতএব পয়ারে আউড়ে যায় মনের কথা :

"ছেলেবেলা বিয়ে হোলে হয় বড় মজা।
শাশুড়ি তুলিয়া দেয়, খায় খাজা গজা ॥
আদর করিয়া বড় শালী লয় কোলে।
বড় বড় মাছ খায় ঝালে আর ঝোলে ॥
কত মত কথা শেখে নানা রঙ্গ রস।
যাহাতে করিবে পরে রমণীরে বশ ॥ ...
ঘুম পাড়াইতে আসে যত কুলনারী।
রতিশাস্ত্র শিখাইতে বসে সারিসারি ॥
কোমল কামিনীকর গাত্রেতে বুলায়।
কি কহিব স্মরণেতে দুঃখ দূরে যায় ॥"

ওই সব শিশু আর কিশোরী কাঁদতে কাঁদতে সবে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছেছে। সেখানে কোলে কোলে ফেরার ভাগ্য নিয়ে আর ক'জনের বিয়ে হত? কয়জনই বা সুযোগ পেত পুতুল খেলতে খেলতে বড় হয়ে

**২৬. কলকাতার ডায়সেশন কলেজের একদল ছাত্রী ও অধ্যাপিকা। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে।**
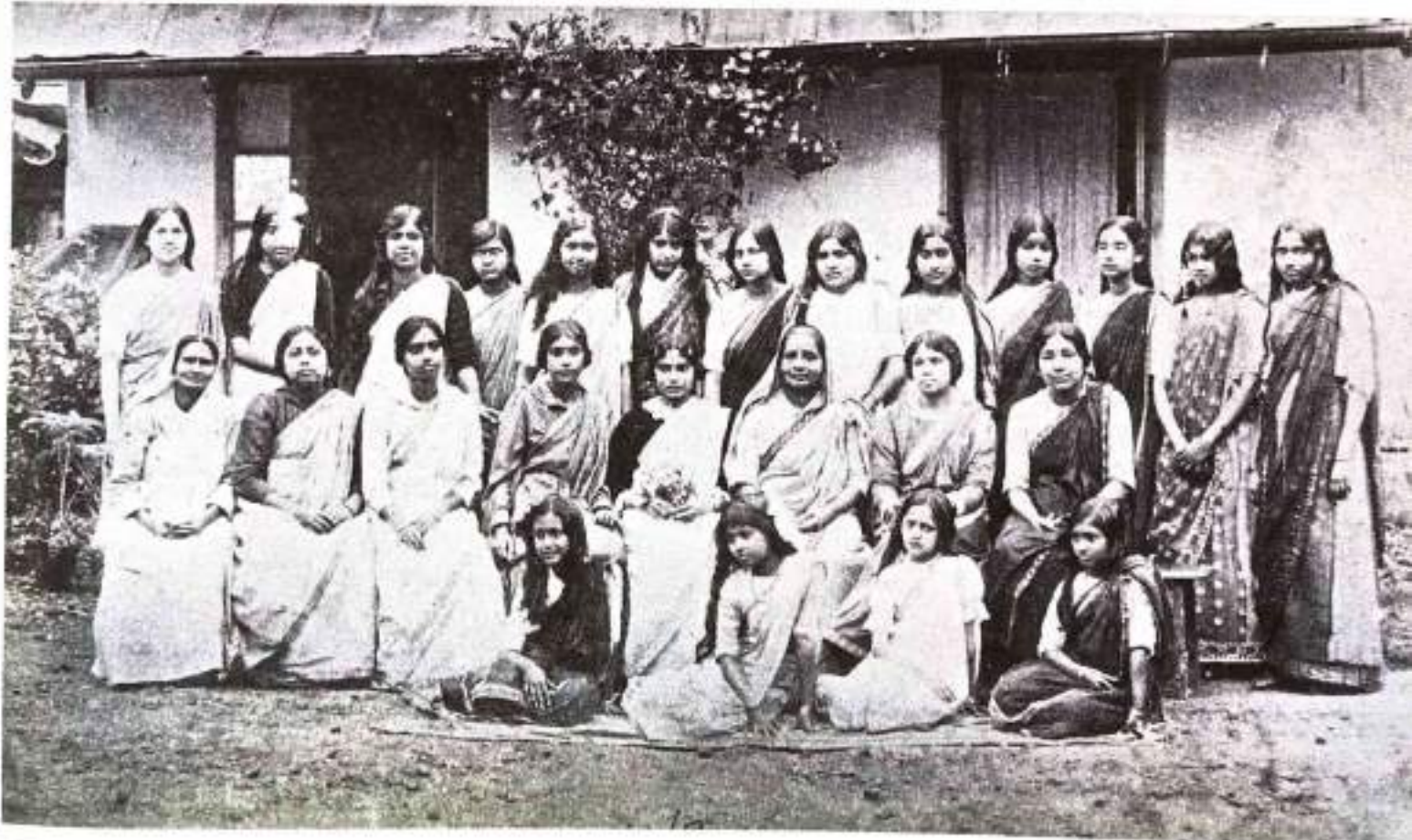
ওঠার ? সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের ঘরে অনেক সময়ই নববধূর ভূমিকা শিশু শ্রমিকের—দাসীর। বলতে গেলে—ক্রীতদাসীর। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (জন্ম-১৮২২) তাঁর বালিকাবধূর দিনের কাজের যে খতিয়ান দিয়েছেন তা পড়লে একালের আদুরীরা শিউরে উঠবেন।

'প্রথমত, অতি প্রত্যুষে নিদ্রোত্থিত হইয়া ঘর গোময় দিতে হইবে।...প্রতিদিনই বাটীর ভিতরকার গৃহগুলি সমুদায়ই গোময় দিতে হইত ; একদিনও বাসিগৃহ থাকিতনা। তারপর গোয়াল পরিষ্কার করা।''পরে ঘটি বাটি প্রভৃতি সংসারের পিত্তল কাঁসার পাত্রগুলি বালি ও অম্ল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়।...এতদ্ভিন্ন বালকবালিকাদের (শাশুড়ির ছেলেমেয়েদের) প্রাতরাশঃ দিতেন ও অন্যবিধ লালনপালন করিতেন। অনন্তর গঙ্গাস্নান গমন।...মা আমার প্রত্যহই বধূটিকে সঙ্গে লইয়া দুইজনে কলসি কক্ষে জল আনিতেন। ঐ জল সকলের খাইবার জল। আমার স্ত্রীর দ্বিতীয় বস্ত্রাভাবে আর্দ্র বস্ত্রেই আসিতে হইত।...বাটি আসিয়া ঐ কলসি রাখিয়াই অন্য কলসি লইয়া অন্য পুষ্করিণী হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জল আনিতে হইত। এইরূপে দুই তিনবার না আনিলে সকল কার্য্য সংকুলান হইত না।' তারপর বহুকষ্টে উনুন ধরানো এবং রান্না। সকলকে খাইয়ে যা রইল তা-ই দিয়ে কোনও মতে খাওয়া। খাওয়ার পর আবার রান্নাঘর লেপা। বাসন মাজা। এভাবেই দিন গড়িয়ে যায়। বিকালে আবার গঙ্গা থেকে জল আনা। কুটনা কুটা, বাটনা বাটা। ফের উনুন ধরানো। রান্না। সবাইকে খাইয়ে খাওয়া। আগুনের মালসা সাজানো। গরুকে খাবার দেওয়া। এসব সেরে '৪/৬ দণ্ডের পর যেমন বিছানায় পড়িতেন, অমনি গভীর নিদ্রাতে রাত্রি যাইত ; স্বামীর কথা চিন্তা করিবারও অবকাশ হইত না।'

এই পাকা গিন্নিটির বয়স কিন্তু মাত্র দশ বছর! নিজের বিয়ে প্রসঙ্গে বিদ্যারত্ন লিখেছেন—'আমার ১১ বৎসর বয়সে, উৎকট পীড়ার পর নব শরীরধারিণী খাঁটি খাঁটি কেশভূষিতা মস্তকা ১০ম বর্ষীয়া বামাসুন্দরীর সহিত বিবাহ হইল। ...আমার শরীর সৌষ্ঠব দেখিয়া দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলে পরমাহ্লাদিত হইল।' লক্ষণীয়, এগারো বছরের কিশোর নিজের শরীর নিয়ে রীতিমত গর্বিত। সুতরাং বামাসুন্দরীর দীক্ষাপর্ব ত্বরান্বিত হয়ে থাকলে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিদ্যারত্ন লিখেছেন বামাসুন্দরীর শৈশব কেটেছে কাজ আর কাজে। তাঁর কাছে অবশ্য শৈশবই যৌবন। তাঁর নিজের ভাষায়—'এইরূপে প্রত্যহ পরিশ্রম করিয়া, প্রথম যৌবন অজ্ঞানপূর্বক অতীত হইয়াছিল। সপ্তাহে বা পক্ষান্তরে আমি একদিনের জন্য বাটি যাইলে, সেদিন তাড়াতাড়ি সকল গৃহকার্য্য শেষ করিয়া স্বামিসহ শয়ন করিতেন। এবং নানা কথায় অজ্ঞাতসারে প্রায় অনিদ্রাতেই রাত্রি প্রভাত হইত। পরদিন সেই অনিদ্রার আবল্যবশতঃ সকল গৃহকার্য্যই শিথিলভাবে ঘটিত ; তাহা দেখিয়া মা আমার বধূটিকে বিস্তর তিরস্কার ঠাট্টা করিতেন। তাহাতে বড়ই লজ্জিত হইতেন।'

কান্না। পুতুল খেলা। অথবা ঘরকন্না। ভয়। উদ্বেগ। উৎকণ্ঠা। ভারতচন্দ্রের ভাষায় বাঙালি বধূর চারদিক ঘিরে 'শাশুড়ি রাগিণী, ননদী বাঘিনী, সতনী নাগিনী বিষের ভরা'। তারই মধ্যে দাম্পত্য জীবনও অসম! গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে স্ত্রী বামাসুন্দরীর বয়সের পার্থক্য ছিল অবশ্য মাত্র একবছর। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে প্রায়শ বেশি। শতক যত এগিয়ে চলে ততই পুরুষের বিয়ের বয়স বাড়তে থাকে। কারণ, লেখাপড়ার চল বাড়ছে। স্কুলের ছেলে আর বিয়ে করতে চাইছে না। ওদিকে বাড়ছে জীবনসংগ্রামে তীব্রতা। রুজি রোজগারের পথ সীমাবদ্ধ। প্রতিযোগিতা তীব্র। সুতরাং, ঝাঁপ দেওয়ার আগে বাঙালি তরুণ চোখ মেলে একবার সামনের দিকে তাকাতে চাইছে। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন নেই। কন্যা উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে যেমন দায়, শেষ প্রহরেও তেমনই দায়। সিন্ধুবাদ নাবিকের গল্পের বুড়োর মতো কিছুতেই ঘাড় থেকে নামছেন না মনু। বরং, যেন আরও চেপে বসেছেন। সুতরাং, পূর্ণ যুবকের শয্যায় কিশোরী তখন ব্যতিক্রম নয়, বলতে গেলে নিয়ম। একেই বোধহয় বলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো। সেটা

ইচড়-পক্কদের কাল । বাঙালি তথা ভারতীয়দের যৌনতার সত্যকার তথ্যনিষ্ঠ ইতিবৃত্ত যদি কোনওদিন লেখা হয়, তবে দেখা যাবে পেছনে রয়েছে অনেক পরুষ হাতে অনেক আধফোটা ফুল ছিন্নভিন্ন করার কাহিনী । বাঙালির ফুলসজ্জায় সুরভিত পূর্ণ বিকশিত ফুল সেদিন দৈবাৎ, শয্যা কলঙ্কিত প্রায়শ দলিত মথিত কুঁড়িতে ।

এরা এক বিশেষ সম্প্রদায় । এরা তথাকথিত স্বামী-সোহাগিনী । এদের বাদ দিয়েও কিন্তু দেশে সেদিন অসংখ্য কিশোরী । তাদের এক এক দলের এক এক দশা ।

প্রথমে বাল বিধবাদের কথাই ধরা যাক । দুঃখের প্রতিমা তারা । —'বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল ।/ বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥' ঢোল ঠিকই বেজেছিল । বিদ্যাসাগর মশাইয়ের এক একটি 'প্রস্তাব' যেন যুগান্তকারী ইস্তাহার । সমাজের কানে তালালাগানো বিস্ফোরণ । মনু পরাশর তছনছ । সমাজপতিরা ভয়ে বিবর্ণ । একই সঙ্গে বীররস এবং করুণরস । শাস্ত্রের যুক্তি এবং মানবিকতার আর্তি । একবার যাঁরা পড়েছেন চিরকাল তাঁদের কানে বাজবে সেই ধিক্কার—"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ । আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে ! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে । অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত ।...তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায় ।...হা অবলাগণ তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না ।'

কিন্তু এই ধিক্কার ক'জনের কানে আর পৌঁছেছিল ? দেশের মানুষ কুসংস্কারের জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারলেন কই । বিধবা বিবাহ সিদ্ধ ঘোষণা করে ১৫ আইন চালু হয় ১৮৫৬ সনে । শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' শাড়ি বুনলেন । তার পাড়ে লেখা —'...আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়েছেন সই/এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতিপ্রাপ্ত হই ।' কিন্তু সে ইচ্ছা অনেকের জীবনেই অপূর্ণ রয়ে যায় । কিছু কিছু বিয়ে তখন হয়েছিল বটে, কিন্তু বেশ কিছু মেয়ে প্রতারিতও হয়েছেন । বিয়ের পর বররা কেউ কেউ পালিয়ে গেছে স্ত্রীর সর্বস্ব নিয়ে । বিদ্যাসাগর সেকারণেই পরে বিধবা বিয়ে দিতে চাইলেন আর একটি আইনে । ব্রাহ্মদের আন্দোলনের ফলে সে-আইন পাস হয়েছিল ছয় বছর পরে, ১৮৭২ সনে । এই বিশেষ বিবাহ আইনে বাল্যবিবাহ সম্ভব ছিল না । বহুবিবাহও না । অথচ বিধবা বিবাহ সম্ভব ছিল । সিদ্ধ ছিল অসবর্ণ বিবাহও । বিদ্যাসাগর ১৮৮৩ থেকে ১৮৯০ সনের মধ্যে এই আইন মাফিক নিজের খরচে অন্তত আটজন বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে, ১৯০১ থেকে ১৯১০ সনের মধ্যে এই বিশেষ বিবাহ আইনে বিয়ে হয়েছিল ৩৩৫ জন বিধবার ।

বলাবাহুল্য, সমাজে বিধবার সংখ্যার অনুপাতে এই ভাগ্যবতীরা জনাকয় মাত্র । উনিশ শতকের শেষ পাদে বৈধব্যজ্বালায় জ্বলছেন অসংখ্য বিধবা । তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই যাকে বলে,—বালবিধবা । অনেক মেয়ে অবশ্য 'গৌরী' হওয়ার আগে শৈশবে মারা যেত । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে শিশুমৃত্যুর হার সুউচ্চ । শিশুদের মধ্যে আবার মেয়েদের হার বেশি । বিয়ের পরও তা-ই । আদমসুমারির হিসাবে দেখা যায় ১৩ থেকে ২১ বছরের মধ্যে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি মারা যান । পর্দা, অন্দরের

অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপুষ্টি, পুত্রকন্যার বন্যা—সব মিলিয়ে অন্তঃপুরে মহামারী। যেন যমপুরী। যাদের স্বামী মারা গেলেন তারাও জীবন্মৃত। বেঁচে থেকেও মৃতপ্রায়। সম্পত্তির অধিকার নেই। পোশাকে শোকের বিগ্রহ। খাদ্যাভ্যাসে কার্যত বায়ুভুক। বিলাসিতা স্বপ্নাতীত। 'বিধবার দাঁতে মিশি' ব্যঙ্গাত্মক নাটিকার নাম। তার পক্ষে পান চিবানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ আচার। দাশরথী রায় পাঁচালীতে গাইতেন—

"বিধবা হলে বাল্য দশায়, ছাই পড়ে সব সুখের আশায়/ পরের লাগিয়ে পরম দুঃখ।/ রমণ বিনে ঘরে বাস, মাসে দুটো উপবাস/ পোড়াকপালে নারীর এই ত সুখ!"

বিধবা বিবাহের সমর্থনে কিছু কিছু নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতাও কলম ধরেছিলেন। দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র (১৮৬৬) রামমণি প্রশ্ন তুলেছিল—'অনেক সময় মেয়ে দ্বিতীয় বিয়ে না হতে বিধবা হয়েছে, তারা স্বামী কখন দেখেনি, তাদের বিয়ে দিলে দোষ কি?' যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের চপলা (চিত্তচাপল্য' ১৮৫৭) নাটকে বালবিধবা বিনোদা সত্যি কথা বলতে ইতস্তত করেনি। সে বলেছিল—"সত্তি বলতে কি এখন আমাদের পুজো করবার বয়স হয়নি, মনই স্থির থাকে না, কত দিকে যায়। তবে যে কল্লে লোকে নিন্দে কর্বে, আর গুরুপুরুত দেখা হলেই আশীর্বাদ করেন—'ধর্মে মতি হোক।' তাই বোন ধর্ম করি!" এসব নাটক-প্রহসনের সাহিত্য-মূল্য যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, লেখকরা বাস্তবের কাছাকাছি। বিধবা-বিবাহ নিয়ে দেশে তুমুল আন্দোলন হল। আইনও পাস হল। কিন্তু অধিকাংশ বিধবারই ভাঙ্গা কপাল আর ফিরল না। অথচ, বলা নিষ্প্রয়োজন, অনেকের মনেই তখন সুপ্ত আশাবাদ। এক প্রহসনে (বিধবা বিবাহ, শিমুয়েল পির বকস, ১৮৬০) নবীন বিধবার খেদোক্তি—"এখন সেই সাগরের (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের) ঐরূপ তেজ ও কল্লোল কিছুই নাই—এখন কেউ তাঁর রবও শুন্তে পায়না, একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছেন, বিধবাদিগের বিরহ আগুনে বারিপ্রদান না করে ঘৃত ঢেলে দিয়াছেন, কি না যে কর্ম্মেতে হাত দিলেন তাহা শেষ কর্তে পাল্লেন না!"

সুতরাং, শতাব্দীর সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে বালবিধবা। সার সার বিষাদের প্রতিমা। তাদের মনে হয়তো কামনা বাসনার তাড়না। কেননা শরীরের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। রয়েছে বক্তব্য। কিন্তু যন্ত্রণাকাতর মুখে নির্লিপ্ত উদাসীনতার মুখোস আঁটা। চোখে স্বপ্নের লেশটুকুও নেই। বয়সের কথা বিবেচনা করলে এরাও কিন্তু 'পরী'। কিন্তু দেশ এবং কালগুণে সেদিন প্রত্যেকেই প্রায় অশরীরী।

কিশোরীদের দ্বিতীয় দলটিও তা-ই। এরা বিধবা নয়, বিধবার মতো। এরা কুলীনের মেয়ে। কুলীনের বৌ। তাদের নিয়ে নানা উপাখ্যান। এখানে সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। সমসাময়িক রচনা থেকে দু'একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম বইটিতে ব্যঙ্গচ্ছলে চরিত্রবর্ণনা করেছেন সেকালের ওই সব বিবাহ ব্যবসায়ীদের। তিনি লিখেছেন—'তাঁহাদের চরিত্র অতি বিচিত্র। চরিত্র বিষয়ে তাঁহাদের উপমা দিবার স্থল নাই। তাঁহারাই তাঁহাদের একমাত্র উপমাস্থল। কোনও অতি প্রধান ভঙ্গকুলীনকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাদা মহাশয়! আপনি অনেক বিবাহ করিয়াছেন, সকল স্থানে যাওয়া হয় কি। তিনি অম্লান মুখে উত্তর দিলেন, যেখানে ভিজিট পাই, সেইখানেই যাই।—গত দুর্ভিক্ষের সময় একজন ভঙ্গকুলীন অনেকগুলি বিবাহ করেন। তিনি লোকের নিকট আস্ফালন করিয়াছিলেন, এই দুর্ভিক্ষে কত লোক অন্নাভাবে মারা পড়িয়াছে, কিন্তু আমি কিছু টের পাই নাই, বিবাহ করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছি। গ্রামে বারোয়ারি পূজার উদ্যোগ হইতেছে। পূজার উদ্যোগীরা, ঐ বিষয়ে চাঁদা দিবার জন্য কোনও ভঙ্গকুলীনকে পীড়াপীড়ি করাতে, তিনি চাঁদার টাকা সংগ্রহের জন্য একটি বিবাহ করিলেন।'

এইভাবেই তখন যদৃচ্ছ বিয়ে করে বেড়াচ্ছেন বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণরা। এই বর্বর জীবনের পেছনে অবশ্য

২৭. বড় ঘরের মেয়ে। প্রগতিশীল বড় ঘরের বউ। সম্মতি-আইন নিয়ে এঁদের কোনও ভাবনা ছিল না।

কিছুটা অর্থনৈতিক চাপও ছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে গেছে। সমাজ ব্যবস্থাও পাল্টাচ্ছে। কুলীন ব্রাহ্মণ তখনও নতুন কালের উপযোগী হতে পারছেন না। কোনও কার্যকর বৃত্তিতে তাঁর দীক্ষালাভ ঘটেনি। তখনও কাজ না করা তাঁর ঐতিহ্য বলে গণ্য। সুতরাং বল্লাল সেন আর দেবীবরকে শিরোধার্য করে কুলীনের কুল উদ্ধার করে বেড়ানোই হয়ে দাঁড়াল তার পেশা। ব্যভিচারের সমর্থনে, বলা নিষ্প্রয়োজন, তথাকথিত শাস্ত্র বচন চয়নও দুঃসাধ্য ছিল না। 'বিদ্যাদর্শন' কাগজে (শ্রাবণ, ১৭৬৪) সরাসরি বলা হয়েছিল—বল্লাল সেনের দোহাই পেড়ে লাভ কী ? 'যদি বলেন বল্লাল সেন এই রীতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তবে বিবেচনা করুন, বল্লাল সেন সাধারণের ন্যায় একজন ভ্রমশীল মনুষ্য, বিশেষত তিনি কুকর্মান্বিত ছিলেন, অতএব তাঁহার মতের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি ও পরামর্শকে অবহেলা করা কি শ্রেয়ঃ বোধ হইতে পারে ?" বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন—'যদি ধর্ম থাকেন, রাজা বল্লাল সেন এবং দেবীবর ঘটকবিশারদ নিঃসন্দেহ নরকগামী হইয়াছেন।'

তাঁরা নিশ্চিত নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কিনা বলা শক্ত, কারণ, সাধারণত দেখা যায় সমাজপতিরা দিব্য ওই সব ব্যবস্থা পাশ কাটিয়ে চলে যান। সাধারণত তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে থাকে স্বর্গ। ইহজীবনে তো বটেই। তবে বল্লাল সেন আর দেবীবর ঘটক যেখানেই থাকেন তাঁদের সৌজন্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও যে হাজার হাজার বাঙালি মেয়ে নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অনেকেই জানেন, বাঙালি সমাজে এমন গর্বিত কুলীনও ছিলেন যাঁর একশো-র ওপর বিয়ে। সবাইকে এক ছাদের তলায় জড়ো করলে রীতিমত বর্ণাঢ্য এক হারেম। শোনা যাচ্ছিল গত শতকের ষাটের দশকে, অর্থাৎ বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পরে বিদ্যাসাগর যখন সমান তেজে এবং সমান বেগে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছেন, কুলীনের বহুবিবাহ নাকি তখন জনশ্রুতি মাত্র। বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছিলেন আসলে তা ঘোরতর বাস্তব। তিনি নাম ধাম দিয়েই বেশ কিছু কুলীনের সন্ধান দিয়েছিলেন অবিশ্বাসীদের। তাঁর দেওয়া তালিকার ওপর চোখ বুলালে দেখা যায় ১৮৭১ সনে হুগলির ৩৩ জন কুলীন ব্রাহ্মণ বিয়ে করে বসে আছেন ২১৫১ জন মেয়েকে। বলা বাহুল্য, তাদের অধিকাংশই শিশু অথবা কিশোরী।

অবশ্য তখন এমন বয়স্ক কুলীন বধূরও দেখা মিলত শিশুতুল্য বরের সঙ্গে যাঁদের বিয়ে হয়েছে। একটি বাংলা প্রহসনে (কামিনী, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ,১৮৬৯) বয়স্ক রমণীর সঙ্গে বালকবরের বিয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তাতে কেবলরাম নামে একটি চরিত্র বলছে— 'যেমন আমাদের শিবীবামনী। শিবীদের সমান ঘর মেল্যাক নাই বলে, লোকে মনে কল্লে, বুঝি ই যাত্রায় বিবাহ হলই না, মাতার চুল পেকে গ্যালো, অবশ্যাযকালে ভাগ্‌গি বলে শিবীর আইবুড়ো নাম ঘোচাতে পুব্বুদেশ হতে একটি বছর ইগারর ছেলে এলো, তাই তার বিয়ে হলো। আহা ! সে বুড়ো বয়সে ভাতার পেয়ে বত্তে গ্যালো, ছেলেটিকে মার মতো যত্ন করতো...।'

এই প্রহসনটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একালের গবেষক (সমাজচিত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন, জয়ন্ত গোস্বামী, ১৯৭৪) প্রসঙ্গত আরও একটি সংবাদ উল্লেখ করেছেন। এই রচনায় প্রহসন থেকে যেসব উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে, তা প্রধানত তাঁর বই থেকেই নেওয়া। বৃদ্ধার বালক-বর সম্পর্কিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বামাবোধিনী' কাগজে (বৈশাখ, ১২৯২)। তাতে বলা হয়েছে—'বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।'

বলাবাহুল্য, বৃদ্ধার তরুণ ভর্তা নয়, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা তখন দেশাচার। বিদ্যাসাগর হুগলীর কিছু কুলীন সম্পর্কে যে তথ্য পেশ করেছিলেন তাতে যেমন দেখা যায় পঞ্চান্ন বছর বয়সের মধ্যে একজন কুলীন বিয়ে

**২৮. দুই বোন। প্রগতিশীল পরিবারের কন্যা এরা। অতএব গৌরীদানের প্রশ্ন ওঠে না।**

করেছেন ৮০টি মেয়েকে, তেমনই দেখা যায় কুড়ি একুশ বছরের ছেলেরা এক একজন বিয়ে করে বসে আছেন চল্লিশ পঞ্চাশটি। তিরিশ চল্লিশটি বিয়ে করছেন এমন কুলীন সে তালিকায় আকছার। সুতরাং, এতে আর বিস্ময় কী যে, দাশু গাইবেন—'কুলীনের যুবতীগণ, তারা যমের জন্য যৌবন ধারণ করেন হৃদকমলে।' স্বভাবতই 'বিদ্যাদর্শন'-এর ভাষায় চৌকাঠের ওপারে,—'অপর দ্বারে কী আশ্চর্য পাপের নৃত্য!'

অনাচার ব্যভিচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেও ইতস্তত করেননি বিদ্যাসাগর। পরিস্থিতি ভয়াবহতার বিবরণ দিচ্ছেন তিনি—'কোনও কারণে কুলীন মহিলাদের গর্ভসঞ্চার হইলে তাহার পরিপাকার্থে কন্যাপক্ষীয়দিগকে ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়া জামাতার আনয়ন। তিনি আসিয়া, দুই একদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া প্রস্থান করেন।...দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে কৃতাকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচারসহচরী ভ্রূণহত্যাদেবীর আরাধনা।...তৃতীয় উপায় অতি সহজ, অতি নির্দোষ ও সাতিশয় কৌতুকজনক। তাহাতে অর্থব্যয়ও নাই, এবং ভ্রূণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জননী, অথবা বাটীর অপরগৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে যান এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন, অথবা দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ করেন, অনেকদিনের পর কাল রাত্রিতে জামাই আসিয়াছিলেন ; হঠাৎ আসিলেন, রাত্রিকাল, কোথায় কি পাব ; ভাল করিয়া খাওয়াতে পারি নাই,...বলিলেন আজ কোনও মতে থাকিতে পারব না ; সন্ধ্যার পরেই অমুক গ্রামের মজুমদারদের বাটীতে একটা বিবাহ করিতে হইবেক ; পরে, অমুক গ্রামের হালদারদের বাটীতও বিবাহের কথা আছে, সেখানেও যাইতে হইবেক। যদি সুবিধা হয়, আসিবার সময় এই দিক দিয়া যাইব। এই বলিয়া ভোর ভোর চলিয়া গেলেন।... এই মিথ্যা রটনার উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা নেই। বিদ্যাসাগর লিখছেন—'পরে স্বর্ণমঞ্জরীর গর্ভসঞ্চার হইলে ঐ গর্ভ জামাতাকৃত বলিয়া পরিপাক পায়।'

বাঙালি সমাজ সেদিন পাঁকে কতখানি তলিয়ে গিয়েছিল তার আভাস মিলে 'সমাচার সুধাবর্ষণ'-এর একটি রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবেদনে। (এপ্রিল, ১৮৫৫)। হঠাৎ একজন নবীন কুলীন বর শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর পুত্রের অন্নপ্রাশনের আমন্ত্রণ পত্র পেলেন। পত্র হাতে নিয়ে তিনি স্তম্ভিত। "উক্ত বাবুজী বাবাজী এই পত্রখানি পাঠ করত তৎক্ষণাৎ অমনি আড়ষ্ট হইলেন, পরে আস্তে আস্তে কর্ত্তা মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিলেন 'বাবা, বাবা ! হ্যাদে এক চমৎকার দেখো, দুই বৎসর আমি অমুক স্থানের শ্বশুরবাড়ী গমন করি নাই, সে স্ত্রীকেও এখানে আনি নাই, আমার শ্বশুর এই পত্র লিখিয়াছেন, অমুক দিবস তোমার ছেলের ভাত হইবে, তুমি পত্রপাঠ এখানে আসিবে।' এই বাক্য শ্রবণপূর্বক বৃদ্ধটি তখনি অমনি অম্লান বদনে কহিতেছেন—'হাঃ হাঃ বাবা, হাঃ তার ভাবনা কি, কুলীনের ছেলে, চিন্তা কি, অমন হোয়ে থাকে, হোয়ে থাকে, কি বাবা তার আটক কি, তুমি এখনি যাবে,...তুমি ভাতের সময় সংবাদ পাইলে, এই যে বাবু, তুমি হইলে পর একেবারে তোমার পৈতার সময় আমি পত্র পাইয়াছিলাম'।

তবু কুলীনদের কিশোরীভজনা থেকে নিরস্ত করা গেল না। বিধবা আন্দোলনের পরেই বিদ্যাসাগরের নেতৃত্ব শুরু হয়েছিল কৌলীন্য প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলন। সমগ্র রাজ্য আলোড়িত। পুস্তিকার পর পুস্তিকা। সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ। শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার। মানবিকতার আবেদন। পঁচিশ হাজার মানুষ সই করে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন রাজদরবারে। দরখাস্তের পর দরখাস্ত। তিন-চারজন কুলীনের বৌও যোগ দিয়েছিলেন আন্দোলনে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সরকার হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতিতে আর হাত দিতে রাজী নন। ফলে রীতি হিসাবে বহুবিবাহ টিকে রইল ইংরেজ চলে যাওয়ার পরও। কার্যত তার উচ্ছেদ জওহরলাল নেহরুর আমলে, হিন্দু কোড় বিল-এ। অবশ্য তার আগেই প্রথাটি জীর্ণ হতে হতে প্রায়

**২৯. নবদম্পতি। বরের বয়স যদি একুশ, তবে কনের হয়তো বারো।**

লুপ্ত হয়ে এসেছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ প্রহরে কামনার প্রদীপটির যেন অতিমাত্রায় উজ্জ্বল। নিভে যাবার আগে যা হয়।

উনিশ শতকের বাঙালির কিশোরী-ভজনায় অতএব বাল্যবিবাহের মতোই জরুরি বহুবিবাহের উপাখ্যানটিও। একদিকে অসংখ্য বালবিধবা, অন্যদিকে স্বামী থাকতেও দাম্পত্যজীবনহীন অগণিত কুলীন কন্যা, সুতরাং গ্রামাঞ্চলে যদি আড়ালে আবডালে রকমারি অসামাজিকতা, শহরে তবে লাল আলোর তলায় জমজমাট অন্ধকার। কেউ কেউ অবশ্য জীবনযন্ত্রণা জুড়াতেন বিষ খেয়ে বা গলায় দড়ি দিয়ে। ১৮৭২ সনের একটি হিসাবে দেখা যায় বাংলায় প্রতি দশ লক্ষ মহিলার মধ্যে গড়ে ২৯·৩ জন আত্মঘাতী হয়েছেন।

১৮৭৩-এ অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪·৩ জনে, ১৮৭৪-এ ৪৩·৬ জনে, ১৮৭৫-এ ৪১·৫ জনে, এবং ১৮৭৬-এ ৪৪·৬ জনে। কলকাতায় আত্মঘাতিনীর সংখ্যা স্বভাবতই বেশি। সেখানে একই সময়ে ওই অনুপাত ছিল যথাক্রমে—১০১·৫ জন, ৫৪·২ জন, ৮৮·০ জন, ১৪৯ জন, এবং ১২৯·২ জন! শতক যত এগিয়ে চলেছে ততই যেন বেড়ে চলেছে আত্মঘাতিনীর সংখ্যা।

কিশোরীরা কেউ কেউ বাঁচার চেষ্টা করত অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার জনসংখ্যা ধরা হয়েছিল চার লক্ষ। ১৮৫৩ সনে কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এক প্রতিবেদনে কলকাতায় বারবণিতার সংখ্যা ১২৪১৯ জন। তার মধ্যে ১০ হাজারই হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণকন্যাও রয়েছে। ১৮৬৭ সনে আর একটি সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়—কলকাতায় প্রমোদ কন্যাদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার! ১৮৬৯ সনে অমৃতবাজার পত্রিকা জানায় কলকাতার প্রমোদরমণীদের শতকরা ৯০ ভাগই হিন্দু বিধবা!

অনুমান করতে অসুবিধা নেই অনেকেই ছিল কুমারী। কেননা, সেটা বালবিধবা আর বালিকাবধূদের কাল। আর, আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন বিধবা অথবা সধবা কুমারী তখন অসংখ্য। তাছাড়া যৌনতার ইতিহাস বলে বিশ্বময় রূপের হাটে কুমারীর বড়ই কদর। এ-ব্যাপারে লন্ডন আর কলকাতা, বার্লিন আর বারাণসীর খুব তারতম্য হওয়ার কথা নয়। ব্রিটেনের সামাজিক ইতিহাস বলে সেখানে বয়স্ক খদ্দেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য অনেক সময় নকল কুমারী উপস্থিত করা হত। নির্বোধ পুরুষ উচ্চমূল্যে কৌমারহর হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে চাইতেন। বাংলায় অবশ্য স্বাভাবিক পরিবেশে অতি সহজেই সে-গৌরব লাভ সম্ভব ছিল। কুশলী যাত্রাভিনেতা বা সার্কাসের নিপুণ খেলোয়াড়ের মতো কেউ কেউ ইচ্ছে করলে হয়তো বুকে একসঙ্গে রাশি রাশি মেডেল ঝুলিয়ে বেড়াতে পারতেন। বিশেষ করে কুলীন ব্রাহ্মণরা তো বটেই! অন্যদের পক্ষেও কিন্তু সম্ভাবনা ছিল অন্তহীন। কেননা, স্বকীয়া বাদ দিলেও বালবৈধব্য এবং কুলীনের উদাসীনতাবশত পরকীয়ার সুযোগও অফুরন্ত। তাছাড়া শহরের রূপের হাটগুলোও তো নাগালের বাইরে নয়! রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে সম্প্রতি নাইরোবিতে যে আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হয়ে গেল তাতে ভারতের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন শুধু বোম্বাই শহরেই কমপক্ষে কুড়ি হাজার শিশু অথবা কিশোরী পতিতাবৃত্তি ধারণ করে বেঁচে আছে। উনিশ শতকের কলকাতায়, আগেই বলা হয়েছে, যৌবনের বাজারে তাদের অনুপাত খুব কম ছিল না।

এভাবে বিলি বন্দোবস্তের ফলেই উনিশ শতকের শেষ পাদে বাংলার গ্রাম-গঞ্জ-শহর কিশোরীশূন্য। স্বাভাবিক শৈশবকে হারিয়ে তারা তখন অস্বাভাবিক অস্তিত্বে পরিণত। বাইরে তাদের দেখা পাওয়া ভার। কেননা, অধিকাংশ বাঙালি পুরুষই যেন এক একজন হাম্বার্ট হাম্বার্ট। তাঁদের বিশেষ ঝোঁক কিশোরীর দিকে যারা মুকুলিকা বালিকাবয়সী। অস্ফুট-অর্ধস্ফুট ফুলবনেই যেন তাদের যৌবনের, তাদের যৌনতার সার্থকতা!

'উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার॥
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আনে।
করে করে বাঁশী ফিরি দিবানিশি
কিশোরীর অনুরাগে।'...

এই কিশোরী অবশ্য রাই কিশোরী। নওল কিশোরী রাধা। তিনি ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে এবং সাধনতত্ত্বে রাধার ভূমিকা বিশিষ্ট। হিন্দিভাষীদের মধ্যে রাধাবল্লভী নামে একটি বৈষ্ণব গোষ্ঠীর কাছে রাধাতত্ত্বেরই সবিশেষ গরিমা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যেও প্রেমদায়িনী রাধা অনেক ক্ষেত্রে ভক্তের প্রধান অবলম্বন। সহজিয়ারা যে নায়িকাভজনের কথা বলেন তাও মূলত রাধাভজন। যাঁরা প্রকৃত নায়ক-নায়িকার রূপের ভিতর রাধাকৃষ্ণের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চান। কাব্যে এবং ধর্মীয় ধারণায় এই রাধিকা আবার প্রায়শ কিশোরী। 'রজকিনী রূপ কিশোরীস্বরূপ' ধর্মীয় প্রেমতত্ত্বে রাধা কিশোরী হলেও বলা নিষ্প্রয়োজন, সে কিশোরী লৌকিক নয়, অলৌকিক। তবু উনিশ শতকের বাঙালির কিছু সামাজিক ভ্রষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে সাধকদের কিশোরীতত্ত্বের কথা মনে পড়ছে, কারণ বাঙালির মানসলোকে কোন্ ধ্যান কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বলা শক্ত। অগণিত বাঙালির নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন রাধা; রাধানাথ, রাধাকান্ত, রাধামোহন, রাধাপ্রসাদ, রাধারমণ—আরও কত কী। এসবও কিন্তু রাধাতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন প্রভাবেরই ফল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য রাধা এবং কিশোরী রাধা সূত্রে একাধিক কিশোরীভজা গোষ্ঠীও গড়ে উঠেছিল বৈষ্ণব ধর্মানুসারীদের মধ্যে। বিমানবিহারী মজুমদার তাদের সাধন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন—'কিশোরীভজারা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে নিজ নিজ স্ত্রী বা নায়িকা সহ এক এক স্থানে মিলিত হয়। জাতিভেদ না মানিয়া এক সঙ্গে ভোজন করে।' তারপর গান—'প্রেমভরে কর গাঢ় আলিঙ্গন।—'ইত্যাদি। ('শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, বিমানবিহারী মজুমদার, ১৯৫৯) বিক্রমপুরের কালাচাঁদ বিদ্যালঙ্কার প্রবর্তিত কিশোরী ভজনী দলের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ;

"ব্রহ্মাণ্ড দুই প্রকার; বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। আর পঞ্চভূত নির্মিত মানবশরীর ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই শরীরেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণ বর্তমান রহিয়াছে। অতএব পরমার্থ সাধন ও তীর্থভ্রমণ উদ্দেশ্যে অন্যত্র গমনের প্রয়োজন নাই। শরীরের মধ্যেই গোলক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে। তদনুসারে পুরুষেরা আপনাকে গোলক ও বৈকুণ্ঠনিবাসী শ্রীকৃষ্ণ ও স্ত্রীলোকেরা আপনাকে রাধিকা বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু 'আদ্যাশক্তিময়ী রাধা', এই প্রমাণুসারে ভজনা করে। কৃষ্ণ প্রকৃতির নাম কিশোরী, এই নিমিত্ত উপাসনাকে কিশোরী-ভজনা বলে।"

এই ভজনে দীক্ষা নিতে হয় জোড়ায় জোড়ায়। অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ শিষ্যের সঙ্গে একজন প্রকৃতি এবং স্ত্রী শিষ্যার সঙ্গে পুরুষ থাকা চাই। সাধন-ভজন চলে নিশাযোগে অতি সঙ্গোপনে। একটি মেয়ে কিশোরী সাজে। অক্ষয়কুমার লিখেছেন—'সেটি প্রায়ই গুরু প্রণয়িনী শুনিতে পাই।' এ-ধরনের কিশোরী-ভজা দল নিয়ে উনিশ শতকে শশিভূষণ কর নামে একজন প্রহসন লিখেছেন—'মজার কিশোরী ভজন।'

সাধারণের যে কিশোরী ভজনা, তা মজার নয়, যন্ত্রণার। অন্তত কিশোরীর পক্ষে তো বটেই। উনিশ শতকে বাঙালি সমাজে বাল্যবিবাহের নামে যা চলছিল তার সঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণব বা কিশোরী-ভজা দলের গূঢ় সাধনার কোনও মিল নেই। একটি আনন্দময় অনুষ্ঠান। তাতে পুরুষ ও প্রকৃতির সমানাধিকার। বরং বিবরণ শুনে মনে হয় অনুষ্ঠানে মেয়েদের মর্যাদা বেশি। অন্যদিকে ঘরে ঘরে কিশোরী ভজনা সেখানে কিশোরী কন্যাটি যেন বলিদানের জন্য উৎসর্গীকৃত কোনও প্রাণী। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা স্বাধীনতার কোনও মূল্য নেই সেই আচারে। তার সঙ্গে বৈষ্ণবের সাধন-ভজন নয়, বরং মিল বেশি আদিম কুমারী বলির।

পৃথিবীর অনেক আদিম সমাজেই কুমারী বলির প্রথা ছিল। প্রাচীন গ্রীসে, মিশরে, চীনে, ভারতে। গ্রীকপুরাণে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি প্রতিরোধের জন্য কুমারী বলির উপাখ্যান রয়েছে। যুদ্ধ জয়ের জন্যও প্রাচীন গ্রীসে বলি দেওয়া হত কুমারী কন্যাকে। মিশরে নীল নদীর জল বৃদ্ধির জন্য। কুমারী সৃষ্টির রহস্য।

কুমারী উর্বরতার প্রতীক। তাকে বলি দিলে বসুন্ধরা উর্বর হবে, জলদেবতা তুষ্ট হবে, শত্রু পর্যুদস্ত হবে—আদিম মানুষের মনে কুমারীকে ঘিরে নানা বিশ্বাস। ঘন্টাধ্বনিকে আরও তীব্র বা তলোয়ারকে আরও তীক্ষ্ণ করার জন্য গলিত ধাতুর সঙ্গে কুমারীর শোণিত মিশবার কাহিনীও রয়েছে নানা প্রাচীন উপাখ্যানে।

ভারতীয় তন্ত্রসাধনায়ও কুমারীর বিশেষ ভূমিকা। কাপালিক কুমারীর রক্তে সাধনা করে। কুমারী অর্ঘ্য। কুমারী আবার দেবীও বটে। সৃষ্টি এক প্রহেলিকা। সেই রহস্য ভেদ করতে পারে একমাত্র সাধনা। সে-সাধনা কুমারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। কারণ, তা দেহ রসের সাধনা। কৌমার্য এই আদিরসের ধারক। সে কারণেই তার বিশেষ গুরুত্ব। কুমারী নিজের কৌমার্যকে বিসর্জন দিয়েই সৃষ্টিকে সম্ভব করে। একারণে তন্ত্রসাধকের কাছে কৌমার্য-হরণও এক বিশেষ অনুষ্ঠান। 'যমালতন্ত্র'-এ এক থেকে ষোল বছরের কুমারীকে নানা নাম দেওয়া হয়েছে। এক এক বয়সে এক এক নাম : সন্ধ্যা, সরস্বতী, ত্রিধামূর্তি, সুভগা, উমা, মালিনী কুচনিকা, কালসন্দর্ভা, অপরাজিতা, রুদ্রাণী, ভৈরবী, মহালক্ষ্মী, পীঠনায়িকা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অম্বিকা। এমনভাবে বোধহয় কুমারী কন্যাকে পর্যবেক্ষণ করেননি আর কেউ। যেন বার্ষিক পরিবর্তনগুলোও বিশ্লেষণ করা অতিশয় জরুরি।

কুমারীপূজা, কৌমার্য-হরণের বিবিধ অনুষ্ঠান, এবং তন্ত্রাচারের সঙ্গে যুক্ত কুমারীবলির পটভূমিতে কেমন যেন দিব্যি মানিয়ে যায় উনিশ শতকের বাঙালির প্রায় সর্বজনীন কুমারী সাধনা। অবশ্য দৃশ্যত একধরনের কুমারী পূজার অনুষ্ঠান হলেও পরিণতি কিন্তু বলে বাল্যবিবাহের নামে যা চলছিল আসলে তা নিছক—ব্যভিচার। অথবা পুরুষের কামনার যূপকাষ্ঠে বলিদান। সমাজ পুরুষপ্রধান। সুতরাং, বয়স্ক পুরুষের কমবয়সী মেয়ের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহকে আনুষ্ঠানিক গৌরব আরোপ করতে অসুবিধা ছিল না। কোলের মেয়েরা অতএব নির্বিবাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে সুখশয্যা নামক অগ্নিকুণ্ডে!

কন্যা সন্তান সম্পর্কে সমাজ সেদিন কতখানি উদাসীন, শিশু এবং কিশোরীদের সুখ-দুঃখ ভয়-ভাবনা সম্পর্কে কতখানি নির্লিপ্ত, বাল্যবিবাহের ব্যাপকতা থেকেই তা স্পষ্ট। ইউরোপ আমেরিকার আধুনিককালে মেয়েদের সমস্যাদি সম্পর্কে যেসব গবেষণামূলক বই বের হচ্ছে তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশই মেয়েদের নিজেদের লেখা। ফলে নিজেদের অভিজ্ঞতাও ঠাঁই পাচ্ছে সেসব রচনায়। তাতে দেখা যায়, শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে নব যৌবন,—মেয়েদের জীবনে বড়ই জটিল সময়। এসময়ে অনিশ্চিত উৎকণ্ঠা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। শরীর এবং মনে এমন কিছু কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় যার জন্য অধিকাংশ সময় তারা মোটেই মানসিকভাবে তৈরি থাকে না। একজন লেখিকা বয়ঃসন্ধির মেয়েদের জীবনকে তুলনা করেছেন শুঁয়োপোকার প্রজাপতিতে রূপান্তরের সঙ্গে। যেন সম্পূর্ণ নব জন্ম। এসময়ে কিশোরী বড়ই অভিমানী, বড়ই স্পর্শকাতর। এসময়ে পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় তবে জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গিই অস্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। আর একজন মহিলা লিখছেন—নিজেদের ওপর ঘেন্না ধরে যায় সেসময়। শৈশব পালিয়ে যাচ্ছে। শরীরে কেন যে কী হচ্ছে, কে জানে! অনেকেরই ধারণা আবছা আবছা। মা সব কথা বলেননি। স্কুলের বন্ধুরা সব জানে না। বইয়ে যা লেখা হয় তার সব বোঝা যায় না। কিশোরী তখন মনে মনে এক কল্পলোকের বাসিন্দা। কখনও তার মনে রোমাঞ্চ, কখনও অজানা ভয়। মেয়েরা তখন দিনরাত্তির সুযোগ পেলেই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, এ ধারণা ভুল। একজন গবেষক লিখেছেন অনেক মেয়ে তখন শরীরটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য কুঁজো হয়ে হাঁটে, বাড়ন্ত শরীরকে ঠেকিয়ে রাখতে চায় খাওয়া কমিয়ে দিয়ে।

অথচ তার আগেই সেদিন শুরু হয়ে যাচ্ছিল বাঙালির কুঁড়ি ছেঁড়ার পালা! এ-নিষ্ঠুরতার বোধহয় সত্যিই কোনও তুলনা হয় না। বিশেষত, রোশন চৌকি বসিয়ে, সানাই শাঁখ বাজিয়ে এই বর্বর অনুষ্ঠান চলছিল এই

সেদিনও, উনিশ শতকের একেবারে অন্তিমলগ্নে !

হয়তো অনেক কিছুরই পরোক্ষ প্রভাব রয়ে গিয়েছে গৌরীদানের হিড়িকের পেছনে। তবে বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনতত্ত্ব নয়, তন্ত্রও নয়, উনিশ শতকের এই ব্যাপক কুমারী বলিদানের পিছনে প্রধান প্রেরণা মনু। যত অপকর্ম সবই তাঁর দোহাই দিয়ে। বলা হয় মনুসংহিতা বর্তমান চেহারা লাভ করে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। সেদিক থেকে বিচার করলে ওই পুথিখানি নিঃসন্দেহে সভ্যতার এক বিশিষ্ট কীর্তি। প্রায় দুই হাজার বছর আগে যিনি সমগ্র সমাজকে এভাবে আইনের শাসনে আনতে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি নিঃসন্দেহে প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনপ্রণেতা। এখনও অবাক লাগে সে পুথির পাতা ওল্টালে। সমাজ, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণীভেদ, কর্ম, অকর্ম কৃত্য অকৃত্য—সমগ্র মনুষ্যজীবন তাঁর অনুশাসনের আওতায়। প্রায় দু' হাজার বছর আগে যে জনগোষ্ঠী এধরনের প্রতিভার জন্ম দিতে পারে তার প্রাণশক্তি, সংহতি এবং শৃঙ্খলাবোধ প্রশ্নাতীত।

কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, উনিশ শতকের বাংলায় মনু বড়ই বেমানান। কেন, তা বুঝতে হলে বিয়ে সম্পর্কে মনুর বক্তব্য কী সংক্ষেপে তা শোনা দরকার। মনু বলছেন—বিয়ে করবে স্ববর্ণা ও সুলক্ষণা কন্যাকে। নিকট আত্মীয়কে বিয়ে করবে না। সে মেয়ে যেন সাতপুরুষ পর্যন্ত মাতামহ বংশজাত না হয় বা মাতামহের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত সগোত্র না হয়। সেই সঙ্গে পিতার সগোত্র বা সপিণ্ডা হলেও চলবে না। ধনীর ঘর হলেও কয়টি কুল বর্জন করবে। যথা : যে বংশে পুরুষ জন্মায় না, যাদের দেহে লোমের আধিক্য ইত্যাদি। তা ছাড়া যে কন্যার কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যার দেহে খুঁত আছে, যে চিররুগ্না, যার গায়ে আদৌ লোম নেই বা অত্যধিক, যে বেশি কথা বলে, অথবা চক্ষু যার কটা তাকেও বর্জন করবে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সর্প, দাস-নাম যাদের কিংবা ভীতিপ্রদ নাম, তাদেরও বিয়ে করবে না। তবে কাকে বিয়ে করতে হবে ? মনু বলছেন—যার কোনও অঙ্গ বিকল নয়, যার নাম সহজে মুখে উচ্চারণ করা যায়, হংসগজের ন্যায় যার গতি, যার লোম ও মাথার চুল এবং দাঁত স্থূল নয় এমন কোমলাঙ্গী কন্যাকেই বিয়ে করবে।

বিয়ে, মনুর মতে আট প্রকার ; ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। প্রথম ছয় বিয়ে ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্মজনক। শেষদিক থেকে চার বিয়ে ক্ষত্রিয়ের জন্য বিহিত। বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য রাক্ষস বাদ ; আসুর গান্ধর্ব ও পৈশাচ শ্রেয়। কোন বিয়ে কাকে বলে তাও শুনে রাখা ভাল। যে বিয়েতে বাবা দেখেশুনে সৎপাত্রের হাতে কন্যাদান করেন তা ব্রাহ্ম বিয়ে। দৈব বিয়ে মানে যে বিয়েতে যজ্ঞের অধিকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যাদান করা হয়। বরের কাছ থেকে গোধন ইত্যাদি নিয়ে বিধিপূর্বক কন্যাদান করলে আর্য বিয়ে। তোমরা দু'জনে গার্হস্থ্যধর্ম আচরণ কর, এই অনুরোধ সহ যথারীতি অলঙ্কারাদি সহ অর্চনা করে কন্যাদানকে বলে প্রাজাপত্য বিয়ে। কন্যার পিতা বা কন্যাকে যথাশক্তি ধন দান করে যে কন্যা গ্রহণ করা হয় তার নাম—আসুর। কন্যা ও বরের অনুরাগবশত যে মিলন হয় তার নাম—গান্ধর্ব। মনু বলছেন—এই বিয়ে কামমূলক। এর মূলে রয়েছে মৈথুনের ইচ্ছা। কন্যাপক্ষ প্রতিকূল হলে গৃহভেদ করে তাদের হত্যা করে ক্রন্দনশীল কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করে এনে বিয়ে করলে সেটা রাক্ষস বিয়ে। আর, নিদ্রিতা, সুরাপানে বিহ্বলা বা উন্মত্তা নারীর সঙ্গে নির্জনে সঙ্গত হওয়ার নাম পৈশাচ !

উনিশ শতকের বাংলার বাল-বিবাহকে কোন্ পর্যায়ে ফেলা যায় প্রশ্ন সেটাই। কন্যাপক্ষ প্রতিকূল ছিলেন না নিশ্চয়ই, বরং তাঁরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন, তবু রোরুদ্যমান কন্যাকে বলপূর্বক হরণের উল্লেখ দেখে মনে হয় হয়তো বা সেসব ছিল রাক্ষস বিয়ে। রাক্ষসের বিয়ে তো বটেই ! আবার নিদ্রিত বা বিহ্বলা ইত্যাদি প্রসঙ্গে মনে হয় হয়তো এই সব বিয়েকে পৈশাচ বিয়ে হিসাবে ভূষিত করাই শ্রেয় !

তারপর বিয়ের বয়স। 'অষ্টবর্ষাভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী' ইত্যাদি শ্লোকটির কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আটে গৌরী, নয়ে রোহিণী, দশে কন্যকা, তারপরেই রজস্বলা। সুতরাং, সে-বিভ্রাটের আগেই

কন্যাদান করতেই হবে। কেননা, কন্যার বাবা মা ভাই ঘোর পাতক। কারণ, মেয়েদের যৌবন লক্ষণ কিছুতেই বিফলে যেতে দেওয়া চলবে না। না, একবারের জন্যও না। মনু বলছেন—ঋতুকালে অবশ্যই স্ত্রীগমন করবে। কোনও ক্ষেত্রেই ঋতুকাল লংঘন করবে না। এই অধ্যায়ে পৌঁছে মনু যেন কোনও কামশাস্ত্রকার। নরনারীর দৈহিক সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ জারি করেছেন তিনি। কবে শ্রেয়, কবে নিষিদ্ধ ইত্যাদি। তবে ঈষৎ ঔদার্য দেখিয়েছেন। বলেছেন—ভার্যার তৃপ্তির জন্য ( ! ) অন্য সময়ও চলতে পারে। কবে মিলন হলে ছেলে হবে, কবে মেয়ে—সেসবও বলে গেছেন তিনি !

পাতায় পাতায় রজঃ, ঋতু, গর্ভধান, গর্ভসংস্কার—ইত্যাদি শব্দের ছড়াছড়ি। আনুষঙ্গিক অন্যান্য শব্দগুলোও সহজেই আসে যায়। বোঝা যায়, সমাজ সেদিন সন্তানের জন্য ব্যাকুল। বিশেষত, পুত্রসন্তানের জন্য। কন্যার ভূমিকা সেখানেই,—পুত্রার্থে ! আর, যদিও তখন ঘরে ঘরে নিষ্কর্মা পুত্রের ভিড়, তবু উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি সমাজ এই সব শব্দ আর বাক্যকে ঘিরেই আলোড়িত। বাঙালির সমাজ-সংস্কারের চাবিকাঠি প্রায় দু' হাজার বছর আগেকার এক সমাজপতির হাতে ! শুধু মনু নয়, বাল্যবিবাহের পক্ষে সেদিন আরও অনেকের বচনই আওড়ানো হয়েছে, চারদিকে ছড়ানো হয়েছে রাশি রাশি সংস্কৃত শ্লোক ! যেন সংস্কৃতভাষায় কোনও অযৌক্তিক বা অর্থহীন কিছু রচনা করা সম্ভব নয়, যেন শ্লোকবদ্ধ সংস্কৃত বাক্য মানেই আপ্তবাক্য। মনুর বয়স হয়েছে, বাক্যেরও বয়স হয়, শব্দে জং ধরে, শব্দ মূঢ়ের মতো আপন অর্থ ভুলে যায়—এইসব সহজ সরল সত্যও সেদিন বিস্মৃত। কন্যার সামর্থ্য অসামর্থ্য, সুখ দুঃখ সব চিন্তা মনুর বিবর্ণ পাতায় অঞ্জলি দিয়ে সবাই গৌরীদানের জন্য ব্যস্ত !

সংস্কৃত কাব্যে কিশোরীর কিছু কিছু লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ একটি শ্লোকে যা বলা হয়েছে কিশোরীর বিশেষ লক্ষণ : 'পদযুগল চাঞ্চল্য ত্যাগ করেছে, তাদের আশ্রয় হয়েছে দুই চোখ ; শ্রোণীবিম্ব তনুতা ত্যাগ করেছে, মধ্যভাগ এখন তার সেবা করছে ; বুক এখন (মুখকে ত্যাগ করে) কুচযুগের সচিবতা গ্রহণ করেছে, ফলে মুখমণ্ডল এখন অদ্বিতীয় ইত্যাদি। শতানন্দের একটি শ্লোকে কৈশোরী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'বাল্য গত হলে চিত্ত কুসুমধনু (মদনের) দ্বারা সায়কহত হইয়াছে ; ইহা দেখিয়া ইহার স্তনযুগ ভয়েই যেন নির্গত বা নিষ্ক্রান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে, ভয়ে ভ্রূবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহরের দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ কৃশ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতালাভ করিয়াছে, নিতম্বযুগল অবসন্ন হইয়াছে।" (শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৩৫৯)

ডঃ দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত বিদ্যাপতিকেও উদ্ধৃত করেছেন। বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করছেন বিদ্যাপতি :

'দিনে দিনে উন্নত পয়োধর পীন।
বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন ॥
আবে মদন বারাওল দীঠ।
সৈসব সকলি চমকি দেল পীঠ ॥
সৈসব ছোড়ল সসিমুখি দেহ।
খত দেই ভেজল ত্রিবলি তিন রেহ ॥' ইত্যাদি

এইসব রূপ-বর্ণন বয়ঃসন্ধির কিশোরীর। তাকে চেনা যায়। সে নব যৌবনের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছে। তার সামনে নবজীবনের হাতছানি। কিন্তু কাব্যের কিশোরী আর শাস্ত্রের কিশোরী এক নয়। শাস্ত্রকার বড়ই অধৈর্য। বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ প্রসঙ্গে জীমূতবাহনের দায়ভাগ থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার

৩০. আদুরি। কন্যাসন্তান নিয়ে সব পরিবারই কিন্তু সেদিন উদ্বিগ্ন নয়।

করেছেন। তাতে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু কাব্যের লেশমাত্র নেই। নির্মম গদ্যে সরাসরি বলা হয়েছে—'স্তনপ্রকাশের পূর্বেই কন্যাদান করিবে। কন্যা বিবাহের পূর্বেই ঋতুমতী হয়, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে নরকগামী হয়; এবং পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ বিষ্ঠায় জন্মগ্রহণ করেন। অতএব ঋতুদর্শনের আগেই কন্যাদান করিবেক।' কোথায় রূপসাধকের ললিত কাব্য, আর কোথায় সমাজশাসকের রূঢ় কর্কশ বাক্য!

মনু বলেছেন দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য—'পুত্রোৎপাদন, ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃলোক এবং আপনার স্বর্গলাভ' সুতরাং কচিকাঁচা কন্যাদের নিয়েই শুরু হয় স্বর্গসাধনা!

রাসসুন্দরী দেবীর জবানবন্দী:

'আমার বয়ঃক্রম যখন ১৮ বৎসর তখন আমার একটি পুত্রসন্তান হয়। ...যখন আমার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...আমার ২৩ বৎসরের সময়ে আর একটি কন্যাসন্তান হয়। ...২৫ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...২৮ বৎসরের সময় আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...যখন আমি ৩০ বৎসরের তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...যখন আমি ৩২ বৎসরের তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...আমি যখন ৩৪ বৎসরের তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...তাহার পরে আর একটি পুত্রসন্তান ছয়মাস গর্ভবাস করিয়াই গত হয়। পরে যখন আমি ৩৭ বৎসরের, তখন আর একটি পুত্রসন্তান হয়। ...তাহার পর আমি যখন ৩৯ বৎসরের, তখন আর একটি কন্যাসন্তান হয়। ...পরে আমি যখন ৪১ বৎসরের তখন আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটি জন্মে। ১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে সর্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থায় গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন, অন্য কেহ জানিত না।'

অবাক হওয়ার কিছু নেই। মনুপরাশরের কল্যাণে এই জীবনই সেদিন অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের নিয়তি। রাসসুন্দরী ভাগ্যবতী, তাঁর সংসারধর্ম তবু শুরু হয়েছিল বেশ পরে,—প্রথম যৌবনে। সেদিন কিন্তু তাঁর বোনদের অনেকেই অনেক কম বয়সে জননী! অধিকাংশ 'গৌরী' অনেক আগেই কুমারসম্ভবা!

এভাবেই দিব্যি চলে যাচ্ছিল। অলক্ষ্যে কখন ঈশান কোণে ধীরে ধীরে মেঘ জমে উঠেছে খেয়াল ছিল না। উনিশ শতকের আশির দশক। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া। বিদ্যুৎঝলক। বাঙালি ঘরপোড়া গরু। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের স্মৃতি তখনও তাজা। ক'বছর আর হয়েছে, চোখের সামনে ওঁরা আইন পাস করিয়ে নিলেন! তারপর বহুবিবাহ উচ্ছেদের জন্য সে কী হৈ হৈ কাণ্ড। বিদ্যাসাগর আবার ক্ষেপে উঠেছিলেন। যা হোক, কোনও মতে সামাল দেওয়া হয়েছে। সিপাইরা আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে গেছে। রাজসরকার সেবার আর কোনও আইন চালু করতে সাহস পাননি। এবার ওঁরা পড়েছেন বাল্যবিবাহ নিয়ে। কী হবে কে জানে। বলা হচ্ছে গৌরীদান মানা। কিশোরীভজনা নাকি আর চলবে না। তবে কি ধর্ম বলে কিছু থাকবে না? মনু পরাশর মিথ্যা হয়ে যাবে? সনাতন সমাজ ক্ষোভে কাঁপছে। সমাজপতিরা হতাশায় ম্রিয়মাণ। বাবুরা বিষণ্ণ। কিশোরীই যদি কেড়ে নেওয়া হয়, তবে বৃথাই এই জীবনযৌবন!

বাল্যবিবাহ বিরোধী এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলায় নয়, মহারাষ্ট্রে। সে-আন্দোলনের নায়ক বিদ্যাসাগর নন, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক বেহরামজী মালাবারী (১৮৫৩-১৯১২)। বা বৈরামজী মালাবারী। অবশ্য বাংলায় তার আগেও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। 'সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায়ই (ভাদ্র ১৭৭২ শক) 'বাল্যবিবাহের দোষ' শিরোনামায় একটি দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। (সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ, ১৯৮০)। অনেকের ধারণা প্রবন্ধটির লেখক স্বয়ং বিদ্যাসাগর। হতে পারে। আক্রমণের ভঙ্গিটি অবশ্যই বিদ্যাসাগরীয়। লেখক বলছেন—

'লোকাচার ও শাস্ত্র ব্যবহারপাশে বদ্ধ হইয়া দুর্ভাগ্যবশত আমরা চিরকাল বাল্যবিবাহনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ও দুরপনেয় দুর্দশা ভোগ করিতেছি। বাল্যকালে বিবাহ হওয়াতে বিবাহের সুমধুর ফল যে পরস্পরপ্রণয় তাহা দম্পতিরা কখন আস্বাদ করিতে পায় না...আর পরস্পরের অত্যন্ত অপ্রীতিকর সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয় তাহাও অনুরূপ অপ্রশস্ত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আর নববিবাহিত বালক বালিকারা পরস্পরের চিত্তরঞ্জনার্থে রসালাপ বিদগ্ধতা বাক্‌চাতুরী কামকলাকৌশল প্রভৃতির অভ্যাসকরণে ও প্রকাশকরণে সর্বদা সযত্ন থাকে, সুতরাং তাহারদিগের বিদ্যালোচনার বিষম ব্যাঘাত জন্মিবাতে সংসারের সারভূত বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া কেবল মনুষ্যের আকারমাত্রধারী, বস্তুতঃ প্রকৃতরূপে মনুষ্যগণনায় পরিগণিত হয় না।'

প্রবন্ধকার বাল্যবিবাহের যেসব কুফলের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি : এক) বাল্যবিবাহ শারীরিক দুর্বলতার হেতু। 'অনতীত-শৈশব জায়াপতি-সম্পর্কে যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহার গর্ভবাসেই প্রায় বিপত্তি ঘটে।' সন্তান রুগ্ন হয়ে জন্মায়। কারণ, 'দুর্বল কারণ হইতে সবল কার্যের উৎপত্তি কদাপি সম্ভাবেনা, যেমন অনুর্বরা ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ বপন এবং উর্বরা ক্ষেত্রে হীনবীর্য বীজ রোপণ করিলে উৎকৃষ্ট ফলোদয় হয় না।' দুই) বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ না করতে পারলে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সম্ভব হবে না। আর, 'এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত তবে অস্মদ্দেশীয় বালক বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত।' তিন) 'বাল্যকালে বিবাহ করিয়া আমরা সর্বতোভাবে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হই। ...উপার্জনক্ষমতার জন্ম না হইতেই সন্তানের জন্মদাতা হই। সুতরাং, তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অর্থের নিমিত্তে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতে হয়।' চার) বাল্যবিবাহ মানে বিধবার সংখ্যাবৃদ্ধি। কারণ 'মনুষ্যের জন্মকাল হইতে বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক সম্ভাবনা! অতএব বিংশতিবর্ষ অতীত হইলে যদ্যপি উদ্বাহ কর্ম নির্বাহ হয় তবে বিধবার সংখ্যাও অধিক হইতে পারে না।'...'আর ভদ্রকুলে বিধবা স্ত্রী থাকিলে যে কত প্রকার পাপের আশঙ্কা আছে বিবেচনা করিলে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।'

এ ধরনের যুক্তি অন্যদের কলমেও কখনও কখনও শোনা গিয়াছে। কিন্তু এই আলোচনায় বাল্যবিবাহের মূল ব্যর্থতা কোথায়, সেদিকেও অভ্রান্তভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। লেখক বলছেন—'মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল। সেই ঐক্য বয়স, অবস্থা, রূপ, গুণ, চরিত্র, বাহ্যভাব ও আন্তরিকভাব ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভর করে। আস্মদেশীয় বালদম্পতিরা পরস্পরের আশয় জানিতে পারিল না। অভিপ্রায়ে অবগাহন করিতে অবকাশ পাইল না। অবস্থার অনুসন্ধান পাইল না। আলাপ পরিচয় দ্বারা ইতরেতরের চরিত্র পরিচয়ের কথা দূরে থাকুক, একবার অন্যোন্য নয়নসঙ্ঘটনও হইল না, কেবল একজন উদাসীন বাচাল ঘটকের প্রবৃত্তিজনক বৃথা বচনে প্রত্যয় করিয়া পিতামাতার যেরূপ অভিরুচি হয় পুত্রের সেই বিধিই বিধিনিয়োগবৎ সুখ দুঃখের অনুল্লঙ্ঘনীয় সীমা হইয়া রহিল। এই জন্যই অস্মদ্দেশে দাম্পত্যনিবন্ধন অকপট প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না। কেবল প্রণয়ী ভর্তৃস্বরূপ এবং প্রণয়িনী গৃহপরিচারিকাস্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।'

বাক্য কয়টিতে শুধু বাল্যবিবাহের শোচনীয় ব্যর্থতা কোথায় তা-ই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়নি, সত্যকারের সফল সার্থক দাম্পত্যজীবন কোন্ পথে প্রকারান্তরে তারও সঠিক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের কিছু কিছু লেখালেখি সত্ত্বেও বহুবিবাহ উচ্ছেদ আন্দোলনের মতো বাংলায় বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করে কোনও স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হল মঞ্চে মালাবারীর আবির্ভাব। কোনও কোনও বাঙালিবাবু তাঁকে ব্যঙ্গ করে বলতেন—'মাল-ভারি!'

আগেই বলা হয়েছে মালাবারী জাতিতে পার্শি। সপ্তদশ শতক থেকেই পার্শিরা বোম্বাইয়ে এক সুসংগঠিত

সম্প্রদায় । অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বিষয়ে প্রগতিশীলও বটে । দশকের পর দশক আন্দোলন করে ১৮৬৫ সনে তাঁরা পাস করিয়েছিলেন পার্শিদের বিশেষ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ আইন । তারপর ১৮৫৮ সনের ইংরেজি আইনের আদলে চালু করেন একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে এক আইন । বলা হয়—এশিয়ায় প্রথম । বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ আইন চালু হওয়ার আগেই তাঁরা বিধবার বিয়ে দেওয়ার জন্য একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিলেন । মালাবারীর জন্ম গুজরাতে । লেখাপড়া ইংরেজি স্কুলে । তিনি কলেজে পড়েননি । তবে বোম্বাইয়ের ইংরেজ মহলে আনাগোনা ছিল তাঁর । তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে পশ্চিমী ভাবধারার প্রভাব পড়েছিল এই তরুণ পার্শির চিন্তাভাবনায় । সমাজসংস্কারক হিসাবে তিনি ছিলেন চাবুকের মতো । তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে ভাণ্ডারকরের মতো পাণ্ডিত্য ছিল না তাঁর, কেশব সেনের মতো ধর্মীয় উদ্দীপনা ছিল না, রানাডের মতো অসংখ্য অনুরাগীও ছিল না, কিন্তু হাতে ছিল ধারাল কলম । তিনি চাবুকের মতো সেটিকে ব্যবহার করতে জানতেন । তখন অনেক সমাজসংস্কারকই কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত । কিন্তু মালাবারী তাঁদের সামিল হতে রাজি হননি । তিনি বলতেন—কংগ্রেসের বাৎসরিক আনন্দমেলা, ক্যাম্পহোটেল, ফরমাশমাফিক প্রস্তাব রচনা, সর্বসম্মত হয়ে ভোট দেওয়া, এসব আমার জন্য নয় । তাঁর পছন্দ—কাজ । এমন কিছু করা যাতে সমাজে নাড়াচাড়া পড়ে । কবে দেশের মানুষ শিক্ষিত হবে, ভাবতে শিখবে, ভালমন্দ বুঝবে তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকতে রাজি ছিলেন না মালাবারী । অনাচার অবিচার আর অত্যাচার দেখে দেখে তিনি ক্লান্ত, অধৈর্য । তাঁর এক্ষুনি কিছু করা চাই । (ইন্ডিয়ান ন্যাশনালইজম অ্যান্ড হিন্দু সোস্যাল রিফর্ম, চার্লস এইচ হেইমসয়াথ, ১৯৬৪)

বিদ্যাসাগরের মতোই বিধবাদের জন্য কেঁদেছেন তিনি । লড়াই করেছেন অবশ্য কলমে । বাল্যবিবাহের বেদনাও একইভাবে তিনি প্রকাশ করতে শুরু করেন গত শতকের আশির দশকে । মালাবারীর নিজের কাগজ 'ইন্ডিয়ান স্পেকটেটর' তখন বোম্বাই অঞ্চলে বিশিষ্ট কাগজ । পরবর্তীকালে, শতকের এপারে পৌঁছে (১৯০১) তিনি 'ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট' নামেও একটি কাগজ বের করেন । তাছাড়া ছিল কে নটরাজনের 'ইন্ডিয়ান সোস্যাল রিফর্মার' । এসব কাগজই সেদিন পশ্চিম ভারতে তথা সারা ভারতে সংস্কারকদের প্রধান মুখপত্র । প্রসঙ্গত বলা দরকার এর আগে ভারতে যত সমাজসংস্কার আন্দোলন হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেসব ছিল আঞ্চলিক । মালাবারীর আন্দোলনের লক্ষ্য সমগ্র ভারত । তিনি চান সর্বভারতীয় আন্দোলন ।

প্রথম বিস্ফোরণ ১৮৮৪ সনের ১৫ আগস্ট । সেদিনই প্রকাশিত হয় মালাবারীর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'নোটস্ অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ ইন ইণ্ডিয়া' । সেই সঙ্গে 'এনফোর্সড উইডোহুড',—জবরদস্তিমূলক বৈধব্য । মালাবারীর প্রস্তাব—এখন থেকে পাঁচ বছর পরে যেন কোনও বিবাহিত ছেলেকে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া না হয় । তাছাড়া সরকারি চাকুরিতে অবিবাহিতদের অগ্রাধিকার দিতে হবে । বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে প্রচারে সরকারের শিক্ষাবিভাগকেও সামিল হতে হবে । স্কুলপাঠ্য বইতে বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে রচনা ছাপাতে হবে । বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য—সব বিধবাকে ১৮৫৬ সনের আইনের আওতায় আনতে হবে ।

এই দুই রচনা নিস্তরঙ্গ হিন্দুসমাজে আবার ঢেউ তুলল । দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় আলোড়িত । কেউ মালাবারীর পক্ষে, কেউ বিপক্ষে । নানা ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তাঁর 'নোট' সম্পর্কে প্রায় 'দুশ' উত্তর পৌঁছাল মালাবারীর হাতে । তাছাড়া, সাড়া দিলেন সরকারি মহলও । বিশিষ্ট সরকারি আমলা এবং সচিবরা মালাবারী সমীপে পেশ করলেন তাঁদের বক্তব্য । সেই সঙ্গে নানা তথ্য ।

দেখা গেল বিধবা এবং বালিকাবধূ, ভারতে দুইয়ের অবস্থা ভয়াবহ । ১৮৮১ সনের লোকগণনায় দেখা গেছে এদেশের কোনও কোনও এলাকায় মেয়েদের পাঁচভাগের একভাগই বিধবা । বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি

৩১. বিবিয়ানা শুধু পোষাকে নয়, উনিশ শতকের কিছু কিছু বাঙালি মেয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ।

বুঝিবা আরও হৃদয়বিদারক। ওঁরা, সেই সঙ্গে অবশিষ্ট ভারত সভয়ে শুনল বাংলায় ব্রাহ্মণেরা কন্যাদান করেন তাদের বয়স দশ পূর্ণ হবার আগেই। অনেকে স্বামীর ঘর করতে যায় আরও কম বয়সে। পরিসংখ্যানে জানা গেল, বাংলায় দশ বছরের কমবয়সী মেয়েদের শতকরা ১৪ জনই হয় বিবাহিত কিংবা বিধবা। বোম্বাইতে তার অনুপাত শতকরা ১০ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ৪·৫ ভাগ।

নানা মহলের আলোচনায় বাল্যবিবাহের হাহাকার যেন সেদিন আরও ব্যাপ্ত আরও উচ্চকিত। জানা গেল শাস্ত্রের দোহাই-ই এ ব্যাপারে শেষ কথা নয়। কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি লাভের বাসনাও নয় শেষ যুক্তি। বাল্যবিবাহের পিছনে এক কারণ, সমর্থ পুরুষের মানসিক তাড়না। তারা কুমারী চায়। চায় কিশোরী। ফলে, অনেক বয়স্ক পুরুষ কনে-পণের বিনিময়েও কচিকাঁচা মেয়েকে সংগ্রহ করে। মনে পড়ে বাংলা প্রহসনের সেই মেয়েটির কথা, সে বুড়ো বরকে নিয়ে ঘর করতে গিয়ে ব্যঙ্গ করে বলেছিল—'আমি ফচকে ছুঁড়ি, ফুলের কুঁড়ি/ মড়ি পোড়ানীর ঝি,/ বিয়ের পর বুড়ো ভাতারকে/ বাবা বলেছি!' বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা নিয়ে বাংলায় সেদিন এ ধরনের আরও কতই না প্রবাদ প্রবচন, সদুক্তিকর্ণামৃত। বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে হলে অচিরে বৈধব্যের সম্ভাবনা। বালকের সঙ্গে বিয়ে হলেও, বলাবাহুল্য, বৈধব্য আসতে পারে বালোই। দুইয়েরই সম্ভাব্য পরিণতি বৈধব্য। বাল্যবিবাহ, সেদিক থেকে মেয়েদের পক্ষে শাঁখের করাত। বর বুড়ো হলে বিপত্তি, বালক হলেও।

বিয়ে মানেই কি সহবাস? মালাবারীর 'নোট'-এর উত্তরে কেউ কেউ বললেন—তা হবে কেন? কনে সাবালিকা না-হওয়া পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করে বই কি! কেউ কেউ প্রশ্ন তুললেন—মেয়েরা সাবালিকা হয় কত বছর বয়সে? তা-ই নিয়েও বিতর্ক। কেউ বললেন—ক'জন আর ওসব নিয়ে ভাবেন। কেউ বললেন—ভাবেন সবাই। নিজেদের বর্বর ভাবা ঠিক নয়। শেষ প্রশ্ন—আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা কি সঙ্গত? একদল বললেন—অবশ্যই না। অন্যদের বক্তব্য—আইন যদি করতেই হয়, তবে আইনবলে বিয়ে নয়, বন্ধ করা হোক না বালিকা-সহবাস। তবে, একদল বললেন, কোনও মতেই বাপের অপরাধের জন্য ছেলেকে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। পরীক্ষা দিতে না দিলে কিন্তু শাস্তি পাবে বাবা নয়, ছেলে। অথচ, কে না জানেন, বিয়েতে ছেলের ভূমিকা গৌণ। আর এক দলের সুচিন্তিত রায়—কোনও কিছু নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হওয়ার হেতু নেই। দেশে বরং অসবর্ণ বিয়ে চালু করা হোক; দেখা যাবে কন্যাদায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মা-বাবা মোটেই আর ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে না। স্ববর্ণে পাত্র কম বলেই না মেয়ে জন্মাতে না জন্মাতে তার বিয়ে নিয়ে মা-বাবার এমন ভাবনা।

সরকার যথারীতি দ্বিধাগ্রস্ত। সরকারি কর্তাব্যক্তিরা বললেন—আইনের কথা পরে, আগে জনমত তৈরি হোক। একজন রাজপুরুষ মালাবারীকে লিখেছিলেন—হাতে চাবুক নিয়ে তুমি তো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, কিন্তু উত্তেজনায় ঘোড়া পথ ছেড়ে অন্য কোনও দিকে না ছুটতে শুরু করে। সুতরাং, ধীরে চলাই বোধহয় সঙ্গত। বড়লাট লর্ড রিপনেরও একই পরামর্শ। মালাবারী যাই করুন, সরকারকে তো ভেবেচিন্তে এগোতে হবে।

১৮৮৪ সনে লর্ড রিপন বিদায় নিলেন। তাঁর আসনে এলেন লর্ড ডাফরিন। মালাবারী এবং আন্দোলকারীদের চাপে পড়ে তিনি এক অনুসন্ধান কমিটি বসালেন সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য। দু'বছর পরে, ১৮৮৬ সনে তাঁরা সরকার বরাবরে পেশ করলেন নিজেদের তথ্যানুসন্ধানের ফলাফল। সপারিষদ গভর্নর জেনারেল প্রতিবেদন খতিয়ে দেখে আন্দোলনকারীদের জানিয়ে দিলেন সরকারের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত —বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য সরকার আইন প্রণয়নে অক্ষম। কেননা, দেশে যেসব আইন চালু রয়েছে, সেগুলি প্রয়োগ করে বাল্যবিবাহ দমন করা সম্ভব নয়, প্রয়োজন আনকোরা নতুন আইনের। সরকার তাতে সম্মত নন। কারণ, তাতে জনমনে বিরূপ আন্দোলনের ফলে জনমত ইতিমধ্যেই উদ্বেলিত। স্পষ্টতই

এদেশের মানুষ সাধারণভাবে এ-ব্যাপারে কোনও সরকারি আইন চায় না। রাজ সরকারের পক্ষ থেকে মালাবারীকে সান্ত্বনা দেওয়া হল—দিন পাল্টাচ্ছে। অপেক্ষা কর। কালে সবই ঠিক হয়ে যাবে। এদেশের মানুষের নৈতিক মান ক্রমে ক্রমে নিশ্চয় উন্নত হবে। তাছাড়া, সরকার একটু বিদ্রূপের সুরেই মন্তব্য করলেন, ভারতীয়রা এদিকে রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ; অথচ সমাজে যেসব সংস্কার তাদের নিজেদেরই করা উচিত, সেগুলির দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকারের ওপর—তা কেন ?

মালাবারী অতঃপর আর্জি নিয়ে চললেন সাত সমুদ্রের ওপারে, টেমস নদীর তীরে। তাঁর আবেদন ব্রিটিশ জনমত এবং পার্লামেন্টের কাছে। বক্তব্য একই, ভারতে ইংরাজ সরকারের চোখের সামনে নানা সামাজিক অবিচার ও অনাচার চলছে, তা বন্ধ করা চাই। চাই—বিধবা বিবাহ আইনের সংস্কার এবং বাল্যবিবাহ উচ্ছেদ আইন। ক'বছর আগে ১৮৭১ সনে ম্যারি কার্পেন্টার ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিলাতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ইন এইড অব সোসাল প্রোগ্রেস অ্যাণ্ড ফিমেল এডুকেশন।' ওঁরাই গ্রহণ করলেন ব্রিটেনে মালাবারীর প্রচারের দায়িত্ব। তাঁরাই মালাবারীর বক্তৃতার আয়োজন করতেন, মালাবারীর লেখা কাগজে ছাপাবার ব্যবস্থা করতেন। ১৮৯০ সনে বিলাতে বসেই মালাবারী প্রকাশ করলেন তাঁর আর একটি বিখ্যাত আবেদন—'অ্যাপিল অন বিহাফ অব দি ডটারস অব ইন্ডিয়া।' ভারতে আন্দোলনকারীদের সাহায্যের জন্য ম্যারি কার্পেন্টারের অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হল। সুসংগঠিত প্রচারের ফলে মালাবারীর আন্দোলনের সমর্থনে সাড়াও মিলল অভূতপূর্ব। ইংল্যান্ডের জনমতেরও দাবি—আইন চাই। সেদিন মালাবারীর সমর্থনে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের দুইজন ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল—লর্ড নর্থব্রুক ও লর্ড ডাফরিন, বেশ ক'জন ভূতপূর্ব প্রাদেশিক গভর্নর। তাছাড়া ডিউক অব ওয়েস্টমিনস্টার, ডিউক অব আরগিল-এর মতো গণ্যমান্যরা। সেইসঙ্গে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার, লর্ড টেনিসন, হার্বার্ট স্পেন্সারের মতো স্বনামধন্য লেখক, চিন্তাবিদরা। সকলে একবাক্যে বললেন—বাল্যবিবাহ এক নিষ্ঠুর আচার, এই অনাচার বন্ধ করার জন্য অবশ্যই আইন চাই।

মালাবারী যখন ইংল্যাণ্ডে, তাঁর সমর্থকরা তখনও এদেশে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আন্দোলন মানে সভা সমিতি আর লেখালেখি। মাঝে মধ্যে সরকারের কাছে আর্জি। আন্দোলনকারী ক্রমে বুঝতে পারলেন মালাবারীর আদি 'নোট' আঁকড়ে থাকলে, বিবাহিতকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না জাতীয় দাবি ধরে বসে থাকলে কিছুই হবে না। দাবিপত্র বাস্তবসম্মত করা দরকার। কে টি তেলাঙ্গ নামে একজন নেতা বললেন—বিয়ে বন্ধ করার দরকার কী ? নাবালিকার সঙ্গে সহবাস বন্ধ করলেই তো আমাদের অভীষ্ট অনেকটা সিদ্ধ হয়ে যায়। মালাবারীর আর এক সহযোগী দয়ারাম গিডুমল ভারতীয় অপরাধ দণ্ডবিধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেলন। ওই আইনে ১৮৬০ সন থেকে 'এজ অব কনসেন্ট' বা মেয়েদের সম্মতি সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারা ছিল। তাতে বলা ছিল দশ বছরের কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে সহবাস করলে সেটা হবে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই বিশেষ ধারাটির প্রেরণা ছিলেন বিদ্যাসাগর। গিডুমল বললেন—ওই ধারাটি সংশোধন করে দশের বদলে বারো করে দিলেই তো সমস্যা মিটে যায়। সোজাসুজি বলে দেওয়া দরকার, বিবাহিত হোক, অবিবাহিত হোক, বয়স বারো বছরের কম হলে কোনও মেয়ের সঙ্গে সহবাস করা চলবে না। করলে সাজা হবে। অন্যরা তাঁর কথায় যুক্তি খুঁজে পেলেন। তাইতো, সাপও মরছে লাঠিও ভাঙছে না। নতুন আইন পাস করাতে হচ্ছে না, অথচ নাবালিকা পীড়নের সম্ভাবনাও কমে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, এপথে এগোলে প্রতিরোধও নিশ্চয় কম হবে।

তা কি আর হয় ? পেনাল কোড সংশোধন করে সহবাসের বয়স বারো ধার্য হতে পারে শুনে, আবার

'গেল, গেল' রব উঠল চারদিকে। শ্লোগান উঠল—হিন্দুধর্ম বিপন্ন। প্রতিরোধ আন্দোলন সবচেয়ে প্রবল হয়ে ওঠে বাংলায় আর মহারাষ্ট্রে। তুলনায় উত্তর ভারতের মনোভঙ্গি সেদিন যার পর নাই নরম। মাদ্রাজে সমর্থক আর বিরোধীরা শক্তিতে প্রায় সমান সমান। মহারাষ্ট্রে পরিস্থিতি অন্যরকম। সেখানে সহবাস-সম্মতি সম্পর্কিত খসড়া আইনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন স্বয়ং বালগঙ্গাধর টিলক। ১৮৫৫ সন থেকেই টিলক হিন্দুদের বিয়ে ইত্যাদি ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের নাক গলানোর নীতির বিরোধিতা করে আসছিলেন। সরকার সহবাসের বয়সও ধার্য করে দিতে পারেন এই সম্ভাবনা শোনামাত্র তিনি তাঁর 'কেশরী' আর 'মারাঠা' কাগজে বজ্রনির্ঘোষ শুরু করলেন। মালাবারীর মতো টিলকও চাইলেন বিতর্ককে সর্বভারতীয় করে তুলতে। তবে তাঁর লক্ষ্য অন্য। তিনি চাইছিলেন বিক্ষোভকে ইংরাজবিরোধী আন্দোলনে পরিণত করতে। টিলকের এই লড়াই ছিল অনেকের মতে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী মডারেটদের বিরুদ্ধেও লড়াই। কারণ, মডারেটরা ছিলেন সহবাস-সম্মতি বিষয়ক আইনের সপক্ষে। সুতরাং, বাল্যবিবাহ যদিও ছিল প্রধানত বাংলামুলুকের সমস্যা, তাকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রেও তরঙ্গভঙ্গ।

বাংলায় স্বভাবতই ঝড়।

> 'ওহে লর্ড ল্যান্সডাউন! কেন কেন তুমি ভ্রমেতে ডুবিয়া।
> করিলে ধর্ম্মের লোপ নীরবে বসিয়া ॥
> কান্দিলে ভারতবাসী বিশ কোটি প্রজা।
> কি দোষে তাহারে বল দিলে এই সাজা ॥…
> 'তুলিয়াছ সতীদাহ চড়ক ঘূর্ণন।
> তাহাতে ত আপত্তি কেহ করেনি কখন ॥
> শিশুসুত বিসর্জ্জন দিলে বিসর্জ্জন।
> বিরুদ্ধে একটি স্বর ছুটেনি কখন ॥
> গর্ভধানে ধর্মনাশ হইবে দেখিয়া।
> মন দুঃখে কাঁদে সব কাতরে ডাকিয়া ॥…

চট্টগ্রামে বসে 'হায় কি সর্বনাশ' বলে বুক থাবড়ে হায় হায় করতে লাগলেন বঙ্গীয় কবি। বাংলার সাংবাদিক লিখলেন—সহবাস সম্মতি আইন পাস হলে ধর্মলোপ পাবে। হিন্দু মেয়েরা পাপে প্ররোচিত হবে। হিন্দুর কাছে এই ঐহিক জীবনের চেয়ে মরণোত্তর জীবন কি বেশি মূল্যবান নয়? তবে এ জীবনে স্বাস্থ্যবান সন্তান লাভের জন্য হিন্দু রমণী কেন অধর্মে উৎসাহিত। এই মতামত 'দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা'র। বাংলার প্রহসন রচয়িতা রায় দিলেন—কিশোরীর বদলে যুবতী বিয়ে করা বারবনিতাকে ঘরে আনার সামিল। কেননা, প্রাপ্তবয়স্কা হইলে কন্যা দূষিত হইতে বাধ্য। প্রহসনটির (বৌবাবু, কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯০) একটি চরিত্র বেশ্যাকে বিয়ে করে ব্যঙ্গের সুরে বলছে—'আমি এমন সাধ্বী গুণশীলা যুবতী, সুমতি মানিনি কামিনীর শ্রীকমকণ্ঠে, না পাণিগ্রহণ করে বঙ্গে, ভারতে, জগতে প্রজ্জ্বলন্ত উদাহরণ পাষাণ ভাষায়, পাষাণ অক্ষরে স্থাপন কত্তে সমর্থ হলুম।' কার্যত তাঁকে সমর্থন জানালেন একজন বাঙালি সম্পাদক। 'অনুসন্ধান' (পৌষ, ১২৯৪) লিখল—'যদি বিলাতি স্বয়ম্বর (Courtship) হিন্দুসমাজে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে জগতে সতীত্বের আদর্শ পবিত্র হিন্দুসমাজের কি অবস্থা হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। কুমারী অবস্থায় সেই চঞ্চল অপরিণত বুদ্ধিতে শত শত পুরুষ পরীক্ষা করিয়া পতি মনোনীত করিতে গিয়া তাহার সতীত্বের দশা কি হইবে একবার ভাবিয়া দেখুন।' কাগজটির সুচিন্তিত অভিমত—'একটি

**৩২. পারিবারিক। পশ্চিমী ভাবধারায় লালিত একটি বাঙালি পরিবার। গত শতকের শেষদিকে।**

অজ্ঞান বিহঙ্গকে ধাড়ীবেলায় পোষ মানান যায় না। ইংরাজদিগের সমাজ স্বতন্ত্রপ্রকার। সতীত্বনাশে পরিবারের মধ্যে থাকিতে হয় না।' অর্থাৎ, কিশোরী চাই। আগমার্ক কুমারী। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় (জন্ম-১৮২০) পর্যন্ত এ ধরনের যুক্তি দেখিয়ে সমর্থন করে গেছেন বাল্যবিবাহ। তিনি লিখেছিলেন—'আমাদের বাল্যবিবাহ প্রথার অনেক দোষ আছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু এ অবস্থায় যদৃশ সুখানুভব হয় কোর্টশিপ অবস্থায় তাদৃশ সুখলাভ হইতে পারে না।...আমাদের বিবাহিত অবস্থার প্রথমকালের সুখের সঙ্গে তাহাদের (ইংরেজদের) কোর্টশিপ কালের সুখের তুলনা হয় না।' কেননা, কার্তিকেয়চন্দ্র বলেন—বাল্যকালে বিয়ে হলে 'নায়ক নায়িকার স্নেহ কেবল পরস্পরের প্রতি বদ্ধ থাকে, উভয়ের পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে শীঘ্রই সন্তান জন্মে, এবং জননীর যে স্নেহ সুদ্ধ জনকের অধিকারে থাকে, তাহার কতকাংশ ঐ সন্তান অধিকার করিয়া লয়!' 'অনুসন্ধান' সম্পাদক যদি বাঙালি মেয়ের সতীত্ব রক্ষার চিন্তায় নাবালিকা বিয়ের পক্ষে, ইনি তবে প্রেমের লোভে! অন্যভাবে বললে, কার্তিকেয় চন্দ্র রাখঢাক না রেখে খোলাখুলিই বলে দিয়েছেন বাল্যবিবাহের পরমপ্রাপ্তি কিশোরীভজনার সুযোগ। উল্লেখ্য, কার্তিকেয় চন্দ্রের বিয়ে হয় পনের বছর বয়সে।

কেউ সতীত্বরক্ষার দোহাই পাড়ছেন, কেউ সমাজ রক্ষার। বাঙালি শাস্ত্রকাররা এগিয়ে এলেন শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি নিয়ে। রাণাঘাটের সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ১২৯৭ সালের ফাল্গুনে দেশময় একটি বাংলা পুস্তিকা বিতরণ করেন। নাম—'সহবাস সম্মতি বিষয়ক আইন সম্বন্ধে দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থাপত্র।' তিনি দুই তিন শ' খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে এ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় পরামর্শ প্রার্থনা করেছিলেন। অনেকেই সেই আবেদনে সাড়া দেন। রাণাঘাটের মান্য জমিদার তাঁদের বক্তব্যসার প্রকাশ করেন পুস্তিকা আকারে। নাতিদীর্ঘ এই পুস্তিকাটি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কামশাস্ত্রেরই রকমফের। সুতরাং, সংস্কৃত শ্লোকগুলো এবং তার তর্জমা উহ্য রাখাই শ্রেয়। তার চুম্বকমাত্র দেওয়া হল। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, অর্থাৎ সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করে বলছেন : ১) গর্ভাধান সংস্কার সময়ে পত্নীসহবাস আবশ্যক।' ২) 'অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে গর্ভাধান সংস্কার মন্ত্রদ্বারা করিলেই সংস্কার সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে স্ত্রী সংসর্গের নিত্যতা নাই,...কিন্তু গর্ভাধানে স্ত্রী সংসর্গই প্রধান, মন্ত্রাদি আনুষঙ্গিক।' ৩) 'বধূর দ্বাদশ বর্ষের পর্বে বা পরে প্রথম ঋতুকালে গর্ভাধান করিতে হয়, তাহাতে বয়সের নির্ণয় নাই।' ৪) 'স্ত্রীর আদ্য ঋতুতে এবং একটি পুত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ না করিলে পুরুষের পাপ হয়।' ৫) 'ঋতুকালে স্বামী সহবাস না করিলে হিন্দু স্ত্রীগণের পাপ হয়।' ৬) ঋতুমতী হইলেই এদেশীয় স্ত্রীগণ সন্তানজননী শক্তি লাভ করে।' ৭) 'গর্ভাধান সংস্কার না-করিলে সন্তান গর্ভ ও বীজ সম্ভূত দোষ হইতে মুক্তি পায় না এবং দৈব পৈত্রকর্ম্মে অধিকারী হয় না।' ৮) হিন্দুগণ পুত্রবান না হইলে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পায় না।' ৯) 'কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে তাহার অভিভাবকগণের এবং রজস্বলা কন্যাকে বিবাহকর্ত্তার উৎকট পাপ হয়। এবং ১০) 'প্রথম ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীসম্ভোগ করিলে স্বামীর পাপ হয়।' প্রায় সবই পুরানো কথা। এইসব শাস্ত্রীয় যুক্তি বা অপযুক্তির আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। 'ব্যবস্থাপত্র'টিতে নতুন খবর একটাই, প্রথম ঋতুদর্শনের আগে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ। কিন্তু দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্রের জবানবন্দি থেকে মনে হয় কি তিনি কোনও রকম পাপবোধে পীড়িত ছিলেন? তবে কিশোরীদের জন্য সেদিনের তরুণ এবং যুবকদের কেন এই ব্যাকুলতা? সে কি শুধুই মিছিমিছি 'বউবউ' খেলা?

শাস্ত্রকারের সমর্থনে এগিয়ে এলেন অন্যরাও। 'অনুসন্ধান' কাগজে (ফাল্গুন, ১২৯৭) একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। শিরোনাম—'স্ত্রীসহবাসে আর্য্য নিয়ম'। সমস্ত প্রবন্ধটি পড়লে মনে হবে যেন যৌন-তত্ত্ব পড়া হচ্ছে। কিন্তু লেখক দাবি করছেন এটি নাকি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। চরক, সুশ্রুত, থেকে

শুরু করে কিছু কিছু বিলাতী চিকিৎসককেও সাক্ষী মেনেছেন তিনি তাঁর সমর্থনে । লেখক বলছেন—ভারত গ্রীষ্মপ্রধান দেশ । এখানে মেয়েদের রকমসকম অন্য রকম । 'হারিস সাহেব বলেন—হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১/২ জন ৯ বৎসরে, ৩/৪ জন ১০ বৎসরে, ৮ জন ১১ বৎসরে, এবং ২৫ জন ১২ বৎসরে প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে । ডাক্তার চার্চ্চিল সাহেব বলেন—এতদ্দেশের অধিকাংশই ১০/১১ বৎসরে প্রথম ঋতুমতী হইয়া থাকে ল্যাপল্যান্ড দেশে ২০/২৫ বৎসরে প্রথম ঋতু প্রকাশ পায় ।' কে এই হারিস সাহেব, ডাক্তার চার্চ্চিলই বা কে, লেখকের কাছে সে-প্রশ্ন তুলে লাভ নেই । তিনি প্রমাণ করে দিলেন ভারত আর ল্যাপল্যাণ্ড এক নয় । তারপর 'ঋতুবর্ণন' । লেখক বলছেন—'যে পুরুষ পুষ্পিত নারীতে গমন করে, তাহার বুদ্ধি, তেজ, বল, চক্ষু ও পরমায়ু সমুদয় নষ্ট হইয়া যায় ।' পরামর্শ—সবুরে মেওয়া ফলে । 'চতুর্থরাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত ক্রমশঃ যত পরে গর্ভাধান হয়, গর্ভজাত সন্তান ততই বীর্যশালী ও বলবান হয় ।' এ-পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল । তারপর ? তারপর সৃষ্টিতত্ত্ব । রীতিমত রোমহর্ষক । বলা বাহুল্য, সব বক্তব্যের সার : শুধু হিন্দুর ধর্ম রক্ষার জন্যই নয়, 'বিজ্ঞানসম্মত' সৃষ্টিতত্ত্বের স্বার্থেও যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা দরকার বাল্যবিবাহের অধিকার বক্তব্য : 'স্ত্রী সহবাস ও সম্মতির বয়স বৃদ্ধি না-করিলে দেশ ছাড়খারে গেল—লোকে ধনেপ্রাণে মারা গেল—এইরূপ নানা গোলযোগ তুলিয়াই, জনাকতক হিন্দুধর্ম্মবিধ্বংসী, সংস্কারক-ধ্বজাধারী হিন্দুর সর্বনাশ-জন্য প্রাণপণ যত্ন পাইতেছেন ; আর, গভর্নমেণ্টও তাহাদের সে কুহকে ভুলিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় হিন্দুর ধর্ম্মনাশে, হিন্দুর কুলপ্রচলিত প্রথায় হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । কিন্তু আমাদের কি দুরদৃষ্ট যে, কি কারণে লোকের প্রকৃত অনিষ্ট হইতেছে, সেদিকে কাহারো আদৌ দৃষ্টি নাই । কেবল ঐ একটা হুজুগ তুলিয়া হিন্দুর সর্বনাশ !'

ওদিকে আইনের সম্ভাবনা যত উজ্জ্বল হয়ে আসছে ততই তপ্ত হয়ে উঠছে বিতর্কের আসর । টিলক বললেন— যা একান্তভাবে ঘরের ব্যাপার, তাতে বিদেশী সরকারকে ডেকে আনা কেন ? সেটা অপমানকর, অথচ এদিকে আমরা চাইছি বিদেশীদের হঠাতে । রানাডে বললেন—সতীদাহ, চড়কে বানফোঁড়াএসব অনাচারও এদেশের মানুষ আন্দোলন করে সরকারি আইনবলেই নিষিদ্ধ করেছে । সুতরাং বাল্যবিবাহই বা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না কেন ? আইন হলে সেটা বিদেশীদের কোনও আইন চাপিয়ে দেওয়া হবে না, সঠিক শাস্ত্রীয় আচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে মাত্র । ১৮৮৭ সনে কংগ্রেসের সহযোগী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্স । তাঁরা রানাডেকে সমর্থন করলেন । বললেন—পেনাল কোড সংশোধন করে সহবাসের বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে বারো করাই শ্রেয় । ওঁরা এই মর্মে বোম্বাই অধিবেশনে (১৮৮৯) একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন । সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন আইনে বারো চাইছি বটে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করব চৌদ্দর আগে সহবাস না করার জন্য জনমত তৈরি করতে । ওঁদের সভায় টিলকও উপস্থিত ছিলেন । তিনি যথাপূর্ব আইন করার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী ভাষণ দেন । তিনি ঘরোয়া ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করতে নারাজ । সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার । তিনি বক্তৃতা করেন আইনের পক্ষে । মর্মস্পর্শী ভাষণ । তার কথা পরে ।

ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্সের পরবর্তী অধিবেশন (১৮৯০) বসে কলকাতায় । কলকাতা অধিবেশনে প্রধান আলোচ্যই ছিল প্রস্তাবিত এজ অব কনসেন্ট বিল । কারণ, সরকার তখন জানিয়ে দিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে তাঁরা 'সক্রিয়ভাবে' ভাবছেন । কিন্তু বিল-এর সমর্থকরা কলকাতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না । সাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিল-বিরোধী মনোভাব দেখে রানাডে যেন তখন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত । ওদিকে টিলক আগেকার মতোই তাঁর প্রতিরোধে অটল । সুতরাং, সমাজ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ এই সামাজিক বিষয়কে পাশ কাটিয়ে যেতে বাধ্য হলেন । কলকাতা সম্মেলনে দেশের সব সমাজকর্মীকে আহ্বান জানানো হল নিজেদের

বিয়ে বিলম্বিত করতে। টিলক সংশোধনী এনে তার আগে দুটি শব্দ জুড়ে দিলেন—'যতদূর সম্ভব !'

তা সত্ত্বেও ১৮৯০-এর শেষ দিকে বিতর্ক তুঙ্গে। পঞ্চান্ন জন মহিলা চিকিৎসক ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানালেন—কিছুতেই যেন চৌদ্দর আগে মেয়েদের সহবাসে বাধ্য না-করা হয়। দুই হাজার বিশিষ্ট ভারতীয় মহিলা আর্জি পাঠালেন মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে। ধর্মীয় বিতর্কও তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। একদলের শ্লোকের বিরুদ্ধে অন্য দল ছুঁড়ে দিচ্ছেন অন্য শ্লোক। ইটের বদলে ইট। না কি মহাকাশ যুদ্ধ ? ব্রাহ্মরা আক্রমণ চালাচ্ছেন গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে। বিতর্ক সব সময় শালীন্যের সীমানা মানছেন না। কখনও কখনও তা অতি নিম্নস্তরের। অশ্লীলতায়ও আপত্তি নেই কারও কারও।

তারই মধ্যে ১৮৯১ সনে কেন্দ্রে ভাইসরয়ের উত্থাপিত হল এজ অব কনসেন্ট বিল। রাজসরকার মত পালটেছেন। কারণ বিলাতে আন্দোলনে ফল পাওয়া গেছে। সেখান থেকে কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিতে জানিয়েছেন তাঁরা আইন প্রণয়নের পক্ষে। দ্বিতীয়ত, নতুন কোনও আইন করতে হচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে পেনাল কোডের একটি ধারা সংশোধন করলেই কাজ চলে যাচ্ছে। সুতরাং, সরকারের পক্ষে পিছিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তৃতীয়, এবিষয়ে উদ্যোগী হলে রাজনৈতিক চরিত্রে যাঁরা মডারেট, তাঁদের সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। সেটাও লাভ। তাছাড়া সরকার লক্ষ করেছেন বিরোধীরা কিছুটা পরস্পরবিরোধী। তাঁদের সকলের বিরোধিতার কারণ এক নয়। সুতরাং, যত প্রতিবাদই করুন, ওঁরা প্রতিরোধ করতে অক্ষম। এইসব সাত পাঁচ ভেবেই কাউন্সিলে তোলা হল বিষয়টি। সরকারের তরফে ঘোষণা করা হল—পেনাল কোডের যৎসামান্য সংশোধন করা হচ্ছে মাত্র, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রজাবর্গ অতএব নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সেটা লর্ড ল্যান্সডাউন-এর আমল।

এই সরকারি তৎপরতার পিছনে আর এক প্রেরণা ছিল একটি কিশোরী বাঙালি মেয়ে। কিশোরী না বলে তাকে শিশু বলাই বোধহয় ঠিক। কেননা, একটি প্রতিবেদনে তার বয়স বলা হয়েছে মাত্র নয় বছর। বাংলার নারী জাগরণ, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সরকারি খাতায় অবশ্য দশ। (Queen Empress Vrs. Harry Mohan Mythee, LL. R. 18, Cal 49, J. Willson, July 1890) মেয়েটির নাম ছিল ফুলমণি। তার বিয়ে হয়েছিল হরিমোহন মাইতি নামে পঁয়ত্রিশ বছরের এক বাঙালির সঙ্গে। স্ত্রীকে সে এমন সোহাগই করল যে, রক্তারক্তি কাণ্ড। যমে মানুষে লড়াই। সাড়ে তেরো ঘণ্টা পরে স্বামীর ভালবাসা হজম করতে না পেরে চিরকালের মতো ঝরে পড়ে ফুলের মতো শিশু, ফুলমণি। তাই নিয়ে পুলিশ, কাছারি। সমাজ শিহরিত। হাইকোর্টে চাঞ্চল্যকর মামলা। সেই সঙ্গে তীব্রতর আন্দোলন। কিন্তু বিচারকরা সাজা দিতে পারলেন না কামার্ত পুরুষ হরি মাইতিকে। কেননা, প্রমাণ মিলেছে সেই কালরাত্রির আগেই তার দশ বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল ! প্রচলিত আইনে দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস অপরাধ নয়।

প্রতিবাদীদের সওয়াল ছিল, কমবয়সে বিয়ে হয় বলেই একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, এদেশের পুরুষরা বর্বর, তারা নাবালিকাকে অঙ্কসঙ্গিনীতে পরিণত করে। কিংবা তারা জবরদস্তিমূলক যৌনাচারে আসক্ত। তাদের লালসা মেয়েদের বয়সের বা শারীরিক যোগ্যতা অযোগ্যতা বিবেচনা করতে জানে না। ফুলমণি নিজের জীবন দিয়ে জানিয়ে দিল সকলের কাছে না হলেও, কিছু কিছু পুরুষের কাছে মেয়েদের বয়স কোনও বিবেচনার বিষয়ই নয়। কামার্ত পুরুষ সর্বভুক। সরকারও সায় দিলেন। ফুলমণি একটি প্রমাণ মাত্র। তাঁরা জানালেন সিলেক্ট কমিটি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে মনে হয় অনেক পুরুষই মেয়েরা সোমত্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না। শাস্ত্রের নিষেধ থাকলেও অতি অল্পজনই তা মান্য করে চলেন। ফুলমণির উপাখ্যান জানিয়ে দিল আইনের প্রয়োজন কত জরুরি। সরকার অবশ্য এটাও

৩৩. স্নেহলতায় এই কিশোরীর মতো ভাগ্যবতী আর ক'জন ছিল ? গত শতকের শেষ প্রহরে তোলা ছবি।

গোপন করেননি যে, এই আইন প্রয়োগ করা শক্ত। কার ঘরে কী হচ্ছে সরকার তা জানবেন কেমন করে? ঘরে ঘরে খাটের তলায় প্রহরী মোতায়েন তো আর সম্ভব নয়। তাছাড়া বিয়ে নিষিদ্ধ হচ্ছে না। আইনের যে খসড়া কাউন্সিলের সামনে তাতে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বারো বছরের কম বয়সী মেয়ের সঙ্গে সহবাস। কেউ যদি সে আইন অমান্য করেন, তাবে তার সাজা হবে বটে, কিন্তু বিয়ে তবু নাকচ হবে না। স্বামী কয়েদী হলেও বিয়ে তবু অটুট থাকছে। অবশ্য ফুলমণির মতো কনে যদি পালিয়ে যায় তবে অন্য কথা। সরকার বললেন—আসলে প্রস্তাবিত এই আইন শিক্ষামূলক। বাল্যবিবাহ, বিশেষত শিশু বা কিশোরীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন যে অনাচার, দেশের মানুষকে সেটা বোঝানোর জন্যই এই আইন। আইনের আর এক সম্ভাব্য উপকার, এর ফলে কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ মা কিছুটা সময় হাতে পেতে পারেন। আইন দেখিয়ে মেয়ের বিয়ে দু'চার বছর পিছিয়ে দিলেও আর লোকনিন্দার ভয় থাকবে না। পাড়াপড়শিরা বুঝবেন আইনের ভয়েই ওঁরা বিয়ের চেষ্টা করছেন ধীরেসুস্থে।

এসব যুক্তির কথা। কিন্তু যুক্তির কথা তখন আর কে শোনে? দেশ তখন আবেগে ভাসছে। উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছেন গোঁড়ারা। শাস্ত্র, ধর্ম, সমাজ, দেশের বর্তমান ভবিষ্যৎ সব তখন ভর করেছে জোড়া খাটে। এমনকি জাতীয়তা পর্যন্ত। পাশাপাশি দুটি বালিশ। একটিতে নবীন কিশোরী। বাঙালি পুরুষের চিরকালের স্বপ্ন, সাধ, রূপকথার রাজকন্যা। তাকেই যদি কেড়ে নেওয়া হয় তবে আর এই জীবনের রইল কী! ধর্ম গেল, শাস্ত্র গেল, আচার গেল, সতীত্ব গেল! সবই গেল। এসব গেলে তবু সহ্য হয়। কিন্তু নববধূর বেশে রহস্যঘেরা অস্ফুট ওই যে কুঁড়িটি সেও যদি উধাও হয়ে যায় তবে বাঙালির যৌবন কী নিয়ে দীর্ঘ নিশিযাপন করবে? কাকে নিয়ে রচনা করবে কামনার অমরাবতী। বড়ু চণ্ডীদাসের কিশোরী-বন্দনায় বলা হয়েছিল—'রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ/ কামগন্ধ নাহি তায়।' উনিশ শতকের শেষ প্রহরে বাঙালি পুরুষের আর্তনাদ শুনলে মনে হয় যেন ফুলশয্যার রাত্রে লুঠেরার দল এসে কেড়ে নিয়ে গেছে কনেকে। ওই হাহাকারে স্পষ্টতই কামগন্ধ।

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মকথায় (মেমোরিজ অব মাই লাইফ অ্যাণ্ড টাইমস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫১) স্মৃতিচারণ করেছেন সেই দিনগুলোর, সহবাস সম্মতির বয়স বিবাহিত এবং অবিবাহিত, সব মেয়ের ক্ষেত্রেই বাড়িয়ে বারো করা নিয়ে সেদিন (১৮৯০-৯২) ভারতময় সে কী উত্তেজনা! প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দুদের মুখে আবার পুরানো সেই ধ্বনি—ধর্ম বিপন্ন। এমনকি কি উচ্চপদে আসীন ভারতীয়রা এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞরাও যোগ দিয়েছিলেন সেই আন্দোলনে। বাংলায় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন 'বঙ্গবাসী'। সম্মতি আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার ময়দানে আয়োজিত হয়েছিল বিরাট এক জনসভা। ময়দানে এত বড় জনসমাবেশ আর কখনও দেখা যায়নি। হিন্দুর বাল-বিবাহ প্রথার যৌক্তিকতা দেখাতে গিয়ে 'বঙ্গবাসী' একের পর এক প্রবন্ধ ছেপে ইংল্যাণ্ড এবং পশ্চিমের বিবাহ প্রথাকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। প্রবন্ধে ওই সব দেশের বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির সংখ্যাতত্ত্বও পরিবেশন করা হত। সমস্ত প্রচার এমনভাবে চালনা করা হচ্ছিল যাতে ভারতের জনসাধারণের চোখে ইংরেজের চরিত্র এবং তাদের সভ্যতা হীন বলে প্রতিপন্ন হয়। বাধ্য হয়েই সরকারকে 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হল। তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হল। মনে হয় হয়তো এদেশে সেটাই আমাদের কালে বাংলায় প্রথম রাজদ্রোহের মামলা। 'বঙ্গবাসী' ক্ষমাপ্রার্থনা করে অব্যাহতি পেয়ে যায়। সরকার তাকে সতর্ক করে ছেড়ে দেন।

বিপিনচন্দ্র লিখেছেন—আমিও যোগ দিয়েছিলাম সেই আন্দোলনে। তবে সম্মতি আইনের সপক্ষে।

বলাবাহুল্য, বিপিনচন্দ্র এব্যাপারে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। বাংলায় প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে যেমন অনেকেই উচ্চকণ্ঠ, তেমনই পক্ষেও ছিলেন অনেক বিশিষ্ট বাঙালি। বিপিনচন্দ্র পালের ভূমিকা এ-ব্যাপারে

অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ রাজনৈতিক মতামতে তিনি ছিলেন চরমপন্থী, টিলকের কাছাকাছি। কিন্তু টিলকের মতো তিনি ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধকে জোড়া-খাটের পবিত্রতার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে সম্মত হননি। তাঁর সঙ্গে স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার ব্রাহ্মরাও। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান বিল-এর বিপক্ষে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন দ্বিধাগ্রস্ত। তাদের যেটুকু সমর্থন মিলেছে তা আমতা-আমতা করে বলা। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে যদি সবচেয়ে বাঙ্ময় 'বঙ্গবাসী', তবে সমর্থনে সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা ব্রাহ্মদের পরিচালিত কাগজ—'ইন্ডিয়ান মিরার'। এমনকি 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজ পর্যন্ত তখন সনাতন হিন্দুধর্মের নামে সহবাসের বয়স বারো করার বিপক্ষে! কাগজটির পরিচালক অবশ্য তখন হরিশচন্দ্র নন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' লিখেছিলেন, সহবাসে বিবাহিত মেয়ের সম্মতি গ্রহণের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেন তার বাবা। হিন্দু বিয়েতে মেয়ের মতামতের কোনও মূল্য নেই। প্রস্তাবিত আইন সমর্থনে অপরাধে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সেদিন একদিকে ব্রাহ্ম মনোমোহন ঘোষ অন্যদিকে হিন্দু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সমালোচনায় মুখর। তারই মধ্যে অসম সাহসে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল—'ইণ্ডিয়ান মিরার।' ব্রাহ্ম নায়ক নরেন্দ্রনাথ সেন তার সম্পাদক। বিল-এর বিরুদ্ধে বাংলার গ্রাজুয়েটেরা একটা সভা ডেকেছিলেন 'স্টার' থিয়েটারে। 'ইন্ডিয়ান মিরার' লিখেছিল এই সভা বাংলার লজ্জা। আরও লজ্জাকর সভায় মেডিক্যাল এবং ল-গ্র্যাজুয়েটদের উপস্থিতি! প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শোভাবাজারে বিল-এর বিরুদ্ধে কবিরাজদেরও সভা বসেছিল একটি। ভিষগাচার্য হিসাবে যথারীতি তাঁরা চরক শুশ্রুত উদ্ধৃত করেছিলেন। বলেছিলেন কোনও হিন্দু না-বালিকায় উপগত হয় না!

এঁদের মুখের মতো জবাব দিয়েছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। আগেই বলা হয়েছে তিনি ছিলেন প্রস্তাবিত আইনের সপক্ষে। ১৮৮৯ সনে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্স-এ তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন— ওই পবিত্র প্রথার ফলে গর্ভপাত অথবা অকালে জাত সন্তানদের নিয়েই আজকের হিন্দু জাতি। যাদের মায়ের বয়স দশ বা বারো এবং বাবার বয়স পনের বা ষোল, তাদের গর্ভপাতের ফসল বলাই ভাল। অথবা অকালে জাত। এদের সমবায়ে যে জাতি, তারা যে পরপদানত হবে তাতে আর বিস্ময় কী! আইনের আর এক সমর্থক ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তিনি বলেছিলেন—রাজকন্যা মালতীর বাবা কিংবা শকুন্তলার ঋষিপিতা যদি শুনতেন রজোদর্শন হওয়ামাত্র গর্ভধান ছিল শাস্ত্রসম্মত তবে তাঁরা নিশ্চয় অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন যাঁরা ওসব বলছেন তাঁদের মুখের দিকে! (নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, অ্যাসপেক্টস অব সোস্যাল হিস্ট্রি, প্রদীপ সিংহ, ১৯৬৫)।

এইসব গণ্যমান্য বাঙালির মতো এমনকি বটতলার কিছু-কিছু প্রহসন-লেখকও কিন্তু সেদিন সম্মতি আইনের সপক্ষে। যথা: সারদাচরণ ঘোষের 'বাল্য বিবাহের অমৃতফল' (১৮৮৪)। লেখক দেখিয়েছেন—বাল্যবিবাহে বিস্তর ক্ষতি। ছেলেদের পড়াশুনা পণ্ড। তাছাড়া, অন্যান্য পরিণামও মোটেই শুভ নয়। শ্যামাচরণ শ্রীমানির 'বাল্যদাহ নাটক'-এর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে একটি দৃশ্যে দেখানো হয়েছে দুটি মেয়ে ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরছে। একটি বয়স্ক। অন্যটি বালবধূ। বালবধূ বড়ই দুর্বল। বয়স যদিও তার খুবই কম, তবু বড় মেয়েটির সঙ্গে সে সমান তালে চলতে পারছে না, থেকে থেকেই পিছিয়ে পড়ছে। বড় ছোটকে ব্যঙ্গ করছে—'আমরা তো তোদের মত ছেলেবেলা ভাতার নিয়ে শুতে শিখিনি, পনের ষোল বয়সের না হলে সে কেমন জানতেমই না, তোদের এই বয়সে ছেলে হল মাগো! কলিকালই বটে!' ১২৮০ বঙ্গাব্দে ঢাকা থেকে একটি আলাদা কাগজই বের হয়েছিল বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে

প্রচারের জন্য। কিছু কিছু গানও লেখা হয়েছিল। যেমন—



'ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে/ পরিপূর্ণ দশ দিক ঘোর অন্ধকারে।/ মহাপাপ শিশুবিয়ে এদেশে প্রবেশ পেয়ে/ ছারখার করিলরে স্বর্ণভারতেরে।' ইত্যাদি

লড়াই চলেছিল সর্বস্তরে। তবে কিছুটা অসম লড়াই। কেননা, গোঁড়াপন্থীরা দলে ভারি। মধ্যপন্থীরা নীরব। এমনকি উদার মানবতাবাদীরাও যেন সংশয়পীড়িত। বিদ্যাসাগরের কথাই ধরা যাক। তিনি তখন অসুস্থ হয়ে ফরাসডাঙ্গায় আছেন। সরকার সহবাস সম্মতি বিল সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন (বিদ্যাসাগর, ১৯২২)—'বাধ্য হয়ে পাঁচ ছয়দিনের জন্য তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। তারপর শুরু হয় শাস্ত্রমন্থন। বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ সম্পর্কে যেভাবে তিনি গবেষণা করেছিলেন অনেকটা সেই ভঙ্গি। কিন্তু সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাসাগর সরকারকে জানালেন—'এই বিলের সর্বতোভাবে অনুমোদন করিতে আমি সমর্থ নহি। যে স্থলে স্ত্রী দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বে ঋতুমতী হয়, সেস্থলে উক্ত বিল আইনে পরিণত হইলে, সর্ব্ববিধায়ে গর্ভাধান-সংস্কারানুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। গর্ভাধান-সংস্কার শাস্ত্রবিহিত ; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণত বঙ্গদেশে প্রচলিত। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শন হইলে স্বামীকে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হয়।' ইত্যাদি। অর্থাৎ, গোঁড়াপন্থীদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি। আশ্চর্য, এই বিদ্যাসাগরই কিন্তু বিধবা বিবাহ আর বহুবিবাহ আন্দোলন উপলক্ষে বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কেও মতামত দিতে ইতস্তত করেননি। আর, 'সর্বশুভঙ্করী' পত্রিকার উল্লিখিত বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি যদি সত্যই তাঁর রচনা হয়, তবে বাধ্য হয়েই বলতে হয় বিদ্যাসাগর পুরোপুরি নিজেকে অস্বীকার করলেন। বিহারীলাল লিখেছেন—সমগ্র হিন্দুসমাজ এই সিদ্ধান্তে খুশি হলেন। তাঁরা ধরে নিলেন বিধবা-বিবাহ চল করা যে ভুল হয়েছে বিদ্যাসাগর শেষ জীবনে তা বুঝতে পেরেছিলেন। সে কারণেই সহবাস সম্মতি আইনের পক্ষে মত দিয়ে তিনি আর ভুলের বোঝা বাড়াতে চাননি।

এসব অনুমানমাত্র। বোধহয় এই অনুমান ঠিক নয়। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্য বিদ্যাসাগর কখনও অনুশোচনা করেননি। তবে সহবাস সম্মতি আইন উপলক্ষে তিনি পিছু হটলেন কেন, সে প্রশ্ন উঠতেই পারে। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ (বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ১৯৭৩) লিখেছেন—'মনে হয় প্রাচীন শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য এবং নতুন সামাজিক কর্তব্য, এই দুয়ের সমন্বয়-স্থাপনের দুরূহ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে, সব সময় তিনি সমতা রাখতে পারেননি। মধ্যে মধ্যে ঐতিহ্যের দিকে তিনি বেশি ঝুঁকেছেন, আবার কখনো নতুন সামাজিক সত্যকে বেশি জোর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বোঝা যায়, এবিষয়ে তাঁর একটা মানসিক দ্বন্দ্ব বরাবরই ছিল, এবং সে দ্বন্দ্বের অবসান তিনি একেবারে ঘটাতে পারেননি। তাঁর মতো পুরুষের জীবনে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সর্বতোভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বশ্রেণীগত স্ববিরোধের জালে জড়িয়ে পড়ে সেই প্রত্যাশাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে অক্ষম হয়েছিলেন।' এই স্ববিরোধ কিন্তু সেদিন অনেক বাঙালি উদারপন্থী মানবতাবাদীর মধ্যেই।

বিদ্যাসাগর সহবাস সম্মতি বিল-এর বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য জানিয়ে সরকারকে চিঠি লেখেন ১৮৯১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে। তার কয়েকমাসের মধ্যেই, জুনে তাঁর মৃত্যু। মৃত্যুর আগে রক্ষণশীলদের হাতে তিনি তুলে দিয়ে গেলেন একটি অতি-মূল্যবান হাতিয়ার।

বঙ্কিমচন্দ্রও বলতে গেলে প্রায় তা-ই করেছেন। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সহবাস সম্মতি বিল সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইলে তিনি খসখস করে কয়টি ছত্র লিখে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য—'বিবাহিতাদিগের সম্মতির বয়ঃক্রম সম্পর্কে যে আন্দোলন হইতেছে আমি ইহাকে কতকটা বৃথাড়ম্বর মনে করি। আমি যতদূর জানি এদেশীয় বালিকারা দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বে সচরাচর ঋতুমতী হয় না। এবং হরি মাইতির ন্যায় পাষণ্ড

৩৪. গার্হস্থ-চিত্র। অভিজাত্যের সঙ্গে মিলেছে আধুনিকতা!

অতি বিরল। সুতরাং এবিষয়ে কোন আইনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। তবে ইহাও বক্তব্য, যে দ্বাদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বামীসংসর্গ অবিধেয়, এবং ইহা আমাদিগের দেশের প্রাচীন রীতিবিরুদ্ধ। তাহার নিষেধের জন্য যদি কোন আইন হয় তাহাতে আমি ক্ষতি দেখি না। ঈদৃশ রাজনিয়ম প্রাচীন দেশাচার বিরুদ্ধে হইবে না।' মনে হয় না কি বঙ্কিম কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত? তিনি বলছেন—আইনের দরকার নেই। তবে হলে ক্ষতিও নেই। এই চিঠিতেই তিনি লিখেছেন—'বাল্যবিবাহের আমি পক্ষপাতী। কিন্তু বাল্যবিবাহ অর্থে বাল্যকালে বয়সের অনুচিত সংসর্গ বুঝি না। তাহার পক্ষপাতী নহি।' কিসের পক্ষপাতী তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি লিখেছেন—'এক্ষণে আইনমতে সম্মতিদানের দশ বৎসর; দশ বৎসরের স্থানে বার বৎসর হয়, ইহা আমার অনভিমত নহে। কিন্তু বার বৎসরের অধিক হওয়া কোনওক্রমে উচিত নহে।' হায়, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও চান কিশোরী! বারো বছরের মেয়েকে তাছাড়া আর কীই বা বলা যায়!

পরিস্থিতি যেখানে এই, তখন অমৃতলাল বসু 'সম্মতি সংকট'-এর (১৮৯১) মতো প্রহসন লিখতে বসে যাবেন তাতে আর বিস্ময় কী! জয়ন্ত গোস্বামী (সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন) 'এজ অব কনসেন্ট'-এর বিরুদ্ধে লেখা আরও একটি প্রহসনের সন্ধান দিয়েছেন। সেটি হরেন্দ্রলাল মিত্রের লেখা 'আইন বিভ্রাট' (১৮৯০)। তাতে দেখানো হয়েছে, আইনের অপব্যবহার হতে পারে। কেউ ইচ্ছে করলে ষড়যন্ত্র করে অন্যকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। একজন ভণ্ড ব্রাহ্ম আচার্যের সহায়তায় একজন ধনী জমিদার কেমন করে তাঁর এক সম্ভ্রান্ত প্রজাকে এই আইনের সুযোগে বিপদে ফেলেছিলেন তা-ই নিয়ে প্রহসন। ভদ্রলোক এবং তাঁর দুই পুত্রকে জেলে যেতে হয়েছিল আইনভঙ্গের দায়ে। অমৃতলালের প্রহসনটিতেও সে-ধরনের বিপদের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তার বিস্তার অনেক বেশি। আইনের সমালোচনা অনেক বেশি প্রখর, ব্যঙ্গ আরও তীক্ষ্ণ।

প্রথম দৃশ্যে দেখানো হয়েছে মর্ত্যে সহবাস সম্মতি আইন পাস হয়েছে শুনে কৈলাসে দুর্গা বড়ই চিন্তিত। তো চিন্তার কারণ ছিল বই কি! গৌরীদানের বাসনা তো তাঁকে দেখেই। তারপর দেখানো হয়েছে ইংরেজি স্কুলে পড়া ছেলের সঙ্গে সেকেলে বাবার বিতর্ক। বাবা এগারো বছরের মেয়েকে অনেক কষ্টে বিয়ে দিয়েছেন। আইন মানলে বারো বছর, নাহলে মেয়েকে বরের ঘরে পাঠানো যাবে না। অথচ ওদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়া আসছে। তাই নিয়ে সংকট। প্রতিবেশী আর একজনের সংকট একটু অন্যরকম। অনেক কষ্টে তিনি মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন। অথচ কনের বয়স সবে এগারো পার হয়েছে, বারো পূর্ণ হয়নি। তা-ই শুনে বরের অভিভাবকরা পিছিয়ে যেতে চাইছেন। মেয়ের বাবা ভাবছেন, কেমন করে একটা জাল কুষ্ঠি করানো যায়। আর একজন মাঝ রাত্তিরে রাস্তায় বের হয়ে পাগলের মতো পাহারাওয়ালা খুঁজছে। সে-প্রমাণ রাখতে চায় স্ত্রীর সঙ্গে এক খাটে ঘুমোয়নি। কেননা, তার স্ত্রী-আইনের হিসাবে নিতান্ত নাবালিকা। এসব নিয়েই জমে ওঠে কাল্পনিক সংকট।

প্রহসনটিতে যদৃচ্ছ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে সহবাস-সম্মতি আইনকে। মেয়ের বাবা বলছেন—'এসব হলো কি! টেক্স নিচ্ছিস, নে বাবা, আমাদের ঘরের ভিতর কি হচ্ছে—মেয়ের বে, এ সবে বাবু কোম্পানির হাত কেন?' মেয়ের মা'র সোজা কথা—'ওমা, সে কি কথা! আমার মেয়ে, আমার জামাই, আমি আদর করবো, খাওয়াব দাওয়াব, শোয়াব, তাতে কোম্পানির কি? এত টেক্স নিয়েও সাধ মিটে না, আমার বৌ-বেটা নিয়ে টান কেন? পুনর্ব্বে হলে জামাই ঘরে শোবে না ত তিন ছেলের মা হলে শোবে? আবার আইন করেছেন বারো বছর!' নারী-মজলিশে বাড়ির কাজের মেয়েটি বলছে—'আচ্ছা, মাগ ভাতারের ঘর করবে, তার দশ বছরেরই হ'ক, রাজার কি? আর যাদের গুষ্টির শ্রাদ্ধই হচ্ছে, ঐ জাত খেদান ব্যাটারা তাদের বা কি?

হতভাগা ব্যাটারা তোদের যা ইচ্ছা কর না, তোদের বোনকে আঠার বছর পর্যন্ত ঘরে রেখে আপনারা সব শিকেয় টিকিয়ে ভাতার ঘরে পাঠা না··· ।'

প্রহসনটিতে কিছু প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব কথাও রয়েছে । বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সার্বভৌম (তিনি টাকার লোভে আইনের সপক্ষে মত দিতে রাজি হননি) বলছেন—'কৈ, আমার ইংরাজী জানা কোন ডাক্তার বলে দিতে পারেন যে, কন্যাকাল উত্তীর্ণ হবার কোন একটি নিৰ্দ্ধারিত বয়স আছে ? ভগবান দত্ত কয়েকটি লক্ষণ আছে, তাই দেখে সেকাল নির্ধারণ কত্তে হয় । মনে কর এমন কি একটা নিয়ম হতে পারে যে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ আঁব পাকবে, সেই দিন সবাই পাকা আঁব খেতে আরম্ভ করবে, কিন্তু পাঁজি দেখে তা বলে কি আঁব খেতে হবে ? আঁবের পাকা হবার কতকগুলি লক্ষণ দেখতে হবে । বর্ণ হরিদ্রাভ হবে, সদগন্ধ বেরুবে, তবে সুমিষ্ট হয়েছে জ্ঞান করে ভক্ষণ করতে হবে, এর কার্ত্তিকও নেই, আষাঢ়ও নেই ।'

অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করলে সন্তান রুগ্ন হতে পারে সে তত্ত্বও অবলীলায় নাকচ করে দিয়েছেন সার্বভৌম । ইতিহাস পুরাণের অসংখ্য বিখ্যাত মানুষকে দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন—ওসব বাজে কথা । তিনি বলেন—'আচ্ছা ওসব ছেড়ে দাও, তোমাদের এখনকার কথা বলি—রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস, হরিশ্চন্দ্র, শম্ভুনাথ, রামগোপাল, রাজেন্দ্রলাল, রমেশচন্দ্র, গুরুদাস, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ইন্দ্রচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র আর কত বলব, মানুষ জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছে না,এঁদের জন্মতত্ত্ব লও, জানতে পারবে যে, কেহই যুবতী মাতার গর্ভজাত নহে ।' প্রহসনটি শেষ হয়েছে কালীঘাটে নারীপুরুষের মিলিত প্রার্থনায়,—'বড়ই কাতরে তোমার দুয়ারে/ এসেছি মা ঈশানি—' ।

বাস্তব প্রহসনেও কিন্তু একই উপসংহার । তার আগে একবার ভাইসরয়ের কাউন্সিলের উঁকি দেওয়া দরকার । সেখানেও তখন চলেছে তুমুল লড়াই । সেই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ভারতীয় সদস্য তখন মাত্র চারজন । তাঁদের মধ্যে দু'জন হিন্দু । তাঁদের অন্যতম কলকাতার বিখ্যাত আইনবিশারদ সার রমেশচন্দ্র মিত্র । তিনি বিল-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন । বললেন—এই বিল আইনে পরিণত হলে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেবে । দেশ ফেটে পড়বে । কারণ, ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে । একবার ভেবে দেখুন খ্রীস্টান সাহেবদের মৃত্যুর পর কবর না দিয়ে দাহ করলে কী কাণ্ড ঘটবে ! কাউন্সিলের দ্বিতীয় হিন্দু সদস্য কৃষ্ণজী লক্ষ্মণ নালকর বললেন—এতে মোটেও কারও ধর্মে হাত দেওয়া হচ্ছে না । বরং এতে দেশের সমূহ কল্যাণ হবে । কিন্তু রমেশচন্দ্রকে শান্ত করা ভার । তিনি তাঁর বক্তব্যে অবিচল । স্বভাবতই বাংলার রক্ষণশীলদের কাছে তিনি বীর নায়ক ।

বিপিনচন্দ্র পাল গড়ের মাঠে যে অভূতপূর্ব জনসমাবেশের কথা বলেছেন সেখানেও সকলের মুখে মুখে রমেশচন্দ্রর কথা । সভার বিবরণটি সত্যই শোনার মতো । 'চিত্রদর্শন' (ফাল্গুন-চৈত্র, ১২৯৭) লিখছে—'সহবাস সম্মতির আইন লইয়া দেশময় ঘোরতর আন্দোলন চলিয়াছিল । কলিকাতায় এরূপ আন্দোলন হইয়াছিল যে, ধর্মের জন্য, আইনের জন্য, কখনও যে এত লোক একত্রিত হয় নাই ইহা সর্ববাদিসম্মত । কলিকাতায়—এমন কি সমগ্র ভারতের ইতিহাসেও ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা ।···আমরা ১৪ই ফাল্গুন বুধবার গড়ের মাঠে যে মহা লোকারণ্য—যে অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করিয়া পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিব না । এ সভাধিবেশনের কথা যদি দিন কয়েক পূর্বে লোকে জানিতে পারিত, না জানি আরও কি অদ্ভুত দৃশ্যই দেখিতাম । হিন্দু, মুসলমান, উত্তর পশ্চিমবাসী, মাড়োয়ারী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী, মৈথিলী, উৎকলবাসী এত জাতির লোক ধর্মলোপ ভয়ে ভীত হইয়া মহাক্ষেত্রে মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন । বহুসংখ্যক শ্রোতা, সুতরাং বক্তৃতার জন্য প্রধানতঃ ৮টি মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল । এই ৮টি মঞ্চে ৪০ জনেরও অধিক বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্নভাষী লোক স্ব স্ব ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন । এই কয়টি

মঞ্চ ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণের নিকট বক্তব্য প্রচার করিয়াছিলেন।' রীতিমত ব্যাবেল। তবু প্রতিবেদক বক্তাদের চিনতে ভুল করেননি। 'চিত্রদর্শন' বাঙালি অবাঙালি হিন্দু মুসলমান অসংখ্য বক্তার নাম দিয়েছে। দীর্ঘ তালিকা। তাতে বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা তো রয়েছেনই, ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী, সাংবাদিক এবং চিকিৎসকও। কাগজটি লিখছে 'মধ্যাহ্ন ২টার পূর্ব্বেই গড়ের মাঠ লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সভাভঙ্গ হয়।'

আইন তবু ঠেকানো গেল না। মার্চেই (১৮৯১) শুরু হল ভাইসরয়ের কাউন্সিলে বিল-এর দ্বিতীয় দফায় পর্যালোচনা। এবার রমেশচন্দ্র মিত্র অনুপস্থিত। তিনি অসুস্থ। অনুরাগীরা বললেন এটাও বিদ্রোহীর লক্ষণ। সন্দেহ নেই, রমেশচন্দ্র সেদিন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন বৃথাই প্রতিরোধের চেষ্টা, এ-বিল তাঁর পক্ষে ঠেকানো সম্ভব নয়। সুতরাং, বিতর্কে আর জড়িয়ে না-পড়াই শ্রেয়। তাঁর অনুপস্থিতির মধ্যেই আইনে পরিণত হল বহু বিতর্কিত বিল 'এজ অব কনসেন্ট'। সেদিন ১৯ মার্চ, ১৮৯১ সন। প্রবল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের মধ্যেই গৃহীত হল ঐতিহাসিক সহবাস সম্মতি আইন। বিয়ের নিম্নতম বয়স বেঁধে দিয়ে পরবর্তী আইন তথা বিখ্যাত সারদা আইন অনেক পরে, ১৯২৯ সনে। তার আগে পর্যন্ত এই সম্মতি আইনই ছিল কিশোরীর একমাত্র রক্ষাকবচ। সম্ভবত তার মা বাবারও। আইনে বলে দেওয়া হল বারো বছরের কম হলে মেয়েদের সঙ্গে সহবাস নিষিদ্ধ। নিজের বিবাহিত স্ত্রী হলেও সংসর্গ হবে অবৈধ, আইনবিরুদ্ধ। স্ত্রী ঋতুমতী ছিল কিনা এই আইনে সে-প্রশ্ন অবান্তর। আইন অমান্য করলে সংশোধিত ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী তার সাজা হবে। জেল, জরিমানা সবই হতে পারে এমনকি দ্বীপান্তর পর্যন্ত। একটি কাগজ (সুবোধিনী, মাঘ,

১২৯৭) লিখেছিল—'অতএব হে অপ্রাপ্ত দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাগণের স্বামীগণ তোমরা সাবধান হও, কি জানি, তোমাদের ন্যায় দম্পতি যুগলের প্রতি এক একজন পুলিশ কনেষ্টবল লইয়া শয়ন করিবার আজ্ঞাই বা প্রচার হয় !' ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ টিলক বললেন—দুরভিসন্ধিপরায়ণ বিদেশীরা প্রমাণ করলেন আমরা বর্বরের জাত । আর, তথাকথিত সংস্কারকরা নির্লজ্জের মতো সায় দিয়ে গেলেন তাঁদের । ছিঃ !

কলকাতায় তখন অন্য দশা । ধারা বিবরণী দিচ্ছে 'চিত্রদর্শন' :

'২রা চৈত্র রবিবার আর একদিন গিয়াছে ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুর পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন একা রমেশচন্দ্র । রমেশচন্দ্র পীড়িত হইলেন, বিল কিন্তু দ্বিগুণতর স্বাস্থ্য বাড়িতে লাগিল । ঠিক হইয়াই গেল আগামী বৃহস্পতিবার আইন পাস হইবে । এই সময়ে হিন্দুগণ কাতর হইয়া জগজ্জননী মঙ্গলময়ী কালীর আরাধনার জন্য কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন । সেদিন কালীঘাটে যেন সত্যযুগের আবির্ভাব । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কোথাও ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কোথাও তাঁহারা মধুর সামগানে প্রবৃত্ত, কোথাও মন্দির বেষ্টন করিয়া পণ্ডিতগণ চণ্ডীপাঠে নিরত, কোথাও হোম, কোথাও জপ, কোথাও রুদ্রপট, কোথাও দেবীস্তোত্র পাঠ ।...শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী মন্দির পূর্ণ হইতেছিল । 'জয় কালী' 'জয় শিব' 'হরি হরি বোল' শব্দে দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল । বহুসংখ্যক সংকীর্তন সম্প্রদায় জগন্মাতার মহিমা কীর্তন করিয়া আপনাদের ন্যায় সাধারণকেও ভাবে বিভোর করিয়া তুলিয়াছিল । এ দৃশ্য কি আর দেখিব !' সবই কিন্তু কিশোরীর জন্য । তাকে হারিয়ে সেদিন বাঙালি স্পষ্টতই উদ্ভ্রান্তের মতো । এ জীবনে বুঝি আর সত্যকারের কিশোরীর স্পর্শলাভ ঘটল না ! কালীঘাটের এই অনুষ্ঠানই সম্ভবত বাঙালির শেষ প্রকাশ্য কিশোরীভজনা । এ-বন্দনা, বলাবাহুল্য, রোদন ভরা । অমৃতলাল বসুর প্রহসন (সম্মতি সংকট) কিশোরী বধূ নাকি তখন গাইছে—

'মালাবারীর পীরিতে সব হরি হরি বল ।...
ভাল, ভাল, আমি ওলো দিব না সম্মতি ।
কভু না লইব শেষে বেআইনি পতি ॥
বয়স বারোর নীচে, সম্মতি আইন মিছে,
জ্বলুক হৃদয়ে বিছে, ফিরুক সে পিছে পিছে,
পাছু ফিরে আমি কভু যাব না চাব না ।
এগারোর বরাবর নেবো না নেবো না ॥'

এই মেয়েটিই বোধহয় উনিশ শতকের বাঙালি ঘরের 'লোলিতা', কেন না, বয়স যদিও তার বারোর নিচে তবু হৃদয়ে নাকি বিছের জ্বালা । বোঝা যায় জ্যৈষ্ঠের অনেক আগেই আম পেকে গেছে । কোনও কোনও ক্ষেত্রে তেমনটি যে দেখা যায়নি তা বোধ হয় হলপ করে বলা যাবে না । কেননা, মা মাসি, ঠাকুমা, দিদিমারা ছিলেন । ছিল পুতুল খেলা । রঙিন খেলনা বরেরা । ছিল রকমারি ব্রত পার্বণ । দশ পুতুল ব্রতের মুখস্ত করা কামনা—রামের মতো বর পাব, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাব, ইত্যাদি । তবু বলা নিষ্প্রয়োজন, শিশুরা শিশুই থেকে যেত । কিশোরীরা কিশোরী । অনুমান করতে অসুবিধা নেই, এই সব তর্ক বিতর্ক, আন্দোলন আলোড়ন সবই ছিল তাদের অগোচরে । কাকে বলে সম্মতি, কাকে অসম্মতি সেসব তাদের জানা থাকার কথা নয় । যাদের তখনও বিয়ে হয়নি তাদের তো নয়ই, যারা বরের ঘর করছে তাদেরও না । সেখানে ভয়ে ভয়ে মেয়েরা নিশ্চয় ততদিনে জেনে গেছে বিছানায় অন্তত কর্তার ইচ্ছাই কর্ম । সহবাস সম্মতি আইনে অতএব শিশু আর কিশোরীরা লক্ষ্য হলেও তাদের তরফে কোনও আগ্রহ হওয়ার কথা নয় । হয়তো মা ঠাকুমার মুখে শোনা অনেক কথার প্যাঁটরায় আরও কিছু যোগ হল এই যা । কল্পনার রহস্যলোক হয়তো

৩৫. আধুনিকা । রাতারাতি কেউই অর্জন করতে পারেননি এই সহজ ভঙ্গিটি ।

আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছিল। তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, সব কিছু আড়ি পেতে শুনেছিল এবং সবকিছু ঠিকঠাক বুঝেছিল এমন মেয়ে একটিও ছিল না এই বাংলা মুলুকে ! তাহলে অমৃতলাল বসু কোথায় পেলেন ওই পাকুনিকে। নাম ছিল তার রুক্মিণী। ইনিই বোধহয় একালে পশ্চিমে জন্মেছেন 'লোলিতা' নাম নিয়ে। নাকি নাম-এর— সরিতা ?

সরিতা নবকভ-এর 'লোলিতা'র মতো একালের আর একটি পশ্চিমী উপন্যাসের ( আন্ট জুলিয়া অ্যান্ড দি স্ক্রিপটরাইটার, মারিও ভার্গাস লোসা, ১৯৮২) একটি কিশোরী চরিত্র। নিরীহ কিশোরী। পবিত্র স্কুল বালিকা। সে তার বাবা মা'র সঙ্গে থাকে। হঠাৎ একদিন অঘটন। পাশে ফ্ল্যাটের এক যুবক সুযোগ পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সরিটার ওপর। তারপর জোর করে— । রেপ কেস। যুবকটিকে গ্রেফতার করা হল। মামলা উঠল আদালতে। দু'এক সাক্ষীকে নাড়াচাড়া করে মাননীয় বিচারপতি তলব করলেন অত্যাচারিত কিশোরীটিকে। নিষ্পাপ মুখ। সরিতা কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। ছোটখাটো মেয়েটি। পরনে স্কুলের মেয়েদের মতো ব্লাউজ স্কার্ট। মাথায় বিনুনি। কিন্তু তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি দেখবার মতো। সরিতা দাঁড়িয়েছে বুক চিতিয়ে, কাঁধ হেলিয়ে, দুপা ফাঁক করে এমন একটি ভঙ্গিতে যাতে তার একদিকের নিতম্ব ঢেউ তোলে ! শুধু তাই নয়, তার একটি হাত এমনভাবে কোমরে রাখা যেন সে এক মায়াবিনী, চিরকালের রঙ্গিনী নায়িকা। মাননীয় বিচারপতি ভেবে পান না, এ মেয়ে নাবালিকা না মহাকালের সমবয়সী।

তারপর শুরু হল সরিতার জবানবন্দি। কলকল, ছলছল। কথার অবিরাম স্রোত। প্রতি দু'ছত্র অন্তর অবলীলায় এমন বাক্য বলে যাচ্ছে সে, যা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। গোটা আদালত লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে। কেননা, কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছে সরিতা। দেখবার মতো অঙ্গভঙ্গি। মুখের সঙ্গে কথা বলছে তার হাত পা চোখ, সমস্ত শরীর। সুতরাং, তার কৌমার্য-হরণ উপাখ্যান যখন সবিস্তারে বলতে আরম্ভ করল সরিতা, তখন প্রবীণ বিচারককে বাধ্য হয়েই চেঁচিয়ে উঠতে হল—থাম ! থাম ! পাশে বসা সেক্রেটারি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন—'ইজ দ্যাট হোয়াট দি ইয়াংকিজ কল এ লোলিটা ?' 'আই অ্যাম সার্টেন অব ইট,—এ টিপিক্যাল লোলিতা ! সায় দিলেন বিচারক।—হ্যাঁ, একেই বলে লোলিটা !

নবকভ-এর নায়ক, 'এইচ-এইচ' বলছে : নয় থেকে চৌদ্দ একটি বিমুগ্ধ দ্বীপের সীমানা। আয়নার মতো বেলাভূমি। গোলাপী উপলখণ্ডরাজি। সে দ্বীপভূমি ছেয়ে আছে আমার পরীরা। দ্বীপের চারদিক ঘিরে বিশাল কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র। ওই সময় সীমার মধ্যেকার সব বালিকাই কি পরী ? অবশ্যই নয়। তাহলে তো আমরা যারা নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী, যারা বালিকাবিহারী, কবেই উন্মাদ হয়ে যেতাম। সুশ্রী চেহারা কোনও মানদণ্ড নয়, কিংবা অশ্লীল কোনও ভঙ্গি। পরীর চরিত্র লক্ষণ অন্যরকম। সে রহস্যময়ী। তার আকর্ষণ সূক্ষ্ম, গুপ্ত। লাবণ্য অধরা, চঞ্চল। সমবয়সীদের থেকে এসব কারণেই সে আলাদা। লোলিতারা স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র লোসার সরিতারাও। এবং সম্ভবত আমাদের রুক্মিণীরাও। অন্য জন্মে যারা লোলিতা আর সরিতার পূর্বদেশীয় বোন। সেই ধূ ধূ চৈত্রদিনে বাঙালি বাবুরা যখন মায়াময়ী কিশোরীকে খুইয়ে কালীঘাটে মাথা খুটছেন, কোনও কোনও সে রাত্রেই হয়তো বারো ছোঁয়নি এমন কোনও রুক্মিণী গুনগুন গাইছে নিধুর টপ্পা। পাঁচালীকার দাশরথী রায় কি বলেননি,—'যিনি মুখ খোলেন না কুলের বধূ তিনি সে রাত্রে গান টপ্পা-নিধু/ রসের ছড়ায় খই ফুটে যায় মুখে।' দাশরথী অবশ্য বলেছিলেন বাসর ঘরে 'লম্পটশীলে' 'ছুঁড়িদের' কথা। সেই বসন্ত রাত্রে তারা কীভাবে এই নতুন আইনকে বরণ করে নিচ্ছিল কে জানে ! তবে নিশ্চিত বলা যায় কন্যাদায়গ্রস্ত অগণিত বাবা মা সেদিন ওই গরমের রাত্রেও নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে ছিলেন। সেই সঙ্গে শিশু কন্যা এবং কিশোরীরাও। কেননা, আর 'বর্গি' এসে কেড়ে নেওয়ার ভয় নেই। ভয় নেই বরের। বারো পর্যন্ত সবাই নিশ্চিন্ত।

# পটের বিবি

"যদি চিত্রকর হইতাম, যদি এইখানে তুলি ধরিতে পারিতাম, যদি সে-বর্ণ ফলাইতে পারিতাম ; যদি সে কপাল তেমনই নিটোল করিয়া আঁকিতে পারিতাম, নিটোল অথচ বিস্তীর্ণ, মন্মথের রঙ্গভূমি-স্বরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম ; তাহার উপর তেমনই সুবঙ্কিম কেশের সীমারেখা দিতে পারিতাম ; সে রেখা তেমনই পরিষ্কার, তেমনই কপালের গোলাকৃতির অনুগামিনী করিয়া আকর্ণ টানিতে পারিতাম ; কর্ণের উপরে সে রেখা তেমনই করিয়া ঘুরাইয়া দিতে পারিতাম ; যদি তেমনই কালো রেশমের মতো কেশগুলি লিখিতে পারিতাম, কেশ মধ্যে তেমনই করিয়া কপাল হইতে সিঁথি কাটিয়া দিতে পারিতাম—তেমনই পরিষ্কার, তেমনই সূক্ষ্ম ; যদি তেমনই করিয়া কেশ রঞ্জিত করিয়া দিতে পারিতাম, যদি তেমনই করিয়া লোল বাঁধিয়া দিতে পারিতাম ; যদি সে অতি নিবিড় ভ্রূযুগ আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম···যদি সে নয়ন যুগলের বিস্তৃত আয়তন লিখিতে পারিতাম ;···তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ স্থূল তারা লিখিতে পারিতাম ; যদি সে গর্ববিস্ফারিত রন্ধ্রসমেত সুনাসা সে রসময় ওষ্ঠাধর, সে কবরীপৃষ্ঠ প্রস্তর শ্বেত গ্রীবা, সে কর্ণাভরণস্পর্শ প্রার্থী পীরবাংস, সে স্থূল কোমল রত্নালঙ্কারখচিত বাহু, অঙ্গুলিতে রত্নাঙ্গুরীয় হীনভাস হইয়াছে, সে অঙ্গুলি, সে পদ্মারক্ত, কোমল করপল্লব, সে মুক্তাহার-প্রভানিন্দী পীবরোন্নত বক্ষ : সে ঈষদ্দীর্ঘ বপুর মনোমোহন ভঙ্গী, যদি সকলই লিখিতে পারিতাম, তথাপি তুলি স্পর্শ করিতাম না ।···"

আয়েষার রূপ বর্ণনা করছেন বঙ্কিমচন্দ্র । তাঁর হাতে যেন কলম নয়, তুলি ! সামনে সাজানো রয়েছে রঙের পাত্র । নানা রঙ । স্থূল সূক্ষ্ম রকমারি তুলি । 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাঠকরা জানেন, আয়েষা পাঠান কন্যা । আর, তাঁর এই মুগ্ধ দর্শক আসলে একজন বাঙালি । জগৎসিংহ উপন্যাসের নায়ক । এ রূপতাপসের নাম—বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বাঙালি মেয়েদের রূপ ও বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র একই উপন্যাসের পাতায় । সেখানেও একই মেজাজ । কলম সেখানেও তুলির মতো । তাঁর তিলোত্তমার দিকে তাকানো যাক একবার ।

"তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাহার দেহায়তন প্রগলভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই । দেহায়তনে ও মুখবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল । সুগঠিত সুগোল ললাট, অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি-প্রশস্তও নহে, নিশীথ-কৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় শান্তভাবে প্রকাশক ; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড় বর্ণ কুঞ্চিতালক সকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংশে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে ; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে ; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড় বর্ণ, চিত্রকর লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার ; আরও এক সুতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত ।···তিলোত্তমার শরীর সুগঠন হইয়াও পূর্ণায়ত ছিল না ; বয়সের নবীনতা প্রযুক্তই হউক বা শরীরের স্বাভাবিক গঠনের জন্যই

৩৬. এ কোন আয়েষা ? উনিশ শতকের বাঙালিবাবুর স্বপ্ন-নায়িকা ।

হউক, এই সুন্দর দেহে ক্ষীণতা ব্যতীত স্থূলতাগুণ ছিল না। অথচ তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই সুগোল আর সুললিত।..."

সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র রূপসন্ধানী। নারীর রূপলাবণ্যকে তিনি খুঁটিয়ে দেখতে জানেন। জানেন দেখাতেও। নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছিলেন— "বাঙালীর মনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি জিনিস একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল—যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা ; আবার কতকগুলি জিনিস নূতন চক্ষে, নূতন ভাবে দেখিতে শিখিলাম—যেমন ঈশ্বর, নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক।" (বাঙালী জীবনে রমণী) এই উক্তি নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাঙালি জীবনে সেদিন সত্যই 'ভাব বিপ্লব।'

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙালির ধ্যানে সেদিন কী রূপ বাঙালি রমণীর ? তার আগের শতকেই বা কেমন দেখতে ছিলেন বাঙালি মেয়েরা ? বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসঙ্গ দর্শক নন। তাঁর আগে, পরে, এবং সমকালে অনেক বাঙালি শিল্পীই চিত্রিত করে গেছেন পটের বিবিদের। কেউ কলমে, কেউ তুলিতে। কেউ বা নরুণে আর ছেনিতে। যুগের রুচি ধরা পড়েছে কোথাও পটে, কোথায়ও ক্যানভাসে, কোথাও মন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির ফলকে। পাশাপাশি চলেছে কলমে রূপবন্দনা। রীতিমত দর্শনীয় সেই চিত্র প্রদর্শনী। ভাববার মতোও বটে !

তার আগে একবার তাকানো যাক আমাদের 'প্রাচীনা' সুন্দরীদের দিকে।

নব যুগের পটের বিবিদের পেছনে যে বিস্তীর্ণ পটভূমি, বলা বাহুল্য, সেখানেও রূপবতীদের মিছিল, রীতিমত আলেখ্য-লহরী। বাংলার কাব্য-সাহিত্য, রমণীরূপ বর্ণনায় মুখর। কি দেবী, কি মানবী,—নারীর রূপ কল্পনায় কবিরা প্রায় সকলেই ক্লান্তিহীন।

গোবিন্দদাসের রাধাকে মনে পড়ে ? এখনও অনেকেরই হয়তো কণ্ঠস্থ সে বর্ণনা।"—নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা।/ তাতে কাজের শোভিত নীলছটা ॥/ তিল পুষ্প সমান নাসা ললিতা।/ কনকাতি/ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥/ বনি সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী।/ মধুরাধর পল্লব বিম্ব লাগি ॥/ গলে মোতিহার সুরঙ্গমালা ॥/ কুচকাঞ্চন শ্রীফল তাহাতে খেলা।..." চণ্ডীদাসের রাধাও অপরিচিত নন।— "সই, কে বলে কুচযুগ বেল।/ সোনার গুলি, শুভয়ে ভালি।/ যুবক বধিতে শেল ॥/ আজানুলম্বিত, কবিবর শুণ্ডিত, কনকভুজ যে সাজে।/ হেরিয়া মদন, গেল সে সদন, মুখ না তুলিল লাজে ॥/ মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার, নিতম্ব বিমান চাক।/ চরণ কমলয়ে ভ্রমরা বুলয়ে, চৌদিকে বিড়য়া ঝাঁক।..."

এবার এক নজর দেখা যাক কৃত্তিবাসের সীতাকে। "—ঘন কেশপাশ যেমন চামর।/ পাকা বিম্বফল তুল্য ওষ্ঠাধর।/ মুষ্টিতে ধরিতে পারি তাঁহার কাকালি।/ হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্গুলি ॥/ পরমা সুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।/ শিরালে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা।..." ইত্যাদি। কাশীরাম দাসের দ্রৌপদী যেন তাঁরই বোন।— "পূর্ণ সুধাকর জিনি মনোহর,/ বিকচ কমল মুখ।/ গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,/ দেখি মুনি মজং-সুখ ॥/ নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,/ লাজে দোহে গেল বন।/ চারু ভ্রূ উন্নত, দেখিয়া মন্মথ/ নিন্দে নিজ শরাসন ॥/ প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূরব অরুণ ভালে।/ মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী/ সিন্দুর চিকুর জালে ॥/ ...উরোজ যুগল/ কোরক কোমল, তনু শোভা তাহে বাড়ে ॥/ কণ্ঠ দেখি কম্বু প্রবেশিল অম্বু,/ অগাধ-অম্বুরি মাঝে।/ নিন্দিত মৃণাল/ ভুজ দেখি ব্যাল/ প্রবেশিল বিলে লাজে ॥/ মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, মৃগরাজ পড়ি লাজে।... চারু যুগ্ম উরু/ বাম রম্ভা তরু/ নহে তার এক অংশ ॥/ অতি সুকোমল/ শরীর অমল/কমলে গঠিত কায়।/...ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩৭. সেতারবাদিনী। কালীঘাটের পটের স্বপ্ন-সুন্দরী।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রমণী ওঁরা। হয়তো তাঁরা পৌরাণিক নায়িকা। কিন্তু মেনে নেওয়া ভাল এক অর্থে সকলেই কালের প্রতিমা। শতকের পর শতকের পরেও কিন্তু বাঙালি কবির চোখে মোটামুটি অপরিবর্তিত নায়িকার রূপ। যথা : চণ্ডীমঙ্গলের খুলনা "—রূপে শুক্রধনুবর নয়ান তাহার শর/ রহে রবি শশী তার কোলে।/ গলে সাতনরি হার শোভে নানা অলঙ্কার/ করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা/কুচ দাড়িম্বের ফল মাঝা মৃগরাজ তুল/উরুযুগ জিনি রাম কলা।/ গুরুয়া নিতম্ব ভরে নানারূপ বেশ ধরে/চলে রাজহংসের গমনে/ চরণে মঞ্জীর বাজে স্বর্গ বিদ্যাধরী সাজে/ যৌবন বাড়য়ে দিনে দিনে।..." পদ্মপুরাণের বেহুলাও দেখতে যেন খুলনার মতোই। "—চন্দ্রমুখী খঞ্জন নয়নী কলাবতী/অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি॥/ শ্রবণে কুণ্ডল তার খোপায় বকুল/ বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল ॥/ দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।/ কোদণ্ড জিনিয়া যেন ভ্রূযুগ সন্ধান।..."

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই দুই বঙ্গসুন্দরী তখনও পূর্ণ প্রস্ফুটিত নন, মুকুলিত মাত্র। অচিরে তাঁরা যে দ্রৌপদী বা রাধার সঙ্গে পাল্লা দেবেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা কি কোনও অংশে তাঁদের চেয়ে হীন বা ক্ষীণ ? মোটেই নয়। "—কুচ হৈতে কত উচ গিরিচূড়া ধরে।/ শিহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে/ নাভি কূপে যা ইতে কাম কুচ শম্ভু বলে।... কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়/ দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥/ মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।/ অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।..."

বিদ্যার রূপ বর্ণনা নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি বাবুদের মধ্যে একবার এক পশলা বিতর্ক হয়েছিল। একদিকে ছিলেন কৈলাসচন্দ্র বসু, অন্যদিকে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের বক্তব্য শুনলেই বোঝা যাবে তর্কের উপলক্ষ কী ছিল। তিনি লিখছেন—"...শারদ পার্বণ, শীধু ধরানন, পঙ্কজকানন মোদিনী। কুরঙ্গগামিণী, কুঞ্জবিলাসিনী, লোচন খঞ্জন-গঞ্জিনী ॥ কোকিলনাদিনী, গীতপরিবাদিনী, হ্রীপরিবাদ বিধায়িনী। ভারত মানস, মানস সারস, রাসবিনোদবিনোদিনী"—কৈলাসবাবু এই কতিপয় পংক্তির দোষ ধরিবেন, যদি ধরিতে পারেন, তবে আমি ইংরাজ কবির অধিক দোষ দেখাইয়া দিব।" তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রঙ্গলাল যেসব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল তার মধ্যে কিছু ছিল বাইবেলের "সলোমন অর্থাৎ যাহাকে মুসলমানেরা সুলেমান কহে সেই মহাপুরুষের টপ্পা গীতাবলীর" অনুবাদ। রঙ্গলালের ভাষায়—"হে রাজকন্যে, তোমার চরণ পাদুকাদ্বারা কিবা শোভা পাইতেছে! তোমার কটি মণ্ডল নিপুণ কর্মকার দ্বারা নির্মিত মন্দিরময় হারস্বরূপ। এবং তোমার নাভিদেশ মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ এক গোল পাত্রের ন্যায়, এবং তোমার উদর শোশনপুষ্পবেষ্টিত গোধূমরাশির ন্যায়। এবং তোমার স্তনদ্বয় যুগলহরিণ বৎসের ন্যায়। এবং তোমার গলদেশ হস্তিদন্তময় উচ্চগৃহের ন্যায়।...হে প্রিয়ে, তুমি প্রেমদ্বারা সন্তোষ দিবার জন্যে কেমন সুন্দরী ও মনোহারিণী। তোমার দীর্ঘতা তালবৃক্ষের ন্যায় ও তোমার স্তন তাহার ফলস্বরূপ। আমি কহিলাম, আমি তাল বৃক্ষে আরোহণ করিব।" ইত্যাদি। (বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ)

কয়েকটি অনুচ্ছেদ অনুবাদের পর রঙ্গলালের মন্তব্য : 'এ পর্যন্তই ভাল, আর কাজ নাই।' তাঁর বাঙালি শ্রোতা তথা পাঠকরাও নিশ্চয় সেদিন (১৮৫২) সায় দিয়েছিলেন, হ্যাঁ বিদ্যার সত্যই তুলনা নেই।

লক্ষণীয় তৎকালের 'বাঙালি সুন্দরী'রা প্রায় সবাই সংস্কৃত কবিদের নায়িকার আদলে রচিত। বৈষ্ণব পদাবলীর কথা বাদই দেওয়া গেল। নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাইয়ের মতে 'কামগন্ধ নাহি তায়' এই শব্দ কয়টি বাদ দিলে সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য যে কামাত্মক বলিয়া মনে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।' তিনি মনে করেন সংস্কৃত সাহিত্যের কাম উঁচু স্তরের। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ঠিক তা বলা যায় না। সেখানে নরনারীর যে চিত্র, চৌধুরী মশাইয়ের সিদ্ধান্ত, সেগুলো "সংস্কৃত সাহিত্যেরই কম বা বেশি ইতরীকৃত রূপ।" শুধু সংস্কৃত পদকর্তাদের রচনাতেই নয়, বলতে গেলে সব বাঙালি কবিই তৎকালে সংস্কৃত কাব্যের আবেশে আচ্ছন্ন।

কৃত্তিবাস বা কাশীরাম দাসের রচনায় নিশ্চয়ই স্বাতন্ত্র্য এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট রয়েছে। কিন্তু সে বিশিষ্টতা বোধহয় রমণীর রূপ বর্ণনায় নয়।

কৃত্তিবাসের সীতাকে আমরা এক নজর দেখেছি। বাল্মিকী রামায়ণে রাবণের চোখে সীতা কি অন্য কোনও রমণী ?— "তোমার দশনরাজি সমান সুগঠিত চিক্কণ ও শুভ্র। নেত্র নির্মল ও আয়ত, অপাঙ্গ রক্তাভ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ। নিতম্ব বিশাল ও স্থূল, উরুদ্বয় হস্তিশুণ্ডের ন্যায়। তোমার ওই উচ্চ বর্তুল দৃঢ় ও লোভজনক স্তনদ্বয় মণিময় আভরণে ভূষিত।..." সীতার বয়স নাকি তখন আটাশ। রামের পঁয়ত্রিশ। রামচন্দ্রের চোখে সীতা তখন কেমন কে জানে। রাবণ, বলাই বাহুল্য, পরস্ত্রীকে দেখছেন। ব্যাসদেবের দ্রৌপদীও কিন্তু মোটামুটি কাশীরাম দাসের দ্রৌপদীর মতোই— "সুদর্শনা, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুঞ্চিতকেশী, পীনপয়োধরা।" বাংলা কাব্যসাহিত্যে অতএব ষোল আনা বঙ্গ সুন্দরী খুঁজে মরা বৃথা।

অন্যরা কি তাদের দর্শন পেয়েছিলেন ? অন্য অঞ্চলের রসিকরা ? মনে হয় তাঁদের অভিজ্ঞতার দৌড়ও বেশিদূর নয়। বাৎসায়নের রচনায় গৌড়ীয় নারীদের চারিত্র্য বর্ণনা বিস্তারিত, রূপবর্ণনা ঠিক সেভাবে নেই। কামসূত্রে দেখি গৌড়ীয় যুবক যুবতীরা নির্লজ্জের মতো কামাচারী। এমনকি রাজ অন্তঃপুরের মেয়েরা পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও দাসদের সঙ্গে কাম ষড়যন্ত্রে মগ্ন। তবে অন্য প্রসঙ্গে কিছু প্রশংসা বাক্যও রয়েছে গৌড় বঙ্গের ললনাদের জন্য। বাৎসায়ন বলছেন—"সেই দেশসম্ভূত কামিনীরা কোমলভাষিণী, অনুরাগবতী ও কোমল কলেবরা। ইহারা মধ্যম বেগা।...ইহারা নিজ অঙ্গের দোষ ঢাকিতে এবং পরাঙ্গের দোষ দেখিয়া উপহাস করিতে বড়ই পটু। ইহারা রূপে ও ব্যবহারে কুৎসিৎ এবং অশ্লীল ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগকারীকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে না বা অশ্লীল ও নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে ভালবাসে না। আর অতীব লজ্জাশীলা।" ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে বাঙালি মেয়েদের কথা : তাদের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, বেণীর শেষাংশ শিখার মতো মুক্ত। ইত্যাদি।

এই সব বিচ্ছিন্ন উক্তি থেকেই বোঝা যায় রূপের হাটে বাঙালি মেয়েদের খ্যাতি ছিল। তা না হলে পরবর্তীকালে দূর কাশ্মীরে রাজতরঙ্গিনীর পাতায় কেন ঠাঁই পাবে বাঙালি দেবদাসী কমলা ? বাৎসায়ন এবং ভরতমুনি খ্রীস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতকের। রাজতরঙ্গিনী অষ্টম শতকের। পরবর্তীকালে মালব এলাকায় পাওয়া একটি শিলালেখেও রয়েছে গৌড়ীয় সুন্দরীর প্রশস্তি। এটি নাকি খোদাই করা হয়েছিল খ্রীস্টীয় হাজার অব্দ নাগাদ। কিছুকাল আগে সুকুমার সেন মশাই তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন (একটি বিচিত্র শিলালেখ। আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৭৪)। তা থেকে সেদিনের বাঙালি রমণীর সঠিক রূপ রচনা বোধহয় দুঃসাধ্য। তবু কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা : "তেড়া-বাঁধা কেশ যা সুন্দর—/ খোঁপার উপরে খোপনা কেমন ? রাহুর ত্রাসে রবি যেমন। ...রূপস ভুরু কেমন ?/ সে যেন কামের ধনু আড় করা।... পাতলা শাড়ির মধ্যে স্তনভর কেমন ? শরৎ মেঘের অন্তরে চাঁদ যেমন। /সুতলি হার রোমাবলিতে পড়েছে/ যেন গঙ্গা থেকে জল যমুনায় মিলেছে।..." ইত্যাদি।

শতকের পর শতক ধরে একই রূপ কথা। সদুক্তিকর্ণামৃতে বাঙালি মেয়ের রূপ বিবৃত করছেন অজানা কবি— "দেহে সূক্ষ্ম বসন, বাহুতে সোনার তাগা, মাথার উপরে গন্ধতৈল-সিক্ত, কেশজাল মসৃণ করে আঁচড়ানো এবং চূড়ার মত খোঁপা বাঁধা, তাতে ফুলের মালা জড়ানো, কানে নূতন চন্দ্রলেখার মত নির্মল কচি তালপাতার দুল—বঙ্গ বারাঙ্গনাদের এই বেশ কার না মন হরণ করে ?" (অনুবাদ—সুকুমার সেন)।

কাব্যে বর্ণিত এইসব রূপসীদের অধিকাংশই সামান্যা রমণী। ধোয়ীর পবনদূতেও এই বারবিলাসিনীদেরই বন্দনা। অন্য অঞ্চলের কবিরা প্রায় সকলেই ব্যস্ত বাঙালি মেয়েদের সাজসজ্জার বিবরণ দিতে। সেখানে আবরণ আর আভরণে চাপা পড়ে আছেন বঙ্গীয় সুন্দরী। দৈবাৎ যদি বা কখনও তাঁরা উর্বশীর মতো

দিগবসনা হয়ে সামনে দাঁড়ান তাহলে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যাবে কালিদাসের পার্বতী কিংবা যক্ষপ্রিয়ার কথা। সেই—'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা চকিত-নয়না প্রেক্ষণা নিম্ননাভি :।/ শ্রোণীভারা-দলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং॥' ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভারত-সুন্দরীদের সঙ্গে বঙ্গ-সুন্দরীর পার্থক্য যৎসামান্য। খুব মনোযোগী দর্শক হয়তো তৎকালের বাঙালি রূপসীদের মধ্যেও রকমফের খুঁজে পাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকেও স্বীকার করতে হবে তিনি বাৎসায়নের সেই বন্ধনীতেই ঘুরপাক খেয়েছেন। আর সব ভারত-সুন্দরীর মতো বাঙালি রূপসীও হয় পদ্মিনী অর্থাৎ, মুখ পদ্মের মতো, চোখ হরিণের মতো, নাক খাঁড়ার মতো, নাভির কাছে ত্রিবলী, এবং গজেন্দ্রগামিনী, না হয় চিত্রিণী (প্রমাণ শরীর, সর্ব কর্মে স্থির, নাভি সুগভীর, মৃদুহাসিনী/ সুকঠিন স্তন, চিকুর চিক্কণ, শয়ন ভোজন মধ্যচারিণী।), কিংবা শঙ্খিনী (দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন, দীঘল চরণ, দীঘল পাণি।...) অথবা 'স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর, স্থূল পদকা, ঘোরনাদিনী।' তবে বাঙালির বিশেষ ঝোঁক যেন পদ্মিনীর দিকেই—'নয়ন কমল,...কুঞ্চিত কুণ্ডল, ঘন কুচস্থল, মৃদুহাসিনী।'

প্রাচীন বাঙালির, বিশেষত উচ্চ কোটির নর-নারীর বিলাস-ব্যসন এবং জীবনাচার সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্য—"খ্রীস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতক হইতেই বাঙ্গালা দেশ স্বল্পাংশে হইলেও উত্তর ভারতীয় সদাগরী ধনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং উত্তর ভারতের নাগর-সভ্যতার স্পর্শও তাহার অঙ্গে লাগিয়া ছিল ; বাৎসায়নের নাগরাদর্শ বাঙলার নাগর-সমাজেরও আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল।" (বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব)

অষ্টাদশ শতকেও অতএব ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনায় বাৎসায়নীয়। অথবা, সংস্কৃত কাব্যের মায়ালোকে। বাঙালি কবিদের কারবার তখনও প্রধানত কল্পসুন্দরীদের নিয়েই। 'অর্ধেক কল্পনা তুমি, অর্ধেক মানবী',—এমন কথা বলারও বুঝি তখনও সময় হয়নি!

এই পটভূমিতেই ক্রমে উনিশ শতক। বহুকথিত ভাব-বিপ্লব। বাঙালির রূপ-দর্শনের ধারাবাহিকতায় কি সেদিন পূর্ণচ্ছেদ ? অবশ্যই নয়। তবে পরিবর্তনের লক্ষণ সুস্পষ্ট। আবার মনে পড়ছে বঙ্কিমচন্দ্রকে। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় উনিশ শতকে বাঙালি জীবনে যে রোমান্টিক প্রেমের উন্মেষ তার 'প্রবর্তন কর্তা' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা অবশ্যই অন্য রকম। যথা : 'রজনী'র অমরনাথ।

"সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া, ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্যদ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে-চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; এবং এ সকল চিত্রও সম্পূর্ণ নহে। ডেসডিমনার চিত্র দেখাইয়া কহিলেন, আপনি এই চিত্রে ধৈর্য, মাধুর্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্যের সহিত সে সাহস কই ? নম্রতার সঙ্গে সতীত্বের অহঙ্কার কই ? জুলিয়েটের মূর্তি দেখাইয়া কহিলেন, এ নব যুবতীর মূর্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নব যৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কই ?" এখানেই শেষ নয়। "অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল।"

লক্ষণীয় নবযুগের বাঙালি অন্য ধরনের পটের বিবিদের দিকেও তাকাচ্ছেন। রসগ্রাহীর মতো তাদের রূপ বিচার করছেন। কিন্তু তখনও সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকাদের বিদায় দিতে পারছেন না। 'বিষবৃক্ষে'ও সেই মানসিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন চিত্রশিল্পীর সাধ্য সীমাবদ্ধ। চিত্র রচনায় শব্দ এবং বাক্যের যে শক্তি রঙ তুলির তা নেই। তবু বার বার তিনি কলম হাতে চিত্রকর হতে চান। চিত্রিত আলেখ্য-দর্শনেও যে তাঁর

৩৮. অধরা পশ্চিমী রূপসীরা ধরা দিয়েছিল সেদিন মর্মর দেহে।

বিশেষ প্রবণতা সে কথাও গোপন নেই। সূর্যমুখী শোবার ঘরে নগেন্দ্র পটের বিবিদের দেখছেন :

"কক্ষ প্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত ; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর একপাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়েকখানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরাজের শিষ্য ; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বত হইতে শিখরে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠাহেমবেত্র—মুখে অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।..." ইত্যাদি।

একের পর এক ছবি। রাম-সীতা। সুভদ্রা ও অর্জুন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা। অভিমন্যু উত্তরা। অর্থাৎ, চিরপরিচিত সেই যুগলেরা। ছবির বিষয়বস্তুর জন্য নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্ধৃতিগুলো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে অন্য কারণে। প্রথমত, উনিশ শতকের বাঙালি যুবক, সেক্সপীয়ার-গ্যালারির পাতা উল্টে চিত্রের রূপ-রস বিচার করতে ইতস্তত করছেন না। দ্বিতীয়ত, শোনা গেল দেশীয় চিত্রকর বিদেশী গুরুর কাছে শিক্ষা নিচ্ছেন। এবং তৃতীয়ত, দেখা গেল বাঙালিবাবুর গৃহসজ্জার অন্যতম উপাচার ফ্রেম করা ছবি। তাঁর শোয়ার ঘরের দেওয়ালেও চাই—পটের বিবি।

কিন্তু কার পট ? কেমন বিবি ? সূর্যমুখীর তথা নগেন্দ্রের ঘর দেখা গেল। এবার অন্য কোথাও উঁকি দেওয়া যাক। উনিশ শতকের বাঙালিবাবুর যৌবনের উপবন তাঁর বাগানবাড়ি। একটি প্রহসন থেকে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

"ইহার সম্মুখে লোহার রেলিং—তার মধ্যে বাগওয়ালা মোটা মোটা দুই থামেতে লোহার গেট ঝুলচে। এখান থেকে রাঙ্গা কস্তাপাড়ের মতন কাঁকরের রাস্তা দৌড়েছে—তাহার দুই পার্শ্বে রজনীগন্ধা শোভা কচ্চে—মধ্যে মধ্যে বাখারীর তৈয়ারি ধনুকাকার মেরাপের উপরে মালতী মাধবী প্রভৃতি নানা জাতি লতাগাছ হামাগুড়ি দেছে—তার নীচে দিয়ে ছোটছোট রকমের গ্র্যাভেল-ওয়াক ছুটেচে—ইহাদের দুই দিকে গোল করা মেদি পাতার বেড়ার ভিতরে গোলাপ, জুঁই, মতিয়া, বেল প্রভৃতি দেশী, আর কত জাতি ফরাসি ও বিলাতি ফুলগাছ কতক বা টবের উপর কতক বা মাটিতে থাকিয়া বাগানের শোভা বৃদ্ধি কচ্চে।...উদ্যানের মধ্যস্থলে অতি পরিপাটি এক বৈঠকখানা—ইহার মধ্যে এক লম্বা হল—তার দুই পার্শ্বে দুটি করে চারটি কামরা—সম্মুখে ও অপরদিকে কোরীনথিয়েম ফর্মের থামে ডেড-ভিনিসন আঁটা বারাণ্ডা—তার নীচে বেলে পাথর বসান ফ্লোরওয়ালা সিঁড়ি। উক্ত হলের ও তার পার্শ্বের ঘরের ভিতরে ইংরেজদের কপি করবার মতন যে ইটালিয়ান মারবেলের মেজওয়াইড বোর্ড, চেয়ার, ভিকটোরিয়া, সোফা, ঝাড়, দেওয়ালগিরি, মুনিমনমোহিনী উলঙ্গিনী কামিনীগণের ছবি, কত রঙ্গের গেলাস কেস্ চাপা পুতুল ও রং বেরং কাচের ফুলদান যথাস্থানেই সাজান হয়েছে। এই মনোহর উপবন আমাদের জয়হরিবাবুর।" (কাকভুষুণ্ডীর কাহিনী, ১৮৬৫)

বাবুর চিত্র-রুচি কোন দিকে সে কথা গোপন নেই। তাঁর চাই 'মুনিমনমোহিনী উলঙ্গিনী কামিনীগণের ছবি।' এবার আর একটি বাগান বাড়িতে।

"আজ বাগানের কি বা শোভা ! দেশ বিদেশী ফুলগাছের কেয়ারি কিবা চিত্তরঞ্জক ! কুসুমগুলি শ্বেত নীত

**৩৯. পশ্চিমের রূপপ্রতিমা অনূদিত বাঙালি রূপসীতে। শিল্পী : হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার।**

নীল পাটল লোহিত হরিৎ হিঙ্গুলী বেগুণী সিন্দুরী অঙ্গরা যথাস্থানে স্তবকে স্তবকে মেখে সেজেগুজে আপনাপন অঙ্গের বাহার দিচ্চে,—কেউ কেউ প্রিয়-সমীরণ-সহায়তায় সৌরভ বিস্তার কচ্চে । অদ্ভুত অর্কিড তরুর থলো থলো ফুল, চিনের ঘাস, পুষ্পবতী লতাবটিকা—পুষ্করণীতে পদ্মের দল, সবজে সিঁদুরে সোনালী মাছভরা শিল্পরচিত হাঁসের ফোয়ারা, —প্রতিমূর্তি, পরী,—কৃত্রিম বনস্থলী··· । বৈঠকখানায় বিখ্যাত ইংরেজ মোগল বাদশা ও বাঙালির চেহারার বড় বড় গিলটিকরা তসবির—রেফেল্, রেনল্ড, টরনরের আশ্চর্য্য চিত্রপট,—বৃহৎ বৃহৎ গিলটিকরা আয়না,—হরেক রকম এনগ্রেভিং ।···" (সচিত্র গুলজার নগর, ১৮৭১)

শিল্পীদের নামগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই । বোঝা গেল, ইনিও বিদেশীর ভক্ত । না কি বিদেশিনীর ? তাঁর বাগানে পরী । ঘরের দেওয়ালেও নিশ্চয়ই কেবলই নিসর্গ-দৃশ্য নয় । তাছাড়া 'এনগ্রেভিং'গুলো উহ্য রয়ে গেছে । সুতরাং, অন্য এক বাবুর ঘরে আর একটু বিস্তারিত দেখে নেওয়া ভাল ।

"দেয়াল ঢাকিয়া ছবি মারিয়াছি, বিচিত্র দৃশ্য গঠন ভাব গায়ে গায়ে পরস্পরের ছায়া আলোকে সম্যক ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

সরসীতীরে শ্যাম তরুচ্ছায়ে তৃণশয্যোপরি সুখসুপ্তা রমণী, শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া নগ্ন বক্ষ এবং বাহুর উপরে শ্রান্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে । আলুথালু বসনপ্রান্তে, অৰ্দ্ধ-অনাবৃত, চারু যৌবন চন্দ্রালোকে মৃদুচঞ্চল । কোমল পদতলে রজতধৌত শ্যাম শিলাখণ্ডের উপরে রক্ষিত ।···

ইহারই পার্শ্বে তিনটি ভগিনীর চিত্র—তিনটি পাশ্চাত্য রূপসী । গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির মত গঠন, কুঁদিয়া নির্মাণ করা, নাসিকা সূক্ষ্ম সরল, অধর পরিপূর্ণ । নীল নয়নে উজ্জ্বল চাঞ্চল্য এবং সরলতা ।···

অন্যত্র বিচিত্র গার্হস্থদৃশ্য । নবীন যৌবন নব প্রণয়িনীর সহিত গোপন প্রেমালাপে রত ।···

দেয়ালের এক প্রান্তে একটি জাপানী ছবি—জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত জাপানী রমণী । অন্যান্য ছবিগুলির সহিত ইহার আঁকিবার ধরনে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে । ছায়া আলোকের খেলা তেমন নাই । সূক্ষ্ম রেখায় দুটি কৃষ্ণ ভ্রূ । একটি ভ্রূপ্রান্ত হইতে রেখা নামিয়া আসিয়া নাসিকা । সূক্ষ্ম কৃষ্ণ একটি রেখার নীচে লাল ফোঁটা দিয়া অধর ।···

এদিক ওদিক অনেকগুলি ফরাসী ছবি—আবক্ষ সুন্দরী, বিবসনা যুবতী, নগ্ন যৌবন । গঠন এবং বিলাসই অধিকাংশ স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে । যৌবন আপনাকে কোথাও সঙ্কুচিত করে নাই, প্রতি অঙ্গ যেমন করিয়া বিস্তার করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ব্যক্ত, তেমনই করিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে ।

নগ্নতাই যে সর্ব্বত্র বিলাসের কারণ, তাহা নহে । এক একটি নগ্ন প্রতিমূর্তি হাবভাবচেষ্টাহীন সরল সম্ভ্রমে অটল দাঁড়াইয়া । পার্শ্বে হয়ত সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র বসনে ঢাকিয়া নয়নের কোণে অধরপ্রান্তে বিলাস মৃদু মৃদু হাসিতেছে । অদূরে শিথিলবসনা সুন্দরী পূর্ণবিকশিত তনু ঢাকিবার ছলে যৌবনসমৃদ্ধ সুগোল গঠন ব্যক্ত করিতেছেন ।···"

স্বভাবতই বাঙালিবাবু অভিভূত । তিনি লিখছেন—"এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি । বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে । আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই ।" (দেয়ালের ছবি, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাধনা, ১২৯৮)

বলতে গেলে এইসব বিদেশিনী রূপবতীদের নিয়েই ছিল উনিশ শতকের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ধনী বাঙালির ছবির-জগৎ । এখনও কলকাতা বা আশেপাশের পুরানো প্রাসাদগুলোতে উঁকি দিলে দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা মেলে তাদের । হয়তো কোনও বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা ছবির নকল । ক্বচিৎ কখনও অখ্যাতের অরিজিনাল । তাছাড়া সেই সব 'এনগ্রেভিং' । অর্থাৎ, মুদ্রিত বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীগণ ।

৪০. বাবুবিলাসের স্মারক রাজস্থানী কাম-দীপিকা । হয়তো বা একদিন শোভা পেত বাগানবাড়ির দেওয়ালে ।
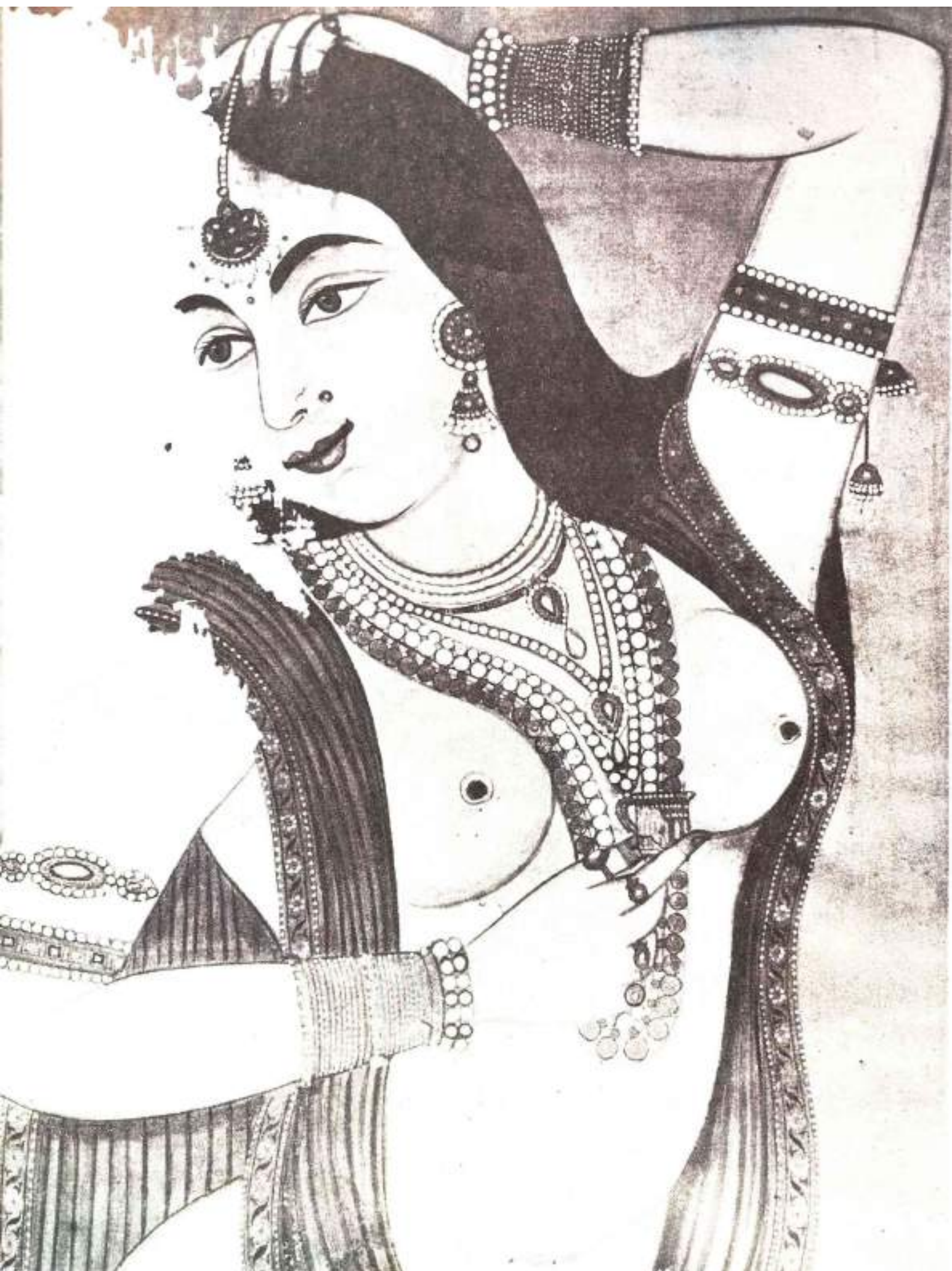
রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পের সুরবালাকে মনে আছে ? তার "শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশে বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্তির বাঁধানো এনগ্রেভিং টাঙানো ; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্তী বৃহৎ আয়নার উপর ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে তাহা দেওয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা ন্যূন নহে। গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গের চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে।" (১৮৯৮)

বাঙালিবাবুদের দেওয়ালে তবু সুরবালাদের ঠাঁই নেই, সেখানে ভিড় করে আছে বিবসনা নীলনয়না বিদেশিনীরা !

তাই বলে কি বাঙালির নিজস্ব কোনও রূপের অমরাবতী ছিল না ? অবশ্যই ছিল ছিল কম বেশি সব যুগেই। অষ্টাদশ-উনিশ শতকই বা ব্যতিক্রম হবে কেন ? পালযুগে চিত্রিত পুথি ছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে ছিলেন পটুয়ারা। উনিশ শতকের কলকাতায় ফুটে উঠল কালীঘাটের পট। ক্রমে বটতলার কাঠখোদাই, আর্ট স্টুডিও চোরবাগান আর কাঁসারি পাড়ার রঙিন লিথোগ্রাফ। বাঙালির পাহাড়পুর, ময়নামতি ছিল খ্রীস্টীয় অষ্টম শতক বা তার কিছু আগে পরে। অষ্টাদশ শতক উনিশ শতকেও এখানে ওখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল নানা ধরনের অসংখ্য মন্দির। দেওয়ালে পাহাড়পুরের মতোই বিচিত্র শিল্পবৈভব। অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক। তাছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণিত বিলাতী চিত্রকরের কাছে শেখা বিদ্যার প্রয়োগ—ক্যানভাসে তেলরঙে কখনও দুষ্মন্ত শকুন্তলা, কখনও নৌকো বিলাস, কখনও জগদ্ধাত্রী কিংবা অন্নপূর্ণা। দেবী এবং মানবী মিলিয়ে অনেক প্রতিমা। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।' সবই অতএব দর্শনীয়।

প্রথমে মন্দির টেরাকোটায় উৎকীর্ণ নারীদের এক নজর দেখা যাক। পাহাড়পুরের পোড়া মাটির ফলকগুলো সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন— "সমসাময়িক জীবনের কোনো বস্তুই এই মৃৎশিল্পীদের নজর এড়ায় নাই। রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকথার নানা গল্প, পঞ্চতন্ত্র ও বৃহৎকথার নানা কাহিনী যেমন এই ফলকগুলিতে দৃষ্টিগোচর, তেমনই দৃষ্টিগোচর প্রত্যন্ত বাঙলার নানা আদিবাসী নরনারীর নানা দেহরূপ, নানা অভ্যাস, নানা সংস্কারের চিত্র।...নানা ভঙ্গীমায় জননী ও শিশু ; কুস্তিকরসত ও নানা শারীর ক্রীড়ারত মল্লবীর ; যষ্ঠীধৃতদ্বারপাল ; কূপে জলাহরণরতা ও জলপাত্রবাহিনী নারী ; গৃহে প্রবেশরতা নারী...মৎস্যবাহিনী ও মৎস্যকর্তনরতা নারী ; নৃত্যপরা ও সঙ্গীতরতা নারী।..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ফলক সম্পর্কে নীহাররঞ্জনের মন্তব্য "এই ফলকগুলির গড়নে মার্জিত স্পর্শের, সূক্ষ্ম রুচির বা গভীর ব্যঞ্জনার পরিচয় সামান্যই ; কিন্তু লক্ষণীয় ইহাদের সাবলীল গতিছন্দ, ইহাদের স্বচ্ছন্দ প্রাণময়তা, জীব ও মানবদেহের গঠন, ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন দৃষ্টি, জড়জগতের এবং দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষবোধ।"

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক—চারশ' বছর ব্যাপী বাঙালির শিল্পসাধনা পর্যালোচনা করে 'বাঙালীর ইতিহাস' লেখক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন :

"প্রথম পর্বে দেহের সহজ সরস কমনীয়তা এবং ভঙ্গী, বিরল সাজসজ্জা, অলঙ্কার ও আড়ম্বর। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক কমনীয়তা ও ভঙ্গী অস্থির ও চঞ্চল হইতে আরম্ভ করে, সাজসজ্জা ও অলঙ্করণ ক্রমশ বাহুল্যমণ্ডিত হইতে থাকে। সরল ও প্রশান্ত দেহভঙ্গী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ চঞ্চল ও লাস্যময় দেহভঙ্গীতে রূপান্তর দৃঢ় সরল রেখায় অগ্রসরমান। পরিণামে মাত্রাহীন আতিশয্য সমস্ত শিল্পাদর্শকে অবশ্য নির্জীব মদিরতায়, পল্লবিত অলঙ্কারাড়ম্বরে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সমসাময়িক সাহিত্যে কামনাবাসনার আতিশয্য, উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বাক্য ও ব্যঞ্জনাবিহীন লাস্যভঙ্গী সমসাময়িক শিল্পেরই প্রতিরূপ

৪১. সহজ-সুন্দরী। মুর্শিদাবাদের শত রূপবতীর একজন।

এবং দুই-ই ধ্বংসোন্মুখ ক্ষীয়মাণ সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ঘোষণা ।" (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব)

বাংলার মন্দির এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য আবার পুরানো গৌরব ফিরে পায় মুসলমান আমলের শেষ দিকে । সে-ধারা প্রসারিত ইংরাজ আমলেও বলতে গেলে একেবারে উনিশশতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত । একজন শিল্প-ঐতিহাসিক লিখছেন—"এই যুগের মন্দির প্রাচীরে খচিত চিত্রফলকগুলিকে পাহাড়পুর, মহাস্থান, সাভার ও ময়নামতির মৃৎফলকের উত্তরাধিকার কালোপযোগী পরিণতি লাভ করেছিল । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে (মন্দিরের) আকৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি মন্দির প্রাচীর সংলগ্ন ফলকগুলিতেও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে ।" তাঁর মতে—"সমাজ চিত্র হিসাবেও এই মন্দির প্রাচীরের অনেক ছবিকেই বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে গণ্য করা প্রয়োজন । নরনারীর দেহগঠনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, অলঙ্কারে, গৃহের আকৃতিতে ও অভ্যন্তর সম্ভার তৈজসপত্রের আসবাবে আবরণে, পাল্কি, গাড়ী, নৌকো ইত্যাদি যানবাহনে, বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি হাতিয়ারে মুসলমান যুগের, বিশেষ করে এই যুগের শেষভাগের একটা অপূর্ব নিখুঁত ছবি এই চিত্রগুলি থেকে গড়ে তোলা যায় । এই ছবিগুলিতে যেন সেই নবাব বাদশারা রাজসভা, তাঁদের আশ্রিত জমিদার মনসবদার, সিপাইসান্ত্রী, পাইকবরকন্দাজ, ফরাদমশালচি, হারেমের মণিরত্নসমালঙ্কৃত বেগম ও তাঁদের বাঁদী ইত্যাদি নিয়ে একটা বিচিত্র সমাজ, একটা বিচিত্র জীবন প্রণালী, একটা চলমান ছন্দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে যে জীবন এই বাংলারই ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, রেখে গিয়েছে তাদের পায়ের চিহ্ন এর শহরে বন্দরে ।" (কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার লোকশিল্প)

এই বিবরণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট । কিছুটা খণ্ডিতও বটে । তাছাড়া এই ভিড়ে সহসা রূপবতীদের খুঁজে পাওয়া ভার । এই হারেম-রমণীরা কি সুরসুন্দরী ? নাকি চেনাজানা বঙ্গললনা ? কী তাদের পরিচয় ? কী তাদের বিশেষ রূপলক্ষণ ?

সবাই জানেন, রমণীর রূপ শুধু দেশ নির্ভর নয়, কালনির্ভরও বটে । রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—"বিবিধ জাতির রূপানুভাবকতা বিভিন্ন প্রকার ; ভারতবর্ষে কটাচক্ষু, কটা কেশ এবং বরফের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নিন্দনীয়, কিন্তু ইউরোপীয়দিগের নিকট তত্তাবৎ আদরণীয়, চীন দেশের লোকেরা অঙ্গুলের ন্যায় পদ এবং কুচের ন্যায় চক্ষু সুদৃশ্য জ্ঞান করে বলিয়া তাহারদিগের সৌন্দর্যানুভাবকতা শক্তি অপকৃষ্টতর বলা যুক্তিযুক্ত নহে ।" এ-বিষয়ে তর্কের অবকাশ অল্প । যাঁরা রমণীর বাস্তব রূপ-ধারণা নিয়ে গবেষণাদি করেছেন অনেক চমকপ্রদ খবর পাওয়া যায় তাঁদের বিবরণে । আফ্রিকায় এমন কিছু কিছু সমাজ আছে যেখানে স্থূলাঙ্গীরাই রূপের রানী । যাঁর ওজন যত বেশি তিনি তত রূপসী । নাইজেরিয়ার মান্য সুন্দরীদের সম্পর্কে মঙ্গো পার্ক লিখেছিলেন—এক একজন রীতিমত এক-উটের পক্ষে বোঝা ! আবার ভেরিয়ান এলুইন মধ্যপ্রদেশের মুরিয়াদের চোখে সুন্দরী কন্যার সংজ্ঞা দিচ্ছেন : পাতলা কোমর, উদর মোটে লম্বাটে নয়, আর নিতম্ব এবং কোমর হওয়া চাই এক সমতলে, যেন কাপড় জড়ানোর পরও পেছন দিক থেকে এক সরলরেখায় ।

আরব্য-উপন্যাসের রূপসীরা আবার একটু অন্য রকম । শরীর তার আলিফ অক্ষরটির মতো খাড়া । সরু কোমর । ব্যাবিলনীয় নয়ন । কালো চুল । খনি থেকে তুলে আনা রূপোর মতো শাদা দাঁত । সুগোল বুক যেন হাতির দাঁতে গড়া । মহীয়ান উরু । গদির মতো ঈষৎ স্ফীত নিতম্ব ।

আর এক রূপসীর বিবরণ : চুল তার দুই বন্ধুর বিচ্ছেদের মতো ঘন কালো । তিনটি নদীর মতো ঢেউ খেলে তা নেমে এসেছে নিচে, এক সঙ্গে যেন দেখা যাচ্ছে তিন তিনটি রাত্রি । মুখ তার উজ্জ্বল । যেন বিচ্ছেদশেষে আবার মিলিত হয়েছে দুই সখা । যেন চাঁদ উঠেছে । চাঁদকেই যেন আলোকিত করছে এই মুখ । তার শরীর কাঁচের মতো স্বচ্ছ । চামড়ার নিচ দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে লাল সুরা । হাতির দাঁতে গড়া বুক ।

৪২. পশ্চিমীরা নাম দিয়েছেন 'বাংলার ভেনাস' । পোড়ামাটিতে বাঙালির রমণী রূপকল্পনা ।

মখমলের মতো নরম হাত ।...শেষ পর্যন্ত কাব্য অবশ্য হারিয়ে গেছে বিশ্ববন্দিত সেই তিন বাঁকে ।

তবে, আবার বলে রাখা ভাল, রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব সর্বত্র নয়, সবকালেও নয় তিন অঙ্ক নির্ভর । একালে অবশ্য রূপবিচারে ফিতের চল, তিন পরিসংখ্যানেই বিবৃত হন বিশ্বসুন্দরী । কিন্তু চিরকাল এমনটি ছিল না । সপ্তদশ শতকেও নাকি ইউরোপের কোনও কোনও অঞ্চলে পুরুষালি উত্তমাঙ্গের বাসনায় মেয়েদের বুকে পরানো হত সিসার চাদর । বিশেষত, এই বর্মপ্রতিম কাচুলির চল ছিল নাকি স্পেনে । একই উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের রাশিয়া এবং জার্মানিতে অনেক রূপসী নাকি পরতেন কাঠের অন্তর্বাস । স্বাভাবিকতাকে দমন করাই নাকি সেদিন ফ্যাসন । বস্তুত, নারীর উত্তমাঙ্গে উত্থান-পতনের নানা অবিশ্বাস্য কাহিনী ইউরোপ আমেরিকার ফ্যাসানের ইতিবৃত্তে ।

সত্যি বলতে কী, গুরু নিতম্বিনী পীনপয়োধররা পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়াবার আগে অন্য ধরনের রূপসীও সমাদর পেয়েছেন বিশ্বের রসিক পুরুষদের কাছে । ক্লাসিক্যাল যুগের মিশর-সুন্দরীর হাত দীঘল, পা দীঘল । অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেই অনুপাতে, কোথায়ও কোনও বাড়াবাড়ি নেই । এই রূপসীদেরই নাকি পরবর্তীকালে ফাঁপিয়ে তুলেছিলেন টোলেমিরা । অথচ একসময় গ্রীকদের নিজেদের ধ্যান ছিল অন্যরকম তাঁরা বিশ্বাস করতেন প্রকৃত রূপের আধার মেদবহুল কমনীয় নারীদের নয়, তরুণ বালকের সুসম সুগঠিত অবয়ব । এ-ধরনের তরুণীর যে একটা বিশিষ্ট আকর্ষণী আছে অন্তত একজন বাঙালি কবি তা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন । সাজাদপুরের ঘাটের কাছে নৌকোয় বসে (১৮৯১) অনেক মেয়ের ভিড়ে তিনি এই রূপ আবিষ্কার করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে । বোধ হয় বয়স বারো-তেরো হবে, কিন্তু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনর দেখাচ্ছে । মুখখানি বেড়ে । বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে । ছেলেদের মত চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে ।...বাস্তবিক তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা কিছু নেই । বিশেষত, আধা ছেলে আধা মেয়ের মত হয়ে একটা বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে । ছেলেদের মত আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব তার এবং সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে । (ছিন্নপত্রাবলী) প্রাচীন গ্রীকরা যেন অনেকটা একসময় ওই ধরনের রূপসী গড়তেই যত্নবান । নারী দেহ খোদাই করতে গিয়ে বৈষ্ণব কবিদের মতো শ্রীফল বা তাল রকমের উপমা আসত না গ্রীক ভাস্করের ছেনির মুখে । তাঁর কাছে প্রিয়তর ফল বুঝিবা আপেল । এক কথায় কালিদাসের নায়িকা নয়, গ্রীক রূপতাপস যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এক ধরনের অর্ধনারীশ্বর, সেই রূপবতী অর্ধেক যার নারী, অর্ধেক নর । অবশ্য ভারতীয় রূপ-কল্পনার মতো খাড়াখাড়ি বা আড়াআড়ি বিভাগ নয়, দুই মিলিয়ে মিশিয়ে সম্পূর্ণ মানবী ।

রকমফের পরবর্তীকালের ইউরোপীয় চিত্র এবং ভাস্কর্যেও । রুবেনস-এর (১৭ শতক) 'রেপ অব স্যাবাইন উইমেন' যদি গুরুনিতম্বিনী পীনপয়োধর নীলনয়নাদের প্রতিমা, তবে বতিচেল্লির ভেনাস (১৫ শতক) কিন্তু অন্যরূপা । তরুণের মতো কাঁধ, দীঘল পা, বুকে ভূমধ্যসাগরীয় আপেলের উপমা ।

ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্রেও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে এই দুই ধ্যান । নারী দেহের দু'ধরনের বর্ণনা । খাজুরাহো কোনারকের সুন্দরী আর দক্ষিণের ব্রোঞ্জ সুন্দরী কি এক ? কিংবা মুঘল-রাজপুত চিকন ছবি আর কালীঘাটের পট ? অবশ্যই নয় ।

পটের কথা পরে । আগে ভাস্কর্যে ভারতসুন্দরীদের এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক । বাংলার টেরাকোটার নারীদের সঙ্গে তাদের কি কোনও মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না ? দু'দলের মধ্যে কি কোনও আত্মীয়তার সূত্রই নেই ? দর্শকরা জানেন, দেবী, যক্ষী, অপ্সরা, রানী, রাজকুমারী—নানা বেশে, নানারূপে নারীর শরীর বন্দিত

৪৩. নবযুগের রাধাকৃষ্ণ । পুব আর পশ্চিমের সৌন্দর্যচেতনা মিলেছে এই মিলনচিত্রে ।
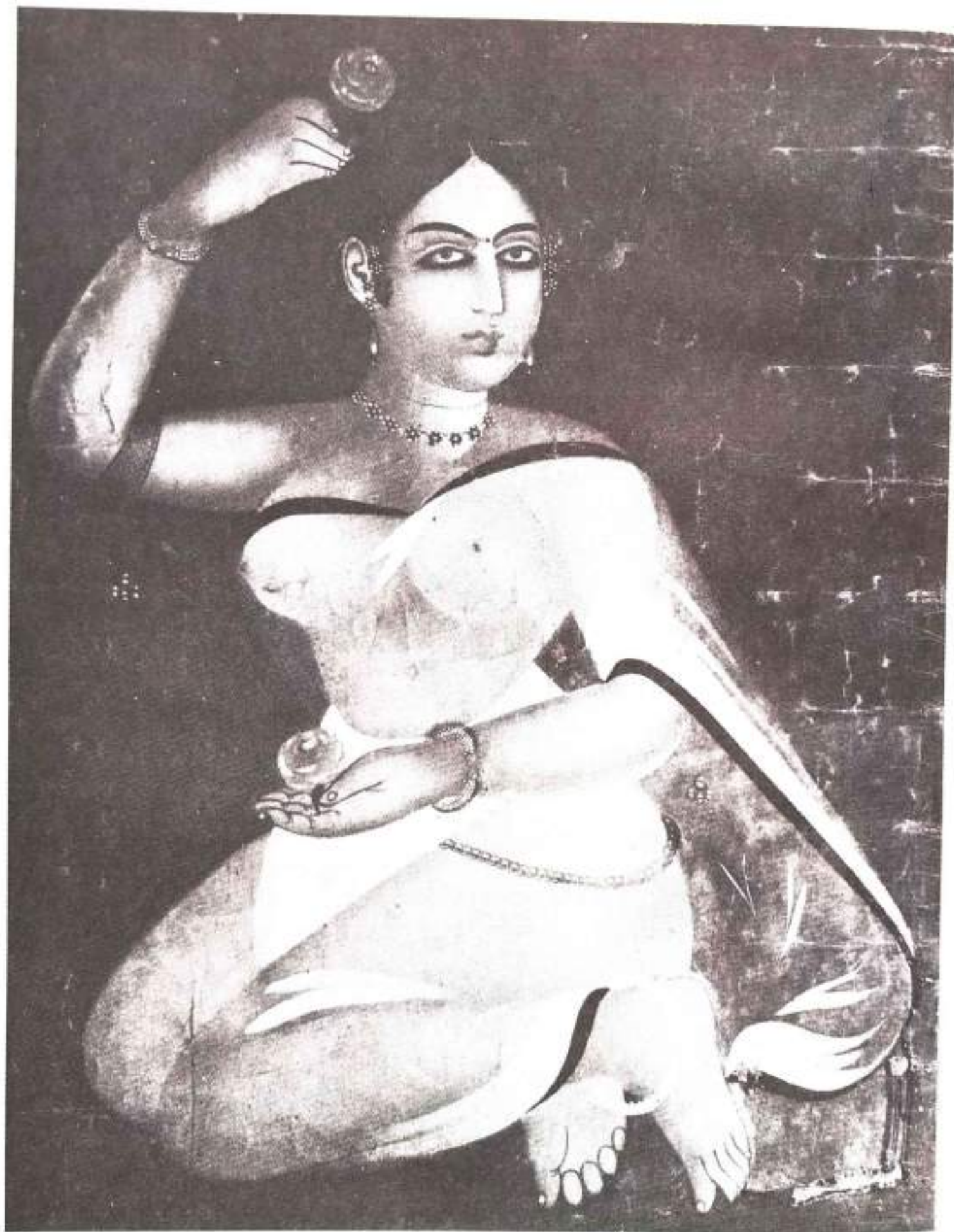
ভারতীয় ভাস্কর্যে। যিশুর জন্মের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এই রূপসাধনা। সাঁচি এবং বরহুতের যক্ষী, কিংবা দিদারগঞ্জের সেই রমণীপ্রতিমা—কোথায় তাদের তুলনা ? অজন্তার কার্লিগুহায় খোদিত সেই দম্পতি মূর্তি, কিংবা অপরূপা সেই সব শালভঞ্জিকারা, বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির কাজে তাদের খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কুশান বা গুপ্তযুগ কিছুতেই ফিরে আসতে পারে না মুসলিম বা ইংরাজ আমলে। তবে হ্যাঁ, প্রাচীন যুগের পাষাণপ্রতিমাদের মধ্যেও রূপভেদ ছিল বই কি ! কার্লির সেই যুগল, যেখানে পদ্মিনী রমণী প্রায় ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার সঙ্গে অমরাবতীর রূপসীর মিল খোঁজার চেষ্টা বৃথা। দ্বিতীয়া চিত্রিণী কি শঙ্খিনী তার বিচারে না-বসেই দর্শক লহমায় জেনে যান—এ প্রতিমা শারীর ছন্দে রেখার উত্থান পতনে হাস্যে লাস্যে অনেক লাবণ্যময়। কিংবা ইলোরার যমুনা মূর্তি। অথবা অজন্তার দেওয়ালের রমণীরা। শরীরী হয়েও তারা যেন পাথরে খোদাই করা অথবা দেওয়ালে আঁকা কবিতার মতো। দক্ষিণের ব্রোঞ্জের দাঁড়ানো সেই পার্বতীর প্রতিমাটির সম্পর্কে একই কথা বলা চলে। কোনও মিল নেই তার সেই সব সুন্দরীদের সঙ্গে যাদের শরীরের ভাঁজে খাঁজে কালিদাস কিংবা বাৎসায়নের উচ্ছকিত উপমা। বলাবাহুল্য, নারীদেহ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা,রূপের মাদকতায় দীক্ষা ছাড়া কোনও শিল্পীর পক্ষে এই আনন্দলোক রচনা সম্ভব নয়। যক্ষিণীর রূপরেখা হয়তো মিলেছিল কোনও নর্তকীর অবয়বে, নগরের কোনও কলাবতী সামান্যাই হয়তো অসামান্য নারীমূর্তি ধারণ করেছে পাথরে। তবে সন্দেহ নাই, এই রূপ বহুলাংশে কল্পনার স্পর্শে সঞ্জীবিত / অধিকাংশ প্রতিমাতেই শাস্ত্রীয় শাসনের সুস্পষ্ট লক্ষণ। কখনও বা আলঙ্কারিকদের আপ্যায়ন।

বাংলার মন্দিরের খোদাই শিল্পী সে-তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ। পাহাড়পুরের ফলক প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বিশদ করেছেন উচ্চকোটির ভাস্করদের সঙ্গে এই শিল্পীদের পার্থক্য। তিনি লিখেছেন—"মৃৎশিল্প প্রাকৃতস্তরের শিল্প ; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প ; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই—শিল্পশাস্ত্রেও না।...জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এইসব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায় নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না।" সুতরাং, বাংলার পোড়ামাটির ফলকে ক্ল্যাসিক্যাল ভারত-সুন্দরীদের খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। অপরূপাদের রূপ-কল্পনার ছায়াপাত আছে হয়তো, কিন্তু কায়ায় স্পষ্টতর স্থানীয় সুন্দরীরাই। তবে সংখ্যায় কিন্তু তাঁরা অসংখ্য নন।

মুসলিম-ইংরেজ আমলের বাংলার মন্দির ফলকগুলোর এক বিশেষত্ব এখানেই, মন্দিরগাত্রে সুন্দরীর হাট বসানো হয়নি। যথারীতি দেবীরা অবশ্য রয়েছেন। বিশেষত দুর্গা। তাছাড়া আছেন সীতা, দেবকী, যশোদা, রাধা। তাঁরা অবশ্য আছেন কিছুটা লৌকিক চেহারায়। মঙ্গলকাব্যের দেবীদের মতো গৃহস্থ বাঙালিনীর ভাব এবং ভঙ্গিতে। কিন্তু গবেষকরা বলেন দেবদেবী বা পৌরাণিক উপাখ্যানাদির চিত্রায়ন বাদ দিলে সাধারণ মূর্তির ভিড়ে নারীর উপস্থিতি বড়ই কম। (দ্রষ্টব্য : টেরাকোটা ডেকোরেশসন অব লেট মিডিয়াভেল বেঙ্গল/পোর্ট্রেয়াল অব এ সোসাইটি,—জুলেখা হক.) সম্ভবত তার কারণ এই যে, মেয়েরা সেদিন পর্দানশীন। ফলে দৈবাৎ যদি বা তাঁদের দেখা যায় তবে প্রায়শ সন্তান কোলে জননী বেশে, কিংবা বধূর সাজে গৃহস্থালির নানা কাজে। যথা : গেরস্থ বৌ ধান ভানছেন, চুল বাঁধছেন, সিঁদুর পরছেন, মাছ কুটছেন বা ওই ধরনের কোনও কাজে ব্যস্ত। তাঁরা পুরানো দিনের ভাস্কর্যের সুরসুন্দরী নন, পত্রলেখিকা বা শালভঞ্জিকা হিসাবেও কেউ নিজেদের যৌবনগরিমা প্রকাশ করছেন না। এমন কি টেরাকোটার সীতার মাথায়ও ঘোমটা।

তবে কি আঠারো-উনিশ শতকের বাংলার টেরাকোটায় সুন্দরীদের রাগ-রঙ্গ, হাস্যলাস্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ? তা নয়। কেননা, নতুন করে মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখেই বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলে তখন নতুন একদল বিত্তবানের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা নিশ্চিত নিশ্চিন্ত জীবন খুঁজে পেয়েছেন। তাছাড়া অষ্টাদশ

৪৪. পটের বিবি। তৈলচিত্রেও সেদিন বন্দিত কালীঘাট পটের রূপসীরা।

শতকের মাঝামাঝি থেকেই এখানে ওখানে নানা বিন্দুতে জাঁকিয়ে বসেছেন বিদেশীরা। তাঁদের বিত্ত এবং বিলাসও চোখ এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। সুতরাং, টেরাকোটায় থেকে থেকেই রঙ্গিলা বিদেশিনী। সাহেব-বিবি। কখনও বা সাহেব- বাঁদী। বিদেশিনী রূপসী কখনও গবাক্ষে, কখনও ক্রীড়া-পাখি হাতে, কখনও তিনি বেহালাবাদিনী, কখনও স্নানার্থী, কখনও বা সাহেবের অঙ্কশায়িনী। সাহেব-বিবিদের জীবনাচার যে নানাভাবে আন্দোলিত আলোড়িত এবং প্রভাবিত করেছে বাংলার সর্বস্তরের শিল্পীমানস তার অজস্র চাক্ষুষ প্রমাণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র। পটে, নকশি কাঁথায়, বালুচরি শাড়ির পাড়ে এবং আঁচলে,—কোথায় নেই সাহেব এবং তাঁর সঙ্গিনী ? বাংলার মন্দির স্থাপত্যকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে তারা। বীরভূমে এমন মন্দির আছে যার সর্বাঙ্গে ইংরাজী ছাপ। মুকুল দে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সেই সব মন্দির ও তার অলঙ্করণ নিয়ে (বীরভূম টেরাকোটাস)। তাঁর বইটিতে নমুনা হিসাবে পোড়ামাটির কাজে, সুন্দর কিছু নমুনাও রয়েছে।

মুকুল দে লিখেছেন আঠারো-উনিশ শতকে বীরভূমের এই সব মন্দির যাঁদের অর্থে গড়ে উঠেছিল সে-দলে ছিলেন—স্থানীয় জমিদার, সম্পন্ন কিছু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, স্বর্ণশিল্পী, পান বরোজের মালিক, লাক্ষা, কয়লা এবং মদ্য ব্যবসায়ী। মন্দির অলংকরণে পৃষ্ঠপোষকের রুচির কিছু প্রভাব থাকলে সেটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। বরং সেটাই স্বাভাবিক। একজন সমাজতাত্ত্বিক অনুমান করেছেন আঠারো-উনিশ শতকে কুলিনদের অসংখ্য বিয়ের প্রবণতার সঙ্গে মুসলিম নবাব বাদশাদের জীবনভঙ্গির কিছু প্রভাব থাকা সম্ভব। নবাব হারেম সাজাতে পারেন, দরিদ্র কুলীনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয় বলেই তাঁর ওই বিচিত্র বহুবল্লভের জীবন ! সমাজের ওই সব সফল শ্রেষ্ঠীর জীবনেও যে নবাবী বা বনেদি ভূস্বামীদের বিলাসব্যসনের কোনও আবেদন ছিল না এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। মন্দিরে মন্দিরে অতএব নরনারীর মিথুনমূর্তি রয়েছে। অবশ্য খাজুরাহো-কোনারকের প্রকাশ্যভাবে নয়, কিছুটা আড়ালে। রয়েছে নর্তকী এবং গায়িকাও। ধনাঢ্যের নাচঘরে তো বটেই, কোনও কোনও দল চলেছে গরুর গাড়িতে, ঘোড়ার গাড়িতে এবং নৌকায়। কোনও কোনও নর্তকীদল ইউরোপীয়ানদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। দেখে কখনও মনে পড়বে হুতোম বর্ণিত কলকাতার বাবুদের মাহেশ-যাত্রার কথা, কখনও বাঈজীর নাচ সহযোগে শহরের গণ্যমান্যদের সাহেবদের মনোজয়ের কথা, বা নীলদর্পণের রোগ সাহেব আর ক্ষেত্রমণির কথা। ক্ষেত্রমণি ছিলেন চাষীর বউ। কিন্তু এরা কারা ? হুতোমের নায়ক গুরুদাস বারবিলাসিনী সংগ্রহ করতে না-পেরে মাহেশ যাত্রা করেছিল নিজের বিধবা পিসিকে সঙ্গে নিয়ে। 'সমাচার দর্পণে' এক 'শৌকীন বাবু'র উপাখ্যানে বলা হয়েছিল তিনি স্নান যাত্রা করেছিলেন নিজের ধর্মপত্নীকে নিয়ে। অন্যাদের নৌকোয় অপ্সরারা নাচছে গাইছে দেখে বাবু নিজের স্ত্রীকেই ধরলেন। "এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন না ইহাতে বাবু খেদান্বিত হইয়া কহিলেন তুমি এক কর্ম্ম কর কেবল সোজা খেউড়ে গীত গাও আমি খেমটা বাদ্য বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর।" বীরভূমের ওই বিত্তবানেরা নিশ্চয়ই নিজেদের কুললক্ষ্মীদের মন্দিরগাত্রে নর্তকী বা বিলাসিনীর ভূমিকায় দেখতে চাননি। তাঁরা বড়জোর জানালায় দাঁড়াবার অনুমতি পেয়েছেন মাত্র। মেমদের মতো কিছু কিছু বাঙালি বাতায়ন-বর্তিনীও ছিলেন বটে। কিন্তু সুরসিকা নর্তকীরা পরিচয়ে অন্য। তাঁরা নিশ্চিত পেশাদার নটী। গ্রামাঞ্চলেও তাঁরা ছিলেন বই কি। তা না হলে নকশি কাঁথায় সাহেব-মেমের আন্দোলিত যুগল মূর্তির নিচে কেন লেখা হবে—"ফিরিঙ্গিদের রঙ্গ দেখে বাঁচিনা/ মাগী মিনসে যুগলেতে নাচে তাধিনধিনা।" আর যেখানে বাঙালি মেয়ে দুটি নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার নিচে লেখা রয়েছে—দত্তবাবুর নাচঘরেতে বাঁয়া তবলা বাজে।/ রুপো দাসী চুনো দাসী জোড়া বাঈজী নাচে ॥"

শুধু ওই দু'জনই নয়, আরও ছিল। তাদের সঙ্গে চেনাজানা করতে হলে একবার ঘুরে আসা প্রয়োজন

৪৫. নববিবিবিলাস। উনিশ শতকে জয়পুর কলম-এর আর এক পরিণতি। গৃহসজ্জায় কোম্পানি-আমল।
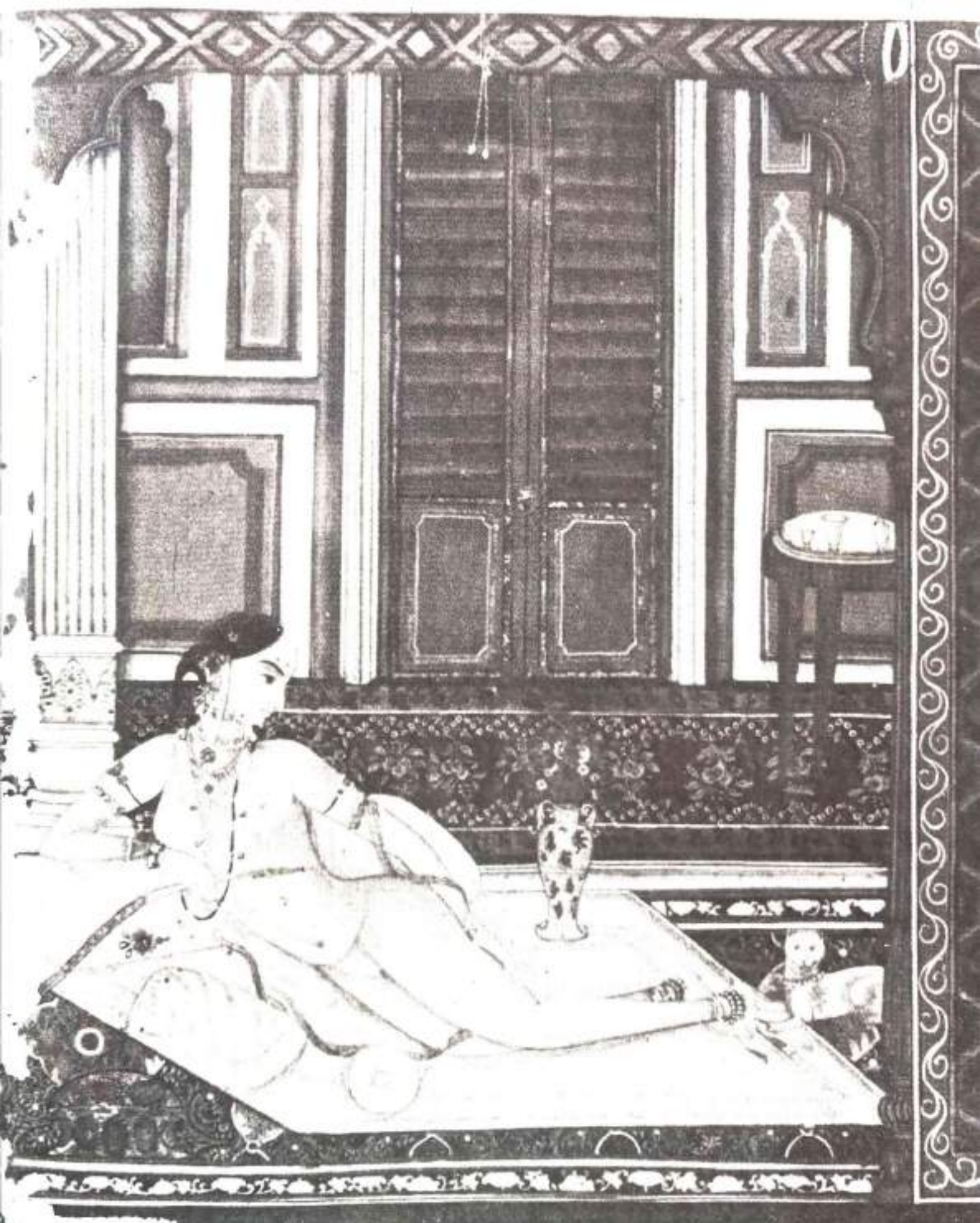
ইংরাজের নতুন রাজধানী শহর খাস কলকাতা। বাংলার মন্দিরের এইসব গায়িকা আর নর্তকীরা তখন পতঙ্গের মতো ছুটছেন সেদিকেই। সেখানে অলিতে গলিতে পটের-বিবি।



"পাঠক! আমাদের বড় মানুষের, সভাভব্য বড় মানুষের বাড়ির স্ত্রীলোকের এই নিম্নঅঙ্কিত ছবিখানি, দু'কানে দশটা করে এক কুড়ি মাকড়ি; হাতে চুড়ি, দমদম, জসম, গলায় চার আঙুল চৌড়া ডায়মান-কাটা চিক, পাদপদ্মে চারগাছা করে আটগাছা মল, কোমরে চন্দ্রহার, জামা গায়ে, ফিনফিনে ফরাসডাঙ্গার প্যাচাপেড়ে শাড়ী পরা, যদি তাঁদের কোন পূর্বপুরুষ আমেরিকার ভূতাত্ত্বিকের প্রভাবে অবতীর্ণ হয়ে দেখেন, তাহলে কি তিনি ঐ ছবিখানি তাঁর পবিত্র বংশের কুলবধূর বলে চিনতে পারবেন?"

সম্ভবত পাঠকও এই রমণী-প্রতিমূর্তিটি দেখে এই পটের বিবির রূপ সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন না। এমন কি গহনা বা পোশাকের বর্ণনায়ও কোনও চমৎকারিত্ব নেই। সেদিক থেকে এর কাছাকাছি আর একটি বিবরণ বরং সহজবোধ্য। "কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর। সৌদামিনী জিনি সিতি অতি শোভাকর॥ কাজবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে। মনোহর মুক্তাগাছা তাহাতে দিয়েছে॥ মুক্তায় মুণ্ডিত নত্ নাসায় দুলিছে। মঞ্জনে মর্জিত দন্ত দামিনী খসিছে॥ মুক্তাগছা গলদেশে সাজে শাতনরি। হীরাপান্না ধুকধুকি আছে শোভা করি॥ বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও। পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও॥ ধানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে। নবরত অঙ্গরীয় শোভা করে তাতে॥ হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত। কটিতে কণকচন্দ্র হার মনোনীত॥ চাবিশিক্লি তাহে পুন দিয়েছে ঝুলায়ে। পদাঙ্গুলে আছে চুটকী ছাল্লাতে মিশায়ে। সুবর্ণের গোলমল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়॥"



দু'জনেই কুলবধূ। বড়ঘরের বৌ। প্রথম বিবরণটি ব্যঙ্গছলে লেখা। কারণ সেটি প্রকাশিত হয়েছিল গত শতকের একটি রঙ্গব্যঙ্গের কাগজ সাপ্তাহিক 'হুতোম'-এ। দ্বিতীয়টি ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়-এর বিখ্যাত বা কুখ্যাত 'দূতীবিলাস' থেকে। প্রথম রচনার উপলক্ষ ছিল 'প্রতিমূর্তি' রচনা। লেখক জানাচ্ছেন "সহরের বড় মানুষদের আপন আপন খোস্ চেহারার ছবি আঁকানো, এটি তাদের উঁচু সমাজের ফেসন। কিন্তু বিচক্ষণ চিত্রকরেরা হুজুরদের ছবি আঁকতে এতটুকো যত্ন বা শ্রম করে না, বাবুর ভাগ্যে আর তাদের হাতযশে যা বার হয় সেইগুলিই পোরট্রেট নামে বিখ্যাত হয়ে বাবার বৈঠকখানা ঘর শোভিত করে।' সেই প্রসঙ্গেই কথায় কথায় বিবির প্রতিকৃতি প্রসঙ্গ। কিন্তু কোথায় সেই ছবি? ছবি বলতে কয়টি বাক্য, আর অতি সাধারণ একটি ব্যঙ্গচিত্র। ইতিহাসের সত্য এই, বড়ঘরের পটের বিবিরা কোনও পটে নেই। সাহিত্যে আছেন, কাব্যে আছেন, কিন্তু ক্যানভাসে নেই। সত্য, উনিশ শতকে বাঙালি বড়মানুষদের মধ্যে প্রতিকৃতি আঁকবার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছিল। সে-বাবদে বিস্তর অর্থও ঢেলেছেন তাঁরা। তবে সবই নিজেদের, বা পিতা পিতামহের মনোহর প্রতিকৃতিটি ধরে রাখার জন্য। কলকাতা বা আশপাশের ধনাঢ্যদের বাড়িতে হানা দিলে এখনও চোখে পড়বে এ-ধরনের অনেক প্রতিকৃতি। ইংরেজি পোশাকে বাবু, নবাবী পোশাকে বাবু,—হয়তো বা কাশ্মীরী শাল গায়ে ক্বচিৎ কখনও বাঙালির পোশাকেও পাওয়া যাবে তাঁকে। কিন্তু কুললক্ষ্মীদের নয় দেওয়াল থেকে নারী প্রতিমা যে সম্পূর্ণত নির্বাসিত এমন হয়তো নয়। আগেই বলা হয়েছে পশ্চিমী রূপসীরা থাকতেন। এখনও হয়তো আছেন কোনও কোনও বাড়িতে। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে একমাত্র থাকার সম্ভাবনা মা-ঠাকুমা-দিদিমাদের। শুধু বিদ্যাসাগর মশাই নন, আরও তৎকালে অনেকেই মায়ের ছবি আঁকিয়েছেন। জপের মালা হাতে আহ্নিকে বসা 'মা বা ঠাকুমা' নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে বাবুদের বাড়িতে। কিন্তু কখনও বিবিকে নয়। যদিবা দৈবাৎ তিনি থাকেন কোথাও, তবে পরবর্তীকালে, এবং অবশ্যই 'অতি প্রগতিশীল' কোনও বাড়িতে যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় ক্যামেরায় সম্ভ্রান্তঘরের মেয়েদের ছবি তোলার জন্য 'জেনানা স্টুডিও' প্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্যোগ গত শতকের সাতের দশকে। তার আগে, কিংবা

৪৬. মডেস্টির বাঙালি সংস্করণ, সুশীলা-সুন্দরী। চিৎপুরের রঙিন লিথোগ্রাফ।

অব্যবহিত পরে কোনও বাবু তাঁর আপন বিবিকে কোনও চিত্রকরের সামনে বসিয়ে রাখেন প্রতিকৃতির জন্য,—ভাবা যায় না। সুতরাং, সেকালের সুন্দরী গৃহবধূদের বৃথাই দেওয়ালে দেওয়ালে খুঁজে ফেরা। কোথাও নেই ভবানীচরণের অনঙ্গমঞ্জুরী, দূতীর মুখে যাঁর রূপ :

"সুন্দরী চম্পকবরণী বালা। রূপে তার ঘর উজ্জ্বলা ॥ সুমেরুর বড় বাড়াত্রিং ছিল। পীনস্তন দেখি খাট হইল ॥ বদন বিমল আভা দেখিয়ে। বিধুকলা ক্ষয় হয় ভাবিয়ে ॥ নয়ন দেখিয়া খঞ্জনতায়। আপন নাচন ভুলিয়া যায় ॥ ক্ষীণ মাজা অতি নিতপীন। উপমা কি দিব সকলি ক্ষীণ ॥" ইত্যাদি।

হয়তো কোথাও আছেন তিনি অন্নপূর্ণা কিংবা জগদ্ধাত্রী অথবা রাজরাজেশ্বরী বেশে। এমনও হতে পারে পশ্চিমী পদ্ধতিতে দক্ষ বাঙালি চিত্রকরদের তৈলচিত্রগুলো, যা ইদানীং চিহ্নিত ডাচ 'বেঙ্গল স্কুল' (অবনীন্দ্রনাথ—পরবর্তী বেঙ্গল-স্কুল থেকে তা স্বতন্ত্র ) বলে চিহ্নিত তার শকুন্তলা, সীতা অথবা রাধারা—এঁদের আদলেই রচিত। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে কিষাণগড়ের সেই বিখ্যাত রাধার ছবিটির কথা। দরবারী শিল্পী নাগরি দাস নাকি রাজার প্রেমিকা কবি-নর্তকী বানী থানীকেই চিত্রিত করেছিলেন রাধা ভাবে। (এ সম্পর্কে সুন্দর একটি আলাচনা করেছেন পরিতোষ সেন। দ্রষ্টব্য : আলেখ্য মঞ্জরী) তবে বাংলার ছবিতে বাঙালির কুলবধূই বা ঠাঁই করে নিতে পারবে না কেন ? রাধা কি শুধু মথুরা বা বৃন্দাবনে, আর রাজস্থানে ? বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের পুষ্পিত কানন তো এক বিচারে তাঁকে ঘিরেই। একজন বিদেশী শিল্পসমালোচক রাজস্থানে রাধা-কৃষ্ণ ধ্যানের চিত্রিত এবং লিখিত রূপ দেখে মন্তব্য করেছেন—রাজপুত সমাজের তদানীন্তন পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই স্ফূর্তি স্বাভাবিক। কেননা, সমাজে তখন নরনারীর সম্পর্ক নানা শাসনে নিয়ন্ত্রিত। ছেলেমেয়েদের বিয়ে পরিবারের প্রবীণদের দায়িত্ব। যুবক যুবতীর বিশেষ

৪৭. প্রমোদা-সুন্দরী।
৪৮. অনুরাগিনী।

কোনও ভূমিকা নেই। অন্তত পশ্চিমী অর্থে সেখানে প্রাক্‌-বিবাহ পর্বে রোমান্সের কোনও সুযোগ ছিল না। সুতরাং, রাধা কৃষ্ণ আর গোপিনীরা যেন এনে দিল মুক্তির হাওয়া,—'এ লজিক্যাল আউটলেট ফর পেন্ট-আপ ইমোশনস।' তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন মধ্যযুগের ইউরোপের দরবারী প্রেম-প্রণয়ের যে সাহিত্য সেখানেও একই বৃত্তান্ত। (ইন্ডিয়ান আর্ট, রয় সি ক্র্যাভেন)

সুতরাং, হয়তো দেবী বা পৌরাণিক নানা ছবিতে ছায়াপাত ঘটেছে বড়মানুষের ঘরের সুন্দরী বউদের, কিন্তু মানবী বেশে সরাসরি যাঁরা দর্শকদের দিকে তাকিয়ে আছেন সেইসব পটের বিবিরা অবশ্যই কুললক্ষ্মী নন,—অন্য কেউ।

'অবগুণ্ঠিত শির স্বতই লজ্জানত, গমনমন্থর দৃষ্টি পায়ে নিবদ্ধ, বাক্য পরিমার্জিত এবং মৃদুমধুর—এইসব দ্বারা এই মহিলা যেন উচ্চস্বরে নিজের কুলমর্যাদা প্রকাশ করিতেছেন।' কুললক্ষ্মীর এইসব লক্ষণ সনাক্ত করেছিলেন প্রাচীন কবি লক্ষ্মীধর। উনিশ শতকের কলকাতার পটের বিবিদের লক্ষণ যেন ঠিক তার বিপরীত। কি কালীঘাটের পট, কি বটতলার কাঠখোদাই, কি চোরবাগান কাঁসারিপাড়ার লিথোগ্রাফ,—সর্বত্র তাঁরা মোহিনী, অথবা রঙ্গিনী।

সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, কলকাতা তখন রঙিন শহর। কলকাতা কলির শহর। কলকাতা কমলালয়। 'কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থ দ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে, তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে।...দেবাসুর সংগ্রামে সাগর মন্থন হইয়াছিল তাহাতে হলাহল ও অমৃত উঠিয়াছিল এবং সাগর অনুপম ও সর্বদেশ খ্যাত হইয়াছেন সাগরে হাঁগর কুম্ভীরাদি জলজন্তু বাস করিতেছে ভগবান নারায়ণ নগরবাসী হইয়াছেন ও তথায় লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন সাগরে সর্বদা তরঙ্গও কল্লোল

৪৯. বস্ত্রহরণ।
৫০. গোলাপ-সুন্দরী। বাবু বিত্তহারিণী চিৎপুরের চারিটি রঙিন লিথোগ্রাফ।

হইতেছে।" (কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই কল্লোলিত কলকাতা, যেখানে দেশ দেশান্তরের ভাগ্যান্বেষীদের ভিড়, যেখানে গ্রামীণ সমাজের শাসন শিথিল, মানুষ যেখানে জীবনাচারে কার্যত স্বাধীন এবং যেখানে অর্থোপার্জনের উপায় বলতে গেলে অন্তহীন, সেখানে বারবিলাসিনীর কলকাকলি শতাব্দী পরেও কানে পৌঁছাবে, এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। 'রসমঞ্জরী'-তে বলা হয়েছিল—"বেশ্যা যখন নায়কের নিকট অভিসার করে তখন সখীকে সঙ্গে নেয়, মদাধিক্যবশতঃ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নির্ভয়ে চলে, সলজ্জে মাথা হেঁট করিয়া চলে না এবং পরকীয়া নায়িকার ন্যায় আভরণশব্দ গোপন করে না বরং অলঙ্কার ঝনৎকার করিতে করিতে যায়।" (অনুবাদ—ত্রিদিবনাথ রায়, দ্রঃ প্রবন্ধ-মঞ্জুষা)

উনিশ শতকের কলকাতার রমণীর যে-প্রতিকৃতিতে তাঁদেরই প্রতিচ্ছবি। তাঁদেরই হাস্য, লাস্য, শৃঙ্গার এবং কামকলা। এইসব আলেখ্য দর্শনের আগে অতএব সংক্ষেপে সেদিনের কিঞ্চিৎ বাবু-বিলাস। 'হুতোম প্যাঁচা' নিঃসঙ্গ দর্শক নন। উনিশ শতকের নানা বিশিষ্টজনের স্মৃতিকথায়, অসংখ্য প্রহসন এবং নকশায় ছড়িয়ে রয়েছে সেই বিলাসিতার বিবরণ।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—" একালে যেমন পানদোষ বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনই বেশ্যাগমনও বৃদ্ধি হইতেছে। সেকালে লোকে প্রকাশ্যরূপে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত ; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে।...ইহা কিন্তু সভ্যতার চিহ্ন। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হয়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তাহার সঙ্গে বৃদ্ধি হইয়া থাকে।" (সেকাল আর একাল) কলকাতা সম্পর্কে অতএব প্রচলিত প্রবাদ তখন—"আজব শহর কলকেতা। রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছাকথার কী কেতা।" এ-প্রবাদের একটা হিন্দুস্থানী রকমফেরও চালু ছিল—"গাড়ী-ঘোড়া নোনা পানি আউর রাণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়। এস্‌মে যো বাঁচে মোসাফির মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়।"

হুতোম প্যাঁচার কথা—"বেশ্যাবাজিটি এ শহরে বাহাদুরির কাজ ও বড়মানষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড়মানুষ বহুকাল হলো মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েচে—সেই তেতেলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয়নি, যা দেখে সাধারণে তাঁরে স্মরণ করে। কলকেতার অনেক প্রকৃত হিন্দু দলপতি ও রাজরাজড়ারা রাত্তিরে নিজ বিবাহিতা স্ত্রী মুখ দ্যাখেন না, বাড়ির প্রধান আমলা দাওয়ান মুচ্ছুদ্দিরা যেমন হুজুরদের হয়ে বিষয় কর্ম দেখেন—স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁদের উপর আইনমত অর্শায়, সুতরাং তাঁরা ছাড়বেন কেন।"

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন—"আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ি করিয়া দিয়াছেন ; এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ি করিয়া দেওয়া এক মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল।"

পাঁচালীকার দাশরথী বর্ণনা করছেন কলকাতার দৃশ্য—"দেখিলাম রাস্তার দুই পাশে, বারান্ডার পাশে পাশে আছে বসে বিদ্যুৎসমান।/ গহনায় ঢেকেছে গায়, শারিমিয়ার টপ্পা গায়,/ কত বাবুরা মন যোগায়, ভৃত্যের সমান।" দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় আরও কিছু খবর দিয়েছেন—"পূর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল।...যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও পরস্পরের সাক্ষাতের নিমিত্ত এইসকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পরিপূর্ণ থাকিত।"

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর মন্তব্য—"আমাদের দেশের স্ত্রী লোকের জন্য ভদ্রসমাজ ও বেশ্যা সমাজের মধ্যে

৫১. রানী-সুন্দরী। এদের নিয়েই সেদিন বাবুদের বিনিদ্ররজনী।

'দোমি-মঁদ' বলিয়া কোনও জায়গা ছিল না।" সুতরাং, অনেক সময় বেশ্যালয়ই ছিল বাবুদের আড্ডাস্থল। সে যুগের প্রখ্যাত বাঙালি কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখেছেন—"বাবু বল্লেন এ তো নিদয় ভেবো না, আমার এ মনে এ জিবনে আর কেউ স্থান পাবে না। আমি বলিলাম ঠিক বলেচেন, বলে হাসিলাম। বাবু বলেন ঠিক কি গরঠিক তাহা তুমি ভেবে দেকো। তোমাকে বলিতে হল খুলে, তুমি বিশ্বাস করো আর না করো। আমি এক ২ দিন কোথাও জাই বটে, কিন্তু সে আমোদের জন্যে, নাচ দেকিতে গায়োনা শুনিতে। কখন তোমার অনাদর করেছি, কি কখন রাত্র প্রভাত করেছি তাহা তোমাকে যথার্থ বলতে হবে।..."

সন্দেহ নেই কৈলাসবাসিনী ছিলেন স্বামী সোহাগিনী। কিন্তু সমসাময়িক কালের সাহিত্যের সাক্ষী মেনে নিলে সন্দেহ থাকে না অন্য অনেক কুলবধূর ভাগ্যই ছিল বিপরীত। 'রসমঞ্জরী'-তে একজন বারাঙ্গনার বিস্মিত উক্তি—"প্রতি গৃহেই যুবতী নারী আছে, যাহাদিগের নয়নের বিভ্রম সুধাসাগরে লগ্ন সুন্দর সরোজের মতো চমৎকার। কিন্তু আশ্চর্য, বিচিত্র মন্মথ-কলায় কুশলতার জন্য ঐ যুবা আমাকে কেন চিত্তহারী অর্থ ও উপহারাদি দেয় ?" (অনুবাদ—ত্রিদিবনাথ রায়।) 'দোহাকোষে' একটি অর্থপূর্ণ উক্তির কথা মনে পড়ছে। তার সার—"নিজের ঘরে আপন গৃহিনী যে-পর্যন্ত না মজেন সে-পর্যন্ত কি পঞ্চবর্ণে বিহার করা যায় ?"

উনিশ শতকের বাঙালি বাবুর জবানে এসব প্রশ্নের উত্তর আছে বই কি ! একটি প্রহসনে (ঘর থাকতে বাবুই ভেজে, হরিশচন্দ্র মিত্র,১৮৭২) অন্যতম চরিত্র রসিকবাবু বলছেন—"ভাই ঘরে যে ঠাকরুণ আছেন তার না আছে কথার ছেনালী, না আছে পোষাকের বিউটি, না আছে গাওনা বাজনার টেস্ট।...ওয়াইফের সঙ্গে তাদের (অর্থাৎ ইয়ার বন্ধুদের) নিয়ে আমোদ প্রমোদ করা দূরে থাক, একবার দেখানোর যো নাই।"

আর একটিতে (ভ্যালারে মোর বাপ, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৭৬) অবশ্য একটি চরিত্র গর্ব করে বলছিল—"আমি বেশ্যালয়ে যাইনে। যারা বাউত্রে তারাই খান্‌কির বাড়ী গিয়ে টাকা নষ্ট করে। ঠানদিদি, তোমাকে বোলতে কি ! তুমি কিন্তু কারো সাক্ষাতে বোল্‌তে যাবে না।—আমি অফিস থেকে আসবার সময় রাস্তার ধারে বারেণ্ডায় খান্‌কি বেটীরে যেমন কোরে সেজে বোসে থাকতে দেখি, ঘরে এসে তোমার নাত বৌকে ঠিক তেম্নি কোরে সাজাই।"

সকলে তা পারবে কেন ? সুতরাং, শহর কলকাতা তখন বাঈজীর নূপুর নিক্কণে, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, খেমটা, আড়-খেমটা, আর টপ্পার প্রীতি-গীতিতে মুখর। গোটা দেশ থেকে প্রমোদ রমণীরা ছুটে আসছে এখানে। গ্রামের স্থিতি তছনছ হয়ে গেছে। জীবন আর জীবিকার সন্ধানে গাঁয়ের মানুষ ভিড় করছে শহরে। বহুবিবাহ, অকাল বৈধব্য, বালিকাবধূর দেশ। নগরে অতএব তখন নাগরী হওয়ার জন্য অনেক তরুণীই তৈরি। তাছাড়া নবাবী আমলের জলসাঘর নিষ্প্রদীপ। মুজরোহীন বাঈজী আর গায়িকার দলও নব্য পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে কলকাতাকে নিশানা করে অভিসারিকা। কলকাতার কাগজে তখন নিয়মিত প্রকাশিত হয় বাঈজী-সংবাদ। যথা : 'শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান লোক তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছিল।" সেকালেই 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গাম', বিবি আনর আর বাবু কালীপ্রসাদ দত্তের রম্য উপাখ্যান। সেকালেই সমাচার পত্রিকায় 'দ্বিজরাজের খেদোক্তি, বা ব্যাঙ্গোক্তি—'ভাগ্যগুণে মিলেছিল যবণী রমণী। পরম সুন্দরী তিনি সুপ্রিয় বাদিনী ॥...যবনী প্রেয়সী গর্ভে সুপুত্র জন্মিল। রাজা নাম দিনু তার নিকট রহিল ॥" ইত্যাদি। নবাবী আমলেই বাঙালি বিত্তবানদের মধ্যে কিছু পরিমাণে নবাবী-বিলাস সংক্রামিত হয়েছিল। পোশাকে-আসাকে, খানা-পিনায়, কথাবার্তায় তো বটেই, সম্ভবত অন্য রুচিতেও। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরবাসিনীরা নাকি 'সক্ করিয়া পেশোয়াজ ইত্যাদি' পরতেন। বড়ঘরের অন্তঃপুরে শুধু প্রমরা আর তানপাশা নয়, হুঁকো গড়গড়াও নাকি

**৫২. পরীর স্বপ্নে বিভোর উনিশ শতকের বাঙালি বাবুদের হাতে এমনকি পরী তুলে দিচ্ছিলেন সেদিন কালীঘাটের পটুয়ারাও।**

জাঁকিয়ে বসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সহজ সুন্দরীরা বাবুদের চলতি রুচির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন কেন? 'নববাবু বিলাসে' সে কারণেই বুঝি খোলাখুলি পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল—"পলাণ্ড অর্থাৎ পেঁয়াজ ও রশুন যাহারা আহার করিয়া থাকে তাহারদিগের সহিত সম্ভোগে যত মজা এমন কোন রাড়েই পাইবানা।"

শুধু ক্লেদ আর কালিমা নয়, নাগর সভ্যতায় অন্ধকারের এই নাগরিকাদের কিছু কিছু অবদানও ছিল বই কি। যে কোনও শিক্ষিত বাঙালি জানেন বাংলা রঙ্গমঞ্চে এঁদের পদসঞ্চারেই প্রথম সত্যকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। নাট্যমঞ্চে এই সামান্যরাই যেন ভাস্কর্যের সেই শালভঞ্জিকা, যাঁদের পায়ের ছন্দে বৃক্ষলতায় ফুল ফোটে। ১৮৭৩ সনে মাইকেলের পরামর্শে 'শর্মিষ্ঠা'-য় যে মেয়েরা অভিনেত্রী বেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সৌভাগ্যবশত তাঁদের নামগুলো হারিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। ওঁরা জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী, শ্যামা। তারপর তো ক্রমে আরও অনেকেই। বলাবাহুল্য, কেউ কেউ এই সাহসিকতার জন্য বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালকদের তারিফ করলেও সকলে তা করেননি। একটি কাগজ (অমৃতবাজার পত্রিকা) লিখেছিল—"সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে একটি নূতন জিনিস। রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হইলে অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের অংশ সকল সমাজ-পরিত্যক্ত ধর্মভ্রষ্টা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে জনসমাজে পাপ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি হয় কিনা তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ।" আর একটি কাগজ লিখেছিল—"এ পর্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ কীর্ত্তন ঝুমুরেই বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদের অভিনয় প্রথম দেখিলাম।" (ভারত সংস্কারক) আর একটি কাগজের (মধ্যস্থ) মন্তব্য—"এতদিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রসমাজে সমানাধিকার প্রাপ্ত হইল।"

এই বিতর্ক আজ অপ্রাসঙ্গিক। অনেক আগেই মীমাংসা হয়ে গিয়েছে এইসব কূটতর্কের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নগরের রূপরঙ্গিনীরা কিন্তু তার আগেই কলাক্ষেত্রে তাঁদের মোহর এঁকে দিয়েছিলেন। নিধুর টপ্পা নামে যে সুরেলা সুধায় শহর মাতোয়ারা, সেই নিধুবাবুর প্রেরণাও নাকি কোনও মায়াবিনী। ঈশ্বর গুপ্ত মশাই লিখেছেন—"মুরশিদাবাদে মৃত মহারাজ মহানন্দ রায় বাহাদুর এখানে আসিয়া বহুদিন অবস্থানপূর্বক প্রতিদিবস এক নিয়মে বাবুর সহিত একত্র হইয়া মনের আনন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেন। উক্ত মহারাজার শ্রীমতী নাম্নী এক রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনা ছিল, ঐ বারবিলাসিনী রামনিধিবাবুকে অন্তঃকরণের সহিত ভালবাসিত ও অতিশয় স্নেহ করিত এবং বাবুও তাহার বিস্তর গৌরব ও সম্মান করিতেন। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করিতেন এই শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রণয়িনী, প্রিয়তমা বেশ্যা। কিন্তু অনেকে একথা অগ্রাহ্য করিয়া কহিতেন তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিয়া প্রায় প্রতি রজনীতেই তাহার গৃহে গমন করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য পরিহাস, কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন, আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেরূপ ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ রাগসুর বদ্ধ করিয়া তাহারি এক এক টপ্পা রচনা করিতেন।" (কবিজীবনী)

শুধু নিধুবাবুর টপ্পা কেন, সেদিনের অনেক প্রেমসঙ্গীতেরই নেপথ্যে বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে নগরের কলানিপুণা রূপধন্য সামান্যবণিতা। আর,—যে কথাটি বলার জন্য এই দীর্ঘ ভূমিকা,—উনিশ শতকের কলকাতার পটের-বিবি বলতে ওঁরাই। পটের পর পটে রঙে রেখায় তাঁরাই বর্ণিত, বন্দিত, আদৃত। কলির শহর কলকাতায় তাঁরাই যক্ষিণী, তাঁরাই সুরসুন্দরী, তাঁরাই অপ্সরা! অবশ্য অন্য নামে। কালীঘাটে নাম তাঁর গোলাপসুন্দরী। গরাণহাটা চিৎপুরে প্রমোদাসুন্দরী কিংবা অনঙ্গমঞ্জরী!

"যে-শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্ব পরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যবসা।

সে মনে ভাবে,'ধনী ছিলেন, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।'

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজা আদর করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।"···

রবীন্দ্রনাথের 'পট' গল্পের নায়ক অভিরামের জীবনে যে সংকট কালীঘাটের পটুয়াদের সংকটও বুঝি বা প্রকৃতিতে এক। গাঁয়ের মানুষ তাঁরা। অভিরামের মতোই এ শহরে তাঁরা 'বিদেশী'। গাঁয়ে তাঁদের টাকা-কড়ি অর্থে ধন ছিল না হয়তো, তবু তাঁরা ধনী ছিলেন। তাঁদের সমাজ ছিল, সমাদর ছিল। গ্রাম সমাজের নকশায় তাঁদের বিশিষ্ট স্থান ছিল। এখানে তাঁরা ছিন্নমূল। এদেশের রাজা মন্ত্রী সবই আলাদা। পরিবেশও বুঝিবা অচেনা। চেনাজানা লোকগুলোও যেন কেমন অচেনা-অচেনা। গল্পের অভিরামের বিপদ হয়েছিল যেদিন মন্ত্রিপুত্র তার পট কেনার জন্য বায়না ধরেন। "অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে,—'বেচব না'!"

সেই সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত অটল থাকতে পারেনি অভিরাম। তাকে মত বদলাতে হয়েছিল।

"প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর

৫৩. রাধাকৃষ্ণ। বাংলার মন্দির টেরাকোটা। কালীঘাটের পটেও তার ছায়া।

কোন পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে।...দিনে দিনে সেই সূক্ষ্ম বদল স্থূল হয়ে উঠতে লাগল।...আজ সে স্পষ্ট দেখল, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মন্ত্রীর মুখের মতো হয়ে উঠেছে।"

কালীঘাটেও তেমনই গাঁয়ের পটুয়ার পটে একই ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল কলকাতার মুখ। উনিশ শতকের কলকাতার।

কালীঘাটের ছবি নিয়ে দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। উইলিয়াম আর্চার এই বিশেষ চিত্রলহরীকে ভাগ করেছেন চারটি পর্যায়ে। তাঁর মতে প্রথম পর্বের কালসীমা ১৮০০ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ, দ্বিতীয় ১৮৫০ থেকে ১৮৭০, তৃতীয় ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫, চতুর্থ তথা শেষ অধ্যায় ১৮৮৫ থেকে ১৯৩০। বিষয়ে, ভাবে, ভঙ্গিতে, প্রকরণ পদ্ধতিতে এক পর্যায়ের সঙ্গে অন্য পর্যায়ের স্থূল সূক্ষ্ম মিল ও গরমিল নিয়েও আলোচনা করেছেন তিনি। সে আলোচনা শিল্প-ঐতিহাসিক এবং কলারসিকের। কালীঘাটের পট ইউরোপীয় শিল্পরীতির প্রভাব এবং সমসাময়িক কলকাতার সমাজ সংসার ছায়াপাতও তাঁর নজর এড়ায়নি। কেন, অথবা কেমন করে গ্রামের পটুয়া দেবদেবী আর পৌরাণিক চিত্রের ধ্যানে মগ্ন না থেকে পটে ঠাঁই করে দিয়েছিলেন সমকালের বাস্তব নায়ক নায়িকাদের কিংবা 'চলমান নগরজীবন' তারও রূপরেখা টেনেছেন তিনি। পটের কিছু বাবু, (যথা শ্যামাকান্ত, বা তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি) এবং কিছু বিবি (যথা : রানী লক্ষ্মীবাই বা এলোকেশী, কিংবা বেলুনে উঠেছিল যে বাঙালি মেয়েটি) তাঁদেরও সনাক্ত করতে ভোলেননি তিনি। কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা সত্ত্বেও কালীঘাটের পটের বিবিরা বলতে গেলে অচেনাই থেকে গেছে। কেউ কেউ অবশ্য রূপোপজীবিনী হিসাবে চিহ্নিত, অন্যরা রমণী মাত্র।

হানা কিনিৎসকোভা নামে একজন চেক গবেষক (H. Knizkova) কালীঘাটের ছবি নিয়ে একাধিক রচনায় মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যে-সব ছবিতে দেবদেবী বা পৌরাণিক বিষয় রয়েছে সেগুলোকে একপাশে সরিয়ে রেখে তিনি কালীঘাটের পটকে বিষয়ানুযায়ী ভাগ করেছেন এইভাবে : ক) মোহন্ত-এলোকেশী সংক্রান্ত, খ) ঐতিহাসিক চরিত্রচিত্র, গ) নগরের দৈনন্দিন জীবন, ঘ) প্রতিকৃতি, ঙ) ইউরোপীয়ানদের জীবন, চ) জীবজন্তু এবং ছ) যেসব বিষয় ঠিক সনাক্ত করা যাচ্ছে না। [ আমাদের এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক প্রতিকৃতিগুলো। বিশেষ করে মেয়েদের প্রতিকৃতি। অর্থাৎ, যেসব পট আলো করে আছেন পটের-বিবিরা। ]

কালীঘাটের পটে পুরুষ ও নারী, নায়ক ও নায়িকা দু' দলেরই প্রতিকৃতি রয়েছে। একটি দুটি নয়, বেশ কিছু। কালীঘাটের পটে বলতে গেলে দেব-দেবীর চেয়েও বেশি ভিড় বুঝিবা মানব-মানবীর। আর, সেই ভিড়ে অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে সাজানো প্রতিকৃতি। যেন অন্য ধরনের একটি পোর্ট্রেট-গ্যালারি।

সে-গ্যালারিতে পুরুষের প্রতিকৃতি তুলনায় বেশ কম। পুরুষ-প্রতিমা নেই এমন নয়। তবে প্রায়শ তাঁরা সঙ্গিনী-সহ। বিলিতি চেয়ারে চীনেবাড়ির জুতো পরে বসে কেয়ারি-করা বাউরি চুল মাথায় বাবু সেজেগুজে আপনমনে কোনও তারযন্ত্র বাজাচ্ছেন, কিংবা মোটা কালো বাদামি বর্ডারে বাঁধা পড়েছেন সাহেবি পোশাকে আবক্ষ মূর্তি—এ-ধরনের কয়েকটি ছবি আছে বই কি! সেগুলোও অবশ্যই বাবুর প্রকৃতিচিত্র। নিঃসঙ্গ হলেও এসব ছবিতে তিনি শৌখিনতার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তাঁর আসল চেহারা ফুটে উঠেছে নারীর সংস্পর্শে। পটে বাবু কখনও রূপসী নায়িকার পা জড়িয়ে ধরে তাঁর মানভঞ্জন করছেন, কখনও তাকে জড়িয়ে ধরে সোহাগ করছেন, কখনও বা নায়িকার সঙ্গে পানপাত্র নিয়ে বসেছেন। এখানেই শেষ নয়। কালীঘাটের পটুয়ার তুলিতে বৈচিত্র্যময় ভূমিকা আরও বৈচিত্র্যময়। একটি ছবিতে দেখা যায় তিনি ঢেঁকিতে ধান

৫৪. বঙ্গেয় গৃহলক্ষ্মী। উনিশ শতকে কিন্তু পটে দৈবাৎ দেখা মিলে তার। শিল্পী : রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি তিনি এঁকেছিলেন ১৯১৪ সনে।

A daughter of
rural Bengal.

B. P. Banerjee
1914

ভানছেন, ঢেঁকির মুখে সহযোগীর ভূমিকায় যুবতী রমণী । আর একটিতে একই নায়ককে ধরে টানাটানি করছে দুই নায়িকা । হতে পারে দুই সতীন, আবার এমনও হতে পারে নাগর নিয়ে নগর-কন্যাদের কাড়াকাড়ি ! নবীন এলোকেশী অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ । আঁশকাটা বঁটিতে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার সেই বাস্তব ঘটনা বাদ দিলে, আর একটিমাত্র ছবিতে দেখেছিলাম বাবু বিবিকে লাঞ্ছনায় উদ্যত, তার উদ্ধত পুরুষ হাতে জুতো ! এই ছবিটি বাদ দিলে পটের বাবু শ্রীকৃষ্ণের মতোই অক্লান্ত প্রেমিক । নায়িকা পেছন থেকে দু' হাতে চোখ চাপা দিয়ে তাঁর সঙ্গে রহস্য করছেন, এমনকি হাটের মেছুনির সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা জড়তা নেই তাঁর । কালীঘাটের পটে কিছু বাংলা প্রবাদ চিত্রিত হয়েছে । যেমন—ঘোরকলি, কিংবা 'বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর নৃত্যন', অথবা 'বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা ।' পটুয়ার তুলিতে ব্যঙ্গের চাবুক । সেই বিদ্রূপেরই অন্য প্রকাশ দেখা যায় দুটি ছবিতে । একটিতে বাবু সুন্দরীর হাতে ভেড়ায় পরিণত, অন্যদিকে ভূতলশায়ী বাবুর বুকে স্থাপিত সংহারিণী রমণীর একটি পা । কলকাতার বাবুদের পতন এবং নগরে বিলাসিনী রমণীর উত্থানসংবাদ সরবে ঘোষিত এই দুই ছবিতে । কালীঘাটের পটুয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন কলির এই শহরে মায়াবিনী আর রঙ্গিনীরাই সব, বাবুরা সম্পূর্ণত তাঁদের মন্ত্রমুগ্ধ । অথবা পদানত ।

কালীঘাটের পটে অতএব রমণীর প্রতিকৃতিই বেশি । বলতে গেলে অসংখ্য । দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে যেতে দোষ নেই । আয়না হাতে বসেছেন সালঙ্কৃত সুন্দরী । তাঁর অন্য হাতে গোলাপ । আসনে বসা সুন্দরীর কোলে ময়ূর । একাকিনী দাঁড়িয়ে সুন্দরী রমণী ; চোখে কটাক্ষ । গোলাপ সুন্দরী । হুঁকো সুন্দরী । সেতারবাদিনী । কেশচর্চা করছেন রূপসী । ফরাসে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন রূপবতী অলসকন্যা । এক হাতে তালপাতার পাখা, অন্য হাতে তাজা গোলাপ নিয়ে আর এক সুন্দরী । চেয়ারে বসে এক উদাসিনী । দুই নর্তকী । দুই সখী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে । আরও কত রূপেই না ! একটি ছবিতে রয়েছে ঘাঘরা-পরা এক সুন্দরী । ঘাঘরার একটি কোণ এক হাতে ধরা । মনে হয় শহরের বাঈজী-বিলাস সংবাদও আদি গঙ্গার তীরে বস্তীবাসী পটুয়াদের অজানা ছিল না । আর একটি প্রতিকৃতিতে ডোরাকাটা শাড়ির আড়ালে যেন বিদেশিনীর ইশারা । তাছাড়া ফ্রক-স্কার্ট পরা সুন্দরীও আছেন । আছেন পরীরাও । উড়ন্ত পরী । নাচের ভঙ্গিতে পরী ।

পরীদের কথা পরে । তার আগে বাঙালি মেয়েদের একটু খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া দরকার । এঁরা কারা ? কী তাঁদের পরিচয় ? এককালে নাকি এই বাংলাদেশেও ঘটক-ঘটকীরা বিয়ের সম্বন্ধের জন্য কনেদের পট নিয়ে সম্ভাব্য বরের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতেন । কনেরাও দেখার সুযোগ পেতেন বরের প্রতিকৃতি । রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের সূত্রপাত নাকি এভাবে আলেখ্য যোগেই । সে-কারণেই পূর্বরাগের প্রথম পর্বের শিরোনাম—'চিত্র দর্শন ।'—"কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখাইলে চিত্রকরী, প্রাণ মম নিল যে হরি ।/ বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট, মোরা বলেছিলাম সে-বড় লম্পট ।" চণ্ডীদাসের বয়ান—"হাম সে অবলা, সরলা অখলা—ভালমন্দ নাহি জানি । বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখলে আনি ॥" দীনেশচন্দ্র সেন মশাই জানিয়েছেন বাংলার পল্লীগীতিতেও কখনও কখনও দেখা যায় প্রেমপ্রণয়ে বা সঙ্গিনী সন্ধানে পটের ব্যবহার । 'মুকুট রায়'-এর উপাখ্যানে দেখা যায় তাঁর জন্য নানা মুলুক থেকে সংগ্রহ করে আনা হচ্ছে রাজকন্যাদের পট । কিন্তু নায়কের কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না ।

কালীঘাটের পটের-বিবিদের সম্পর্কে বোধহয় সে-কথা বলা যাবে না । কারও পছন্দ না-হলে নানা ভঙ্গিতে তাঁদের আঁকা হবে কেন, আর কেনই বা শতবর্ষ পরেও তাঁদের নিয়ে এই লেখালেখি ?

বিবিদের প্রতিকৃতিগুলো দু' ধরনের । কিছু ছবিতে তাঁরা পুরো চেহারা নিয়ে হাজির নেই । শরীরের

৫৫. আধুনিক বিনোদিনী । উনিশ শতকের কালীঘাটের শিল্পীর চোখে ।

কাঠামোটি কোমরের নিচে কিছুদূর নেমেই হঠাৎ শেষ। নিতম্বের আভাস থাকলেও সে ধরনের প্রতিকৃতিগুলো পূর্ণাবয়ব নয়। অন্যগুলোতে সুন্দরীরা পুরোপুরি প্রকাশিত। কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে। বসার ভঙ্গিটি সব সময় এক রকম নয়। কখনও ফরাসে আসীন পুরুষদের মতো করে বসে, কখনও হাঁটু মুড়ে (সাধারণ বাঙালি মেয়েরা যেভাবে বসেন), কখনও বা বাবুদের মতো পায়ের ওপর পা তুলে কেদারায়। বিদেশিনী এক গবেষক বলছেন—সব সময় ছবি দেখে বোঝা যায় না কার কী পরিচয়। তিনি কালীঘাটের শিল্পীদের রূপকল্পে ক্লাসিক্যাল ভারতীয় শিল্পের আভাস পেয়েছেন। বলেছেন—সমকালের উচ্চকোটির শিল্প, অর্থাৎ রাজপুত বা মুঘল মিনিয়েচারের প্রতিকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তাঁদের। হয়তো বা বাংলার নবাব পরিবারের প্রতিকৃতিও দেখে থাকবেন ওঁরা। সেই সূত্রেই হয়তো বাঙালি সুন্দরীর হাতে উঠেছে গোলাপ। বাদাম বা ডিম্বাকৃতি প্রতিকৃতিগুলো তাঁর মতো পশ্চিমী প্রতিকৃতির প্রভাবে সৃষ্টি। আর, গড়ন ইত্যাদিতে রয়েছে বাংলার টেরাকোটার সেই সুডৌল পেলব ভঙ্গিটি।

এসব আলোচনা মূলত নন্দনতাত্ত্বিক। যেকোনও চিত্রের মতো কালীঘাটের পটের রঙ, রেখা, দৃশ্যসংস্থান গড়ন এবং রূপ-নির্মাণও—রসিকের কাছে নিশ্চয়ই জরুরি বিচার্য। এখানে আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয়—পট নয়, পটের বিবিরা। তাঁদের বিশেষ রূপ আর ভাব। এ সম্পর্কে খুব কম চিত্ররসিকই বোধহয় আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি একটি ব্যতিক্রম চোখে পড়ল। (কালীঘাট পটস অ্যান্ড উকিও-ই প্রিন্টস্, শান্ত দত্ত। ইন্ডিয়ান হোরাইজনস, সংখ্যা-৩, ১৯৮২) লেখক দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিককার টোকিও শহরের সঙ্গে উনবিংশ শতকের প্রথম দিককার কলকাতার প্রেক্ষাপটের যেন হুবহু মিল। বাংলার মতোই জাপানের সামাজিক-অর্থনৈতিক নকশা তখন তছনছ হয়ে গেছে। নতুন টোকিওতে ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। পুরানো দিনের সম্ভ্রান্তরা বিপন্ন। শহরে নব্য-ধনীদের আধিপত্য। দ্রুত মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে। ধনিক-বণিক নাগরিকেরা বিলাসিতায় মত্ত। সেই চলমান অসার জগতের ছবিই সেদিন ধরতে চেয়েছিলেন টোকিওর শিল্পীরা।সে-সব ছবিতে লেখা হয় আছে নবীন নগরে নবযুগের নায়ক-নায়িকা সংবাদ, তাদের ভোগ-লালসার নির্লজ্জ নির্মম ইতিকথা। লেখকের সিদ্ধান্ত : একশ' বছর পরে কলকাতায় প্রায় একই ধরনের পরিস্থিতি। এবং কালীঘাটের ছবিতে যেন টোকিওরই প্রতিচ্ছবি। এসব ছবি আসলে নানা রঙে অমাবস্যার গান। এ ছবির রূপসীদের পরিচয় একটাই, তাঁরা পণ্যা।

কালীঘাটের পটের বিবিদের ওপর চোখ বুলালে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না তাতে। গোলাপ রূপের প্রতীক। সৌরভের ইঙ্গিত তার প্রস্ফুটিত পাঁপড়িতে। কিন্তু যে মেয়েটি এভাবে হাতে গোলাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে, তার রূপ কিন্তু প্রতীকী নয়, সুডৌল অঙ্গের লাস্যময় ভঙ্গিতে, মদালস চোখের ভাষায় অতিমাত্রায় প্রকাশ্য। কালীঘাটের পটে রূপসীর উত্তমাঙ্গ কখনও খোলা, কখনও ঢাকা, কখনও বা আধখোলা। শিল্পীরা যেন আলঙ্কারিকদের সেই পরামর্শটি জেনে গেছেন,—"অন্ধ্র রমণীর স্তনের মতো ব্যঙ্গার্থ যদি অত্যন্ত প্রকাশিত হয়, আবার গুর্জর রমণীর মতো ব্যঙ্গার্থ যদি অত্যন্ত অপ্রকাশিত হয় তাহলে ব্যঙ্গার্থের কোনও চমৎকারিতা থাকে না। একমাত্র মরহট্ট রমণীর স্তনের মতো ব্যঙ্গার্থ যদি খানিকটা প্রকাশিত খানিকটা অপ্রকাশিত হয় তবেই ব্যঙ্গার্থ চমৎকারী হবে।" (দ্রষ্টব্য : কাব্যতত্ত্বালোক, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য)। যদিও বাঙালিনী, এইসব রূপতত্ত্ব নগরের প্রমোদকন্যাদের অজানা থাকার কথা নয়। ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস'-এ 'মাতা' অর্থাৎ প্রবীণা রঙ্গিণী বিদ্যাদান করছেন নবীনাকে : "তোমার রূপলাবণ্য এ-পর্যন্ত, আছে তথাচ প্রত্যহ প্রাতে উবটান বৈকালে সাবান দ্বারা অঙ্গ মার্জিত করিয়া দাঁতে মেশী ও মাথায় মাথাঘষা সোন্ধা দিয়া আতর গোলাব লাগাইয়া গহনা পরিয়া উত্তম মিহি কাপড় পরিধান করিবা এবং প্রতি কথায় রস দেখাইয়া তাহাতে যেন গায়ের লোমাদি এবং নিতম্বের প্রতিকৃতি দেখা যায় এইরূপ বেশভূষা করিয়া বাবুজন

সহিত আমোদ প্রমোদ করিবা…তুমি লোকের নিকট সম্ভ্রমে অম্বর সম্বরণ করিয়া অথচ সম্ভ্রমে ভ্রম উপলক্ষ করিয়া অঙ্গভঙ্গ আর ২ রঙ্গস্থান সকলি দেখাইবা এরূপ ছেনালি করিলে কে না বশ হয়… ।” কালীঘাটের অনেক ছবিতেই সেই 'ছেনালি'র আভাস । তবে কোথাও রুচিকে আহত না করে, শিল্পের শর্ত মেনে নিয়ে । কেনেথ ক্লার্ক পশ্চিমের শিল্পকলায় 'নুড' বা আবরণ আভরণহীন মানব-মানবীর প্রতিমা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন ভারতীয় ভাস্কর্যে শিল্পরা বস্ত্রের আভাসমাত্র দিয়েও আসলে নারীর নগ্নরূপকেই দর্শকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন । কালীঘাটের পটুয়ারা কিন্তু তাঁদের পটের রূপসীদের যক্ষিণী বা সুরসুন্দরীর মতো পরিবেশন করেননি । এদের সঙ্গে শুধু গহনা নয়, ছন্দের মতো জড়িয়ে রয়েছে শাড়ি । তবু ক্ষিপ্র রেখার উত্থান পতনে, গড়নে, লাবণ্য এবং ভাবযোজনায় তাঁরা গোপন রাখেননি এইসব চিত্রাবলী নারীদেহেরই বন্দনা । অনেক ভঙ্গিতেই ওঁরা ধরেছেন পটের বিবিকে, সব ভঙ্গিতেই স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে, ভবানীচরণ যাকে বলেছেন—'অঙ্গভঙ্গ আর ২ রঙ্গস্থান ।' এ ছবি গ্রামের পটুয়ার মাতৃবন্দনা নয় । মাতৃরূপে, প্রাকৃতিক তথা জৈবিক নিয়মেই, বিশেষ বিশেষ গড়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । বাংলার টেরাকোটায় সে-ধরনের জননীর অভাব নেই । এই লাস্যময়ীরা তাঁদেরই কন্যা হয়তো, কিংবা অন্য কোনও আপনজন, কিন্তু সন্তান ধারণ বা লালন নয়, নগরে স্পষ্টতই তাঁরা অন্য ব্রতচারিণী । এঁরা অক্ষয়যৌবনা, চিরকুমারী । তাঁদের শৃঙ্গার, তাঁদের গীতবাদ্য নৃত্য, তাঁদের বাসরসজ্জা, অভিসার, আলিঙ্গন, সবই সেই ব্রতেরই অনুষ্ঠান । এ-ছবিতে প্রেম নেই । এই রূপমতীরা প্রত্যেকেই কাম-প্রতিমা । প্রসঙ্গত মনে পড়ছে নববিবির 'মাতার' উক্তি—“প্রেম

৫৬. কে ওরা ? বিদেশিনী অথবা এ-দেশেরই এই দুই সোহাগিনী ? একসময়ে শোভা পেত বাবুর রঙমহলে ।

যাহাকে প্রীতি বলে তাহা ঈশ্বরের সঙ্গেই ভাল, ইহা কেবল যোগীরাই পারেন নচেৎ অন্য প্রেম কপট প্রেম---অতএব বাছা, আমারদিগের প্রেম যাহা হইতে অধিক টাকা পাওয়া যায় তাহাদিগেরই সহিত প্রেম হয়, কিন্তু তাহাও নিপট প্রেম নয়, সেই কপট প্রেম জানিবা ।"

প্রেম নেই । এই পাষাণপুরী 'মুদ্রারূপ অপেয় অগাধ জলে পরিপূরিতা' । সে-জলে এক ধরনের মাৎস্যন্যায় চলেছে । তারই মধ্যে বাবুদের কামকেলি । লক্ষণীয়, কালীঘাটের ছবিতে প্রেম না থাকলেও এই কাম-প্রতিমারা স্থূলার্থে রিরংসা উদ্দীপক নন । কেনেথ ক্লার্ক অবশ্য বলেছেন যে দেহরূপ কিছু পরিমাণে হলেও কামানুভূতি সঞ্চারিত না করে শিল্প হিসাবে ব্যর্থ,—'ইট ইজ ব্যাড আর্ট অ্যান্ড ফলস্ মর‍্যালস্ !" কালীঘাটের পটের বিবিরা সেই রস-বিচারে নিশ্চয়ই ব্যর্থ নন । কিন্তু তাঁদের সরাসরি কামকলাবতী আখ্যা দেওয়া বোধহয় অসঙ্গত । সত্য, যাকে বলে আদিরসাত্মক কামচিত্র, সে-ধরনের কিছু কিছু ছবিও চিত্রিত হয়েছিল কালীঘাটে । কোনও কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহে তার কিছু কিছু আমরা দেখেছি । কিন্তু সে-সব ছবি বাৎস্যায়নের প্রচারিত বিদ্যার চিত্ররূপ নয়, কামপরবশ কপট ধর্মীয় পুরুষদের ব্যঙ্গচিত্র মাত্র । রমণী সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল কপট ব্রহ্মচারী কী করছেন, মেয়েরা কীভাবে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করছেন তা-ই বর্ণিত হয়েছে সেসব ছবিতে । একটি মাত্র ছবিতে দেখেছিলাম ঘোড়ামানুষ ছুটে চলেছে শাড়িপরা এক পটের বিবিকে নিয়ে । সে-নেওয়া কেড়ে নেওয়া । পুরো রূপকল্পটি এখন আর মনে নেই । তবে এটুকু মনে আছে তখন অনুমান করেছিলাম—হয়তো কোনও বিদেশী ছবির অনুকরণে লেখা । সাদা কথায় যাকে বলে 'অশ্লীল ছবি', কালীঘাটের সে-ঘরানার কোনও ছবি নেই । বাংলার মন্দির টেরাকোটায় আছে । কিন্তু কালীঘাটে ছিল না । এই সব অসামান্য সামান্য নারীদের সৃষ্টিকর্তাদের বাহাদুরি সেখানেই ।

কোনারকের রমণীদের সম্পর্কে বলা হয় তাঁরা বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত । তার আগে পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্যে যে অপরূপ নারীপ্রতিমা তাঁরা স্থাপত্যের অঙ্গ, বলতে গেলে সমগ্র পরিকল্পনায় অলঙ্কারের মতো । কোনারকে এসে নারী দেহ এই প্রথম পেল একান্ত আপন নিজস্ব পাদপীঠ । নারী সেখানে আপন শরীর সত্তায় ভাস্বর । তাছাড়া, মিথুন মূর্তিতেও তার রূপ অন্য, নিথর নিস্পন্দ গ্রহীতা মাত্র নয়, উত্তেজিত আলোড়িত মগ্ন নায়িকা । কালীঘাটে সে-প্রাণচাঞ্চল্য খুঁজে পাওয়া ভার । কেননা, আগেই বলা হয়েছে এঁরা প্রমোদ-কন্যা মাত্র । জাপানী-পট আর কালীঘাটের পটের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক আরও একটি কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের—রাজপুত কিংবা মুঘল মিনিয়েচারের সুন্দরীদের সঙ্গেও পার্থক্য রয়েছে কালীঘাটের পটের বিবিদের । এ-ব্যাপারে অবশ্য কিছু পরিমাণে সহায়ক হয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণ এবং গোপিনীরা । অনেক লীলাই তাঁদের ছদ্মবেশে । কখনও বা রাগরাগিনীর মূর্ত প্রতিকৃতিতে । যেখানে সব

৫৭. সখি পরিবৃত বিদ্যার ঘরে সহসা সুন্দর । উনিশ শতকের চিৎপুরের কাঠখোদাই ।

ছদ্ম-আবরণ একপাশে সরিয়ে রেখে তাঁরা সরাসরি নায়ক নায়িকার চেহারায়, তখনও কিন্তু মনে হয়না নায়িকারা সামান্য রমণী। মনে হয় নায়কের কোনও প্রিয় অনুরাগিণী। এমন কি মনে হতে পারে কোনও অন্তঃপুরিকা হয়তো। কালীঘাটে সে বিভ্রম ঘটার উপায় নেই। সেটা আরও বোঝা যায় মঙ্গলকাব্যাশ্রিত বাংলার পটের, কিংবা টেরাকোটার বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে এঁদের মিলিয়ে দেখলে। টেরাকোটায় অবশ্য তাঁরা অলঙ্কার মাত্র। তাছাড়া রমণীরূপ সেখানে স্বল্প পরিসরে বিবৃত। একই গড়ন, একই ডৌল। সেই মাথাভরা কালো চুল। সেই ডাগর আঁখি। সেই ত্রিভঙ্গ। তবু টেরাকোটার নর্তকীর সঙ্গে কালীঘাটের বোনদের কোথায় যেন অমিল। একদল মন্দিরের অলংকার। সে-মন্দির চারপাশের মানুষ আর প্রকৃতির প্রতিবিম্ব। জীবনের ছন্দ আর স্পন্দন সেখানে স্পর্শগ্রাহ্য। কালীঘাটও অবশ্যই পুণ্যপীঠ। কিন্তু তার চারপাশ ঘিরে কলির শহর। পাপীনগর। সুতরাং, টেরাকোটার রমণী হয়তো কলকাতায় আরও মুক্ত, আরও স্পষ্ট, আরও উচ্চারিত, কিন্তু সে-স্বাতন্ত্র আসলে অলীক মায়া। যেন যাত্রা থিয়েটারের কোনও দৃশ্য। কোনও

কোনও নায়িকার প্রেক্ষাপটে রঙ্গমঞ্চের আভাস। এই তরঙ্গিণী দৃশ্যান্তরে কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে! টেরাকোটার নারীপ্রতিমার সঙ্গে এদের দূরত্ব কতদূর সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায় পটের মেছুনিদের দিকে তাকালে। ঝুড়িতে সাজিয়ে রাখা মাছগুলো নয়, সে নিজেই বুঝিবা পসরা। বাবু রঙ্গরসিকতা করছেন তাঁর সঙ্গে,—দোরসা মাছ বেচতে এসে মেছুনি তোর গোমর ক্যানে? টেরাকোটায় মাছ কুটছেন যিনি তিনি কিন্তু নির্ভুলভাবে গৃহস্থবধূ। এ মাছ তাঁর সন্তান খাবে, নিজের হাতে তিনি পরিবেশন করবেন স্বামীর পাতে। ধানভানার দৃশ্যেই না কত দৃশ্যান্তর। সেজেগুজে বাবু যখন ঢেঁকিতে পা রাখেন তখন বুঝতে বাকি থাকে না ঢেঁকির অন্য প্রান্তে বসা রসবতীর সঙ্গে রসিকতা করছেন নাগর,—বুকে তার ঢেঁকির ওঠানামা! টেরাকোটায় যে পেশাদার নর্তকী সহজ স্বচ্ছন্দ, কলকাতা নামক পাষাণপুরীতে বুঝিবা থেকে থেকে তাঁরও তালভঙ্গ। কেননা নববিবি কিংবা নববাবু বিলাস-এর পাঠকরা জানেন এই রূপের হাটে নাচগানেরও কদর ছিল বটে, কিন্তু বাবুদের প্রধান আকর্ষণ অন্যত্র। নববিবির 'মাতা'র অতএব পরামর্শ—"গান শিক্ষা করে আর নাহি প্রয়োজন। যৌবন দেখিলে বশ হবে প্রিয়জন ॥ গানগুণে তুমি যদি নিপুণ না হও। তথাপি যৌবন গুণে তুমি ন্যূন নও ॥"

কালীঘাটের আদলে বটতলার কাঠখোদাই শিল্পীরাও উনিশ শতকে কিছু পটের-বিবি সৃষ্টি করেছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁদের প্রেরণা ছিল কালীঘাটের পটুয়াদের সাফল্য। তবে এ-পাড়ায় প্রতিকৃতি কম, শিল্পীদের প্রতিভা ব্যয়িত হয়েছিল প্রধানত মহাকাব্য কিংবা পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্রায়ণে। কখনও বা কালীঘাটের মতো চলতি কোনও বাংলা প্রবাদের চিত্রভাষ্য। পৌরাণিক ছবিগুলো প্রায়শ চিত্রাদর্শে রাজপুত মিনিয়েচারের স্থানীয় রূপান্তর। কি দৃশ্য সংস্থানে, কি চরিত্র রূপায়ণে। ফলে মেয়েদের পোশাক-আসাক অনেক ক্ষেত্রেই রাজপুতানীর মতো। এসব ছবিতে কলকাতা আবহ সৃষ্টি করেছে কলোনিয়াল স্থাপত্য। দৈবাৎ কোনও কোনও ছবিতে বাঙালিয়ানা। ভাইফোঁটার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। সুন্দর একটি গার্হস্থ্য চিত্র। ভাই বোন দু'জনই ষোলআনা বাঙালি। যেন টেরাকোটারই রকমফের।

বটতলার কাঠখোদাইয়ের দিকে ইদানীং অনেকেরই নজর পড়েছে। প্রায় সব ছবিই মোটামুটি তালিকাবদ্ধ, বলতে গেলে অধিকাংশই প্রকাশিত। (দ্রষ্টব্য: উড ব্লক প্রিন্টস অব নাইনটিনথ সেঞ্চুরি ক্যালকাটা, সম্পাদনা অসিত পাল)। নতুন করে পাতা ওল্টাতে গিয়ে চোখ আটকে গেল দু'জোড়া প্রতিকৃতিতে। প্রথম যুগলে রয়েছেন 'রসরাজ' আর 'রসমঞ্জরী'। দ্বিতীয়টি ঠিক যুগলবন্দী নয়,—মুখোমুখি দুটি স্বতন্ত্র চিত্রে নায়ক এবং নায়িকা। দু'জনই আমাদের চেনাজানা। একজন 'দূতী বিলাস'-এর নায়ক শ্রীদেবনাগর, অন্যজন তাঁর প্রেমিকা অনঙ্গমঞ্জরী। অনঙ্গমঞ্জরী এই কাব্যে শহরের একজন কুলবধূ। তিনি বাবুদের বাড়ির অসতী বউ। শ্রীদেবনাগর নগরেরই মধুসন্ধানী কোনও ভ্রমর। কাব্যে নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনায় যে বাহুল্য, নায়ক নায়িকার ছবিতেও তা-ই।

দেখে মনেই হয় না বাঙালি যুবক যুবতী। নায়িকার কোলে যথারীতি তুলে দেওয়া হয়েছে একটি ময়ূর। এ-প্রতিকৃতি সমসাময়িক রূপ-কল্পের সঙ্গে সম্পর্কহীন। এ যুগলকে বিদ্যা আর সুন্দরের ভূমিকায়ই বোধহয় মানায় ভাল। এ-ছবির আদর্শ বাঙালি রূপসী নয়, শহরের বাবুমহলে তখন যে নব্যরুচির হাওয়া, রূপ রুচি ভেদ এই পটের-বিবি তারই বার্তাবহ। আবার স্মরণ করতে হয় ভবানীচরণকে। তাঁর কলমে প্রাচীনা নবীনাকে বলছেন—"দেখ কলিকাতার রাড় মহলে হিন্দু বিবিরা মুছলমানীর চলন বলন সকল ধরিয়াছে, তাহারা আপন ২ পছন্দ মত চুল কাটিয়া জুলপী বাহির করেন এবং মেশী দাঁতে দিয়া দোফের করিয়া কাপড় পরিয়া পাছার বাহার দেখান এবং আপন ২ পছন্দমত পোষাক বিবিধ প্রকার প্রস্তুত করেন, যথা: পাজামা, আঙ্গিয়া, কুরতি, দোপাট্টা, আস্তিন, জালি, কুরতিজালি, কাটোয়া জালি এবং আস্লিদার জোড়া ইত্যাদি।"

এ-নায়িকা যদিও সামান্যা নন, কুলটা মাত্র তবু তাঁর দিকে তাকালে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের চিত্রিত রূপবতীদের কথা।

রসরাজ এবং রসমঞ্জরীর ছবিটিও একই ঘরানার। বস্তুত হু-বহু একই আদলে সাহেব-মেম নিয়েও কাঠখোদাই রয়েছে একটি। অনঙ্গমঞ্জরীর মতো আলবোলার নলধারিণী এই রসমঞ্জরীও স্পষ্টতই নগরে নবাগতা। বোঝা যাচ্ছে, ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ। কলকাতার বাবুরা তো অবশ্যই।

লক্ষণীয় ব্যাপার এই, বাবুরা কিন্তু ঘুরে ফিরে দেহ মন সমর্পণ করেছিলেন বাঙালি বিবিদের আসরেই। আবার সেই কালীঘাটের পট। আবার সেই পটের-বিবিরা। কালীঘাটের পটে বিবিবিলাস তুঙ্গে নাকি তৃতীয় পর্বে, অর্থাৎ ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫'র মধ্যে। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শহরে লিথোগ্রাফির প্রসারের যুগ। আর, সেই সূত্রে আসরে আবির্ভূত হলেন আর এক ঝাঁক পটের-বিবি। এঁরা বলতে গেলে কালীঘাটের রূপসীদের বোন। অবশ্য আসর জমিয়েছিলেন তাঁরা নগরের অন্যপ্রান্তে কাঁসারিপাড়া আর চোরবাগানে।

প্রায় একই ধরনের প্রতিকৃতি। সেই সুডৌল গড়ণ। সেই লাস্য। সেই ভ্রূভঙ্গ। সেই গোলাপ। সেই হুঁকো। নাগরের জন্য সেই প্রতীক্ষা। এঁরা আলাদা আলাদা ভাবে চিত্রিত নন, শিল্পীর কল্পনার মুদ্রিত রূপ—এই যা। তবু দেখবার মতো বই কি!

ইনি বাবুদের চিত্তহারিণী রানীসুন্দরী। পায়ে মল। পুষ্ট বাহুতে অনন্ত। আটপৌরে মিহি শাড়ি। কালো চুলে খোঁপা। ডাগর চোখ। হাতে রুপো বাঁধানো হুঁকো। নিচে কার্পেট। পেছনে বাহারি পর্দা। সমস্ত শরীরে নিমন্ত্রণ নিয়ে রানীসুন্দরী বাবুদের অপেক্ষায় যেন।

গুরু নিতম্ব। পীন পয়োধর। পায়ে আলতা। চাঁদমুখের বারো আনা দর্শকের সামনে। শরীরে ঢেউ। কার্পেটে বসে একটি পা মুড়ে পান সাজছেন যিনি চিত্রকর নাম দিয়েছেন তাঁর—কামদাসুন্দরী গোপাল-সুন্দরী নাম যাঁর তিনিও গোলাপ হাতে বসে আছেন প্রতীক্ষায়। প্রমোদাসুন্দরীর কালো চুলে চিরুনি। রাত্রির প্রস্তুতি। কালীঘাটের পটের বিবিকে ঘিরে তবু সংশয় দেখা দিতে পারে। সে-সংশয়ের মূলে গ্রামের পটুয়ার তুলির স্পর্শ। তাঁদের সহজাত রূপচেতনা, মাত্রাবোধ কখনও দৃষ্টিকে লাঞ্ছিত করে না। প্রমোদ-কন্যারা সহজ সুন্দরীর বিভ্রম জাগায়। কিন্তু এ-পাড়ার রঙিন লিথোগ্রাফে কোনও রাখ ঢাক নেই। নেই কোনও রঙ রেখার নান্দনিক আব্রু। শিল্পী সরাসরি বলেই দিচ্ছেন এঁরা জনপদবধূ। নিশীথ-নগরীর এঁরাই রানী, ফুল্ল কুমুদ, প্রস্ফুটিত গোলাপ, এঁরাইপ্রমোদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পরবর্তীকালে এই সব ছাপাখানা থেকেই বেরিয়েছিল আরও কিছু প্রতিকৃতি। সেগুলো আরও জমকালো। কেননা, ইতিমধ্যে হাওয়া-বদল হয়েছে। বাঙালি রূপসীর অঙ্গে উঠেছে জ্যাকেট, বডিস। শাড়িতেও এসেছে বৈচিত্র্য। মুখে সুচারু লালিত্য। ঘরে তার বিদেশী কুপিড। চিত্রিত দেওয়ালে বিদেশী ঘড়ি। আসবাবও অন্যরকম। মনে হয় বাগানবাড়ির কোনও সুসজ্জিত ঘর। সেতার নয়, সালঙ্কৃত রূপসীর আঙুল খেলা করছে হারমোনিয়ামের রীড-এ। ছবির তলায় পরিচয় তাঁর—অনুরাগিনী। পাছে কেউ বুঝতে না পারেন, তাই ইংরেজিতে আরও একটি কথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে—'পিটি!' বাঙালি এই সাজ দেখে বাবুদের দয়া হত কি, নাকি মদন আগুন দ্বিগুণ?

এই সিরিজের আর এক রূপসী সুশীলা সুন্দরীর আর এক নাম—'মডেস্টি'। তার সাজপোশাকে ভাবভঙ্গিতে কিন্তু নম্রতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বরং সব কিছুতেই উগ্রতা। হাতে দর্পণ। প্রায় খোলা বুক। সুশীলা সুন্দরী যেন নিজের রূপ দেখে নিজেই মুগ্ধ! পাহাড়পুর-ময়নামতীর পোড়া মাটির ফলক থেকে শুরু করে মন্দির-আকীর্ণ গ্রামবাংলার সবুজ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে কালীঘাটের পটোপাড়া হয়ে কাঁসারিপাড়া-চোরবাগানে পৌঁছানোর পর বোধহয় আর কণামাত্র সন্দেহ থাকে না যে, দিন সত্যই বদলে গেছে। কয় দশকের মধ্যে

## BRONZED ORNAMENTAL CAST-IRON GARDEN FOUNTAINS.

### BRONZED C. I. FIGURES.

"DOLPHIN AND MAID."

No. 29. Height 63½ inches to underside of Jet.

Rs. 220

A "STUDY."
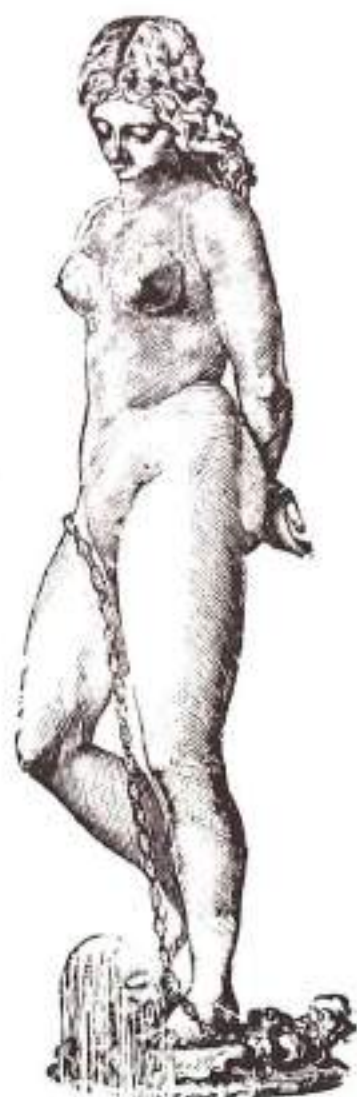
ANDROMEDA.

Height 60 inches.

Andromeda, daughter of Cepheus, king of Aethiopia and Cassiopeia.

As her mother boasted that in beauty Andromeda excelled the Nereids, Poseidon sent a sea monster to ravage the country. The oracle of Ammon prescribed that Andromeda should be given up to the monster to save her country, but Perseus turned it to stone with the Gorgon's head, saved her, and afterwards married her. After death she was placed among the Stars. The story is told in Ovid's Metamorphoses.

Rs. 2,500 each.

"SLAVE."

No. 7. Height 74 inches to underside of Jet.

Rs. 275

নবযুগের পটের বিবিরা যেন কালীঘাটের সুন্দরীদের কেউ নয়। কি চেহারায়, কি চরিত্রে। এই দুই বিবি ভবানীচরণের বিবরণে নেই। বটতলার প্রহসনেও বোধহয় এঁদের খুঁজে পাওয়া শক্ত। মনে হয় এঁরা হয়তো বা পরবর্তীকালের 'আধুনিকাদেরই' সর্বজনীন সংস্করণ!

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যদিও এইসব পটের বিবি ছিলেন অতিশয় সুলভ এবং সহজলভ্য, বাবুরা কিন্তু এঁদের বিশেষ সমাদর করতেন না। আমরা বিবিদের কথা বলছি না, কথা হচ্ছে পটের বিবিদের নিয়ে। উনিশ শতকের এই নতুন গৌড়ীয় রমণী তো বলতে গেলে তাঁদেরই ধ্যানের তিলোত্তমা। অতএব বিবিদের আদর আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি ছিল না। সেটা এক কথা,আর এইসব শস্তা ছবি নিয়ে মাতামাতি অন্য ব্যাপার। কিছু কিছু এমন বাবু নিশ্চয়ই ছিলেন যাঁরা কায়ায় বিশ্বাসী ছিলেন, ছায়ায় নয়। চিত্রকলার রসগ্রহণের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এমন কি কলমে লেখা ছবিও ছিল কারও কারও নাগালের বাইরে। বঙ্কিমচন্দ্রের আঁকা কিছু কিছু ছবি এই রচনায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। বিষবৃক্ষে 'স্তিমিত প্রদীপে' অধ্যায়টি পড়ে সেকালের একজন সমালোচক লিখেছিলেন—"এই শিরোভূষণের প্রস্তাব পড়িতে পড়িতে চিত্রপট বর্ণনার ঘটা দেখিয়ে মনে হয়, যেন আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে যাইতে যাইতে এক এক পয়সা দিয়া পটলডাঙ্গার দিঘীর ধারে শহর-বিল দেখিতেছি। প্রদর্শক ঘণ্টা বাদন করিয়া আমাদিগকে তাহা দেখাইতেছে।...উল্লেখিত লেখক রমণীমূর্তি অলঙ্কৃতা করিতে গিয়া তাহার উরুদেশে মেখলা দিয়াছেন। আমরা নিতম্বে সর্বত্র মেখলা দেখিয়াছি, উরুদেশে কোন রাজ্যে দেখি নাই। শুনিয়াছি, অতঃপর তিনি কর্ণে কণ্ঠহার ও গলদেশে বলয় পরাইয়া আবকারি মহল হইতে সুবর্ণ পদক পারিতষিক লইবেন।" তিনি আরও লিখছেন—"ঐ লেখক স্থানে স্থানে সর্বদাই রমণীমূর্তিতে বঙ্কিমগ্রীবা শব্দ দিয়াছেন। লড়ায়ে কার্তিকের মত, স্ত্রীলোকের বঙ্কিমগ্রীবা হইলে যেরূপ সুন্দর সেখানেও আপনারা তাহা অনুভব করিয়া লইবেন।" (সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, হরনাথ ভঞ্জ) সুতরাং, বুঝতে অসুবিধা নেই, একালের মতো সে-কালেও অরসিকের অভাব ছিল না।

তবে কালীঘাট বা চিৎপুরের ছবি সম্পর্কে বড়মানুষদের অনাগ্রহের পেছনে অন্য কারণও থাকা সম্ভব। একালে কালীঘাটের পটকে যাঁরা শিল্প-চাতুরির জন্য সমাদর করে গ্রহণ করেছেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁদের একজন। বটতলার লিথোগ্রাফির ওপরও তাঁর নজর পড়েছিল। আধুনিক শিল্প-রসিকেরা হয়তো তাঁর বিচার এবং বিশ্লেষণে ঘাটতি অথবা ত্রুটি খুঁজে পাবেন। তবু বাঙালিবাবুর শিল্পরুচি পরিবর্তনে দীনেশচন্দ্র সেন মশাইয়ের অবদান নিশ্চয়ই তুচ্ছ করার মতো নয়। কালীঘাটের পটুয়াদের ছবি কিংবা লিথোগ্রাফি সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—"আর্ট স্টুডিয়ো হইতে বৎসর বৎসর যে সকল পৌরাণিক চিত্রাবলী বাহির হয় কালীঘাটের পয়সা পয়সা পটের সহিত—কাগজের উৎকর্ষ ও বর্ণবৈচিত্র্যের অধিকতর ঘনঘটা ভিন্ন—তাহার প্রভেদ অল্পই; এবং তাহা দেখিয়া মনে বড় আশার সঞ্চার হয় না। কারণ, ঐ সকল বিচিত্র বর্ণে চিত্রে কোথাও কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, শরীরের কোনরূপ গঠনপারিপাট্য প্রকাশ পায় নাই, এবং বর্ণবিন্যাস সৌন্দর্য-বোধ আভাসেও আপনাকে ব্যক্ত করে নাই।" (১৩০০) দীনেশচন্দ্র সেন কিন্তু তুলনায় অনেক বেশি সচেতন দর্শক। তিনি লিখছেন—"কালীঘাটের পটুয়াদের যে সকল ছবি এখানে দেওয়া হইল তাহার এক একখানি এক বা দুই পয়সায় বাজারে পাওয়া যাইত, তুলির একটি মাত্র টানে মূর্তিগুলি রেখাসম্পদযুক্ত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।...কালীঘাটের পটুয়ার চিত্র কবিত্বে সরস; মেয়েদের কত ভঙ্গী যে তাহারা আঁকিতে পারিত তাহার ইয়ত্তা নাই, প্রত্যেকটি ভঙ্গী লালিত্য ও কবিত্বময়। এই সকল চিত্র বাজারে এক পয়সাএ দুই পয়সায় বিক্রীত হইত, খরচ একরূপ কিছুই ছিল না। গৃহস্থঘরের ছবিতে দামী সোনার রং ঝলমল করিত না,...ছবি মূল্য এত অল্প ছিল যে বাঙ্গালায় এমন দরিদ্র ছিল না, যাহার বাড়িতে এ সকল ছবি বিরাজ করিত না।..." (বৃহৎবঙ্গ)

৫৮. বাবুরা সেদিন পরীর স্বপ্নে বিভোর। বাগান সাজানো হত এইসব অলঙ্কারে। পুরানো দিনের সাহেবি দোকানের ক্যাটালগ থেকে।

তাই বলছিলাম কালীঘাট আর চিৎপুরের এইসব পটের বিবিরা ছিলেন সর্বজনের প্রণয়িনী। গ্রামবাংলার মানুষ যাঁরা কালীঘাটে তীর্থ করতে আসতেন, কিংবা সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থ মেলায় অথবা হাটে যাঁদের আনাগোনা তাঁরা ঘরে ফেরার সময় এক দু' পয়সায় দু-একখানা পট সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দেবদেবীর সঙ্গে দু-একজন মানবী। ঠাকুর-দেবতাদের ঠাঁই যদি গৃহস্থের ঠাকুরঘরে, কিংবা লক্ষ্মীর আসনের ওপরে, বিদ্যাধরীরা তবে ঠাঁই পেতেন বৈঠকখানায় কি শোয়ার ঘরে। এই বিদ্যাধরীরাই ছিলেন সাধারণের কাছে যাকে বলে—'পিন আপ্‌স'। বাখারির বেড়া অথবা মাটির দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করতেন তাঁরা, চেষ্টা করতেন সাধারণের স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা তৃপ্তি করতে। কালীঘাটের পট অতি-সাধারণের কাছেও সহজবোধ্য। চিত্রের ভাষা এবং বক্তব্য দুই-ই স্পষ্ট। পটের ভাষার সঙ্গে বাঙালির পুরুষানুক্রমে পরিচয়। অপরিচিত বলতে নগরের এই জীবনাচার, রমণীরঙ্গ, বাবুদের রকমারিবিলাস। গাঁয়ের পটুয়ার তির্যক দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ অতি সহজেই ধরা পড়ত গাঁয়ের খদ্দেরদের কাছে। এ-ছবি তাঁদের কাছে নগর-দর্শনের সামিল। গাঁয়ে নিয়ে গেলে দাওয়ায় বসে কৌতূহলীর ভিড়ে জমে উঠবে নগর-কীর্তন। তাছাড়া নিজেদেরও যে সাধ আহ্লাদ নেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায়? বিবিরা না হয় বাবুদের দখলে, কিন্তু তাঁদের ছবিগুলো উপভোগ করার সুযোগই বা কম কিসে? পটুয়ার দৌলতে নগরের যে কোনও রূপবতী যেন সেদিন গরিবের নাগালে।

এক পয়সায় যে-ছবি পাওয়া যায়, নগরের বিত্তবানেরা তা দিয়ে নিজেদের ঘর সাজাতে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হবেন এটা স্বাভাবিক। নগরের নব্য বণিকতন্ত্রে সব কিছুর মানই নির্ধারিত হচ্ছে টাকার অঙ্কে। সুতরাং, দাম যার কানাকড়ি ছবি হিসাবে তা আর কেমন করে অমূল্য বলে বিবেচিত হতে পারে? তাছাড়া ওই সব প্রাসাদে আর বাগানবাড়িতে এই ছবি বেমানানও বটে। সেখানে শোভা পাওয়া উচিত সাহেবদের বাড়ির মতো গিল্টিকরা ফ্রেমে বিশাল বিশাল তৈলচিত্র। তবু পটুয়াদের সঙ্গে কোথায় যেন একটা নাড়ির টান, উনিশ শতকে কলকাতার বাবুরা পুরোপুরি খারিজ করে দিতে পারলেন না কলকাতার পটুয়া কিংবা খোদাই শিল্পীদের। একই ছবি তাঁরা অন্যভাবে পেতে চাইলেন। ক্যানভাসে। তেল রঙে।

দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—"মানসিংহের সঙ্গে জয়পুরী কলম বঙ্গের উচ্চশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত হয়।...মানসিংহের রাজত্বকালে বাঙ্গালী চিত্রকরেরা এই দো-আঁসলা শিল্পের পক্ষপাতী হয়। ধনীদের গৃহে গত ২/৩ শত বৎসরের মধ্যে এই জয়পুরী (যাহাকে কেহ কেহ 'রাজপুত শিল্প' আখ্যা দিয়া থাকেন, শিল্পপ্রভাব অব্যাহত থাকে। কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী চিত্রকর এই অঙ্কন পদ্ধতি গ্রহণ করেন নাই।...জয়পুরের প্রভাবান্বিত শিল্পে পোষাকের আড়ম্বর, ঘাঘরা, পায়জামা, ওড়না ও দরবারী কায়দা বেশী, উহাতে ঐশ্বর্যের ভাগ অধিক, মাধুর্য অল্প। বাঙ্গালা খাঁটি চিত্রকলার মত উহা ততটা প্রাণবন্ত নহে। খাঁটি দেশী পটুয়ার হাতের রাধাকৃষ্ণের যে মাখামাখি ভাব, তাহা উহাতে নাই।" (বৃহৎবঙ্গ)

কলকাতার কাঠখোদাইয়ের রাজস্থানী মিনিয়েচারের প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। দীনেশচন্দ্রের মতে এই রাজস্থানী হাওয়া বইতে শুরু করে অনেক আগে। মানসিংহের কালে বলে ধরে নেওয়া যায়। ষোড়শ শতকে। উনিশ শতকের ঘাত প্রতিঘাতে যে রাষ্ট্রীয় সামাজিক আবর্ত তাতে 'খাঁটি বাঙালি' শিল্পীরা কিন্তু সেই অর্থে আর 'খাঁটি' থাকতে পারেনি। কালীঘাটের পটে তিনি নিজেই ইংরেজ-প্রভাব স্বীকার করেছেন। বাংলার শিল্পীরা সেদিন আরও নানাভাবে প্রভাবিত। সে প্রভাব দ্বিবিধ। এক—কলাকৌশলের দিক থেকে, দ্বিতীয়—রূপকল্প পরিকল্পনায়। তৎকালেই সাহেবদের দেখাদেখি বাঙালি শিল্পীরা শুরু করেন তেলরঙের ব্যবহার। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বলেছেন বাঙালি শিল্পীরা অনেক সময় সরাসরি সাহেবদের গুরু বলে মেনে নিতেন। শহর এবং শহরতলির বড়মানুষ মনে মনে বুঝিবা ওঁদেরই খুঁজছিলেন। সুতরাং,

৫৯. দুই সখি। কালীঘাটের পটের আদলে আঁকা তৈলচিত্র। মুর্শিদাবাদ। উনিশ শতক।

ক্যানভাসের ওপর রচিত হল অসংখ্য রঙিন তৈলচিত্র। শিল্পী 'খাঁটি বাঙালি'। বিষয়বস্তু প্রধানত দেবদেবী অথবা পৌরাণিক কোনও দৃশ্য। প্রতিমার গড়নে এবং পট পরিকল্পনায় এসব ছবিতে পশ্চিমের প্রভাব। কখনও কখনও রাজপুত মিনিয়েচারের ছায়াপাত। ওই সব তৈলচিক্কণ দেবী প্রতিমায় হয়তো সমকালের রমণীরূপচিন্তার ইঙ্গিত মেলে, কিন্তু প্রাচীন এবং পুবের ঐতিহ্যের আবরণে আর অলঙ্করণে সে-রূপ কিছুটা আবছা। হয়তো সে-কারণেই দিশি পটুয়াদের দিয়ে কিছু কিছু খাঁটি দিশি মানবী-প্রতিমাও সৃষ্টি করিয়েছিলেন তৎকালের বনেদি পৃষ্ঠপোষকেরা। সে-ছবির নমুনা খুব বেশি নেই। যৎসামান্য যা আছে আজকের দর্শক তাকে বলেন—'অয়েলে কালীঘাট।' কিছু কিছু কিন্তু রচিত টেম্পেরায়। তা হোক। সেই শরীর। সেই কাম-প্রতিমা। যেন মূর্তিমতী রতি। কিছুটা স্থূল হয়তো। কিন্তু তাকালে সন্দেহ থাকে না এঁরা কালীঘাটের পটের-বিবিদেরই রাজসংস্করণ।

তবু যেন তৃপ্তি নেই। রূপের নেশা ঘোচে না। কলকাতার বিলাসী বাবুসমাজ আরও কিছু চান। পটের উর্বশী মেনকা রম্ভা আর রোচে না। সাহেব সংসর্গে দ্রুত তাঁদের রুচি বদল ঘটছে। তাঁরা অন্য ধরনের পটের বিবি চান। সাহেব বাড়িতে আড়চোখে যেমন দেখেন ঠিক তেমনটি। কিংবা 'শেক্সপীয়ার গ্যালারি'তে যেমন রয়েছে। অতএব সুরবালার শোয়ার ঘরে টাঙানো হল বিবসনা বিদেশিনীর ছবি। বাবুর বাগানে সাতসমুদ্রের ওপার থেকে এসে অবতীর্ণ হলেন পরী। ঝাঁক ঝাঁক পরী। কারও ডানা আছে। কারো নেই।

"হিন্দুস্থানের বাদশা জাহান্‌গীর একদিন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেমসের রাজদূত রো সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাহেব, ফিরিঙ্গির মুল্লুক আমার হিন্দুস্থানের কাছে কোন্ বিষয়ে বড়ো?' ...সাহেব কোটের পকেট হইতে একখানি মেমের ছবি বাদশার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিলেন, —'এমন তস্‌বির হিন্দুস্থানে যতদিন না পাওয়া যায়, ততদিন বিলাতেরই জিৎ রহিল।' ...মহাল থেকে মহল্লায় মহল্লায় জাহান্‌গীর বাদশার পেয়াদা ছুটিল, দিল্লীর ছোটবড়ো নকশাওয়ালা, ওস্তাদ, কারিগর, নামজাদা তস্‌বীরওয়ালা মিনাবাজারে একত্র হলে বাদশা তাদের মাঝে সেই বিলাতি ছবিখানি ফেলে দিয়ে নকল করিবার হুকুম দিলেন—আসলর সঙ্গে যেন তিলতফাৎ না হয়—হিন্দস্থানের প্রসিদ্ধ কারিগর একমাস ধরে সেই তসবীরের নকল ওঠাইতে লাগিল। দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে বিলাতের সেই দুধে আল্‌তার সুন্দর রঙ সোনার তারের মতন চিকন কেশ ফরাসী ছিটের লতাপাতা ওস্তাদের কলমের মুখে গজদন্তের পটের উপরে অবিকল ফুটিল, কেবল সমুদ্রের মতো নীল চোখের তারা দুটির কাছে সমস্ত কারিগরের সব কৌশল ব্যর্থ হল! তসবীরের চোখ কোনোটার হল তামড়া আভা, কোনোটার কালো, কোনোটার বা ফিরোজের মতো নীল। বাদশা মহাক্ষাপ্পা হয়ে উঠিলেন।..."

অবনীন্দ্রনাথের 'আলেখ্য' গল্পে শেষে হিন্দুস্তানের মান রেখেছিলেন নূরজাহান একজন নকলনবিশ ভূতপূর্ব বাঁদীর কুশলতায়। আর জাহাঙ্গীর সেই উপলক্ষে নূরজাহানকে ইনাম্ দিয়েছিলেন সদ্য সদ্য ঢালাইকরা একখানা মোহর। মোহরের এক পিঠে সুন্দরী নূরজাহানের প্রতিমা।

অবনীন্দ্রনাথ কেন এই দু'পাতার কাহিনীটি লিখেছিলেন সেসব প্রাসঙ্গিক খবরাখবর জানা নেই। তবু এই উপকথাটি উল্লেখ করছি দুটি কারণে। প্রথমত, এ-কাহিনীর সার বোধহয় এটাই যে, এক দেশের শিল্পীর পক্ষে অন্য দেশের ছবি নকল করা কঠিন কাজ। কিছুতেই হু-বহু হতে চায় না। শিল্পীর তুলিতে নিজের মনের রঙ এসে যায়। দ্বিতীয়ত, জানা গেল বিদেশিনী হুরী বলেই বাদশা তাঁকে আপন মোহরে ঠাঁই দিতে রাজী হননি, সুন্দরী নূরজাহানই বন্দিত সেখানে।

এ-মেজাজ সত্যিকারের বাদশাহী মেজাজ। কলকাতার বাবু-সমাজে বড় মানুষরা ছিলেন বটে, কিন্তু মেজাজে তাঁরা সেদিন অনেকেই বান্দা। তুর্কী-বিজয়ের পর বিজিত বাঙালি কবি বিজয়ীর বন্দনা

৬০ সম্পন্নরা কালীঘাটের সুন্দরীদের নতুন করে পেতে চাইতেন ক্যানভাসে। এই মেয়েটির ঠিকানা হয়তো বা কোনও বাবুর অন্দরমহল।

গেয়েছিলেন—'মহেশ হইল বাবা আদম/দেখিয়া চণ্ডিকা বিবি তেঁহ হইল হায়া বিবি।' বাঙালি ধনপতিদের একাংশের মনে তখন গুনগুন করছে এ-ধরনেরই বন্দনা-গীতি'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইংরেজস্তোত্র' কিন্তু বাবুদের দিকে তাকিয়েই লেখা। এইসব বাবুরা বাংলা-ছবি নিয়েই খুশি থাকবেন সেটা অকল্পনীয়। মুঘল, রাজপুত ছবির ছায়াপাতেও তখন আর মন ভরছে না তাঁদের। তাঁরা সরাসরি বিলিতি ছবি চান। বিলিতি পটের-বিবি।

অনেকেরই মনে মনে কামনা ছিল অবশ্য খাস বিলিতি বিবি। 'ধবলাঙ্গী ধূম্রকেশী বিড়াল নয়না, বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ ললনা', হতে পারে রহস্যচ্ছলে বলা, কিন্তু কথাগুলো বাঙালির মুখেই উচ্চারিত। বাংলা প্রহসনে তখন বাবুর ব্যঙ্গোক্তি—"শাড়ি পরা কালো চুল/বাঙালির মেম।/ড্যাম বেঙ্গলীর লেডি সেম্ সেম্ সেম্॥" (ঈশ্বর গুপ্তের মুখে এ-ধরনের কিছু কথা শোনা গেছে।) একটি প্রহসনে বারবিলাসিনী খেদ করে গাইছিলেন—"নাগরে বাঁধতে নারি বেণী আড়নয়ন বাণে; মন মজেনা প্রাণ ভোলে না বাংলা বেশে বাংলা গানে।" আর একটি প্রহসনের চরিত্র বলছে—"আজকাল এমন বাবু ঢের আছে, মোছলমানী, ফিরিঙ্গি, ইহুদি বই কথাটি কন না!" (মাগসর্ব্বস্ব, ১৮৮৪) 'কলকাতার শকবাজী' নামে একটি নকশায় বিশদ করা হয়েছিল বাঙালি বাবুর শখের কথা—"ফাস্টক্লাস শক—রূপলাবণ্য থাক আর না থাক বাবুর পেট মোটা চাই, ঘরের গিন্নির সঙ্গে শকের সম্পর্ক অল্প— একটা হলে পুরো শকবাজী হয় না। এক জাত হলেও চলে না, ইহুদী সর্ব্বপ্রধান। কাশ্মীরী তার পর। বিলাতি হলে ভাগ্যের পরিসীমা থাকে না।"

কিন্তু সে-সৌভাগ্যের পথে অনেক বাধা। সম্পর্ক রাজা প্রজার। মাঝখানে অতএব উঁচু দেওয়াল। কড়ায়ার বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীরাও সাদা কালো বিচার করেন। নিষিদ্ধ এলাকায়ও কালোর জন্য নানা বিধিনিষেধ। সুতরাং, বাবুদের সামনে সেদিন বিকল্প একটাই,—পরী।

উপসংহারে তারই উপাখ্যান।

শহরময় তখন পরী আর পরী। "বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উঁচু—ঘোড়ায় চড়া হাইল্যাণ্ডের গোরা বিবি, পরী ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো—মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি—সিংগির পা রূপালী গিল্‌টি ও হাতী সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ—রং ও গড়ন আসল ইহুদী ও আরমানী কেতা।...প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতী পরীরা ভেঁপু বাজাচ্ছে—হাতে বাদশাই নিশেন ও মাঝে মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিকরণ ও ক্রেষ্ট!" গত শতকের কলকাতার বারোয়ারি প্রতিমার রূপ ও সজ্জার বিবরণ দিচ্ছেন হুতোম প্যাঁচা। লক্ষণীয় দেবীর তখন বিবিয়ানা মুখ। আর তাঁকে ঘিরে বিলিতি পরী। সত্যি বলতে কী, উনিশ শতকের কলকাতার মতো এত পরী বোধহয় খাস পরীস্থানেও ছিল না। কলকাতার বাবুদের বাগানে পরী। ফটকে পরী। সিঁড়িতে পরী। বাড়ির মাথায় পরী। ভেতরেও একই দৃশ্য। দেওয়ালে পরী। কেউ ডানাকাটা, কেউ ডানাওয়ালা—এই যা। ঘরময় ছড়িয়ে আছে পরী। খাটের মাথায় দুদিক থেকে উড়ে আসছে দুই পরী। পরীর হাতেই ঘরের প্রদীপ। পরীর হাতেই হুঁকো। পরীর হাতেই কলম দান।

পরী যেন সেদিন কলকাতার বাবুয়ানার প্রতীক। বাবুরা সব পরীতে-পাওয়া। সুতরাং কালীঘাটের ছবিতেও পরী। পরী উড়ছে। পরী নাচছে। পরীর হাতের তীক্ষ্ণ বর্শা বিদ্ধ করছে হরিণ। ইনি কি ডায়না? হতে পারেন। তবে পরীর ভঙ্গিটি দেখে মনে হতে পারে মায়ামৃগ হয়ে কলকাতার রূপ-উন্মাদ বাবুই বুঝি বা লুটিয়ে পড়ে আছেন তাঁর পায়ে। এই পরিবেশেই একদিন পরিত্রাতার ভূমিকায় দক্ষিণী শিল্পী রাজা রবি বর্মার আবির্ভাব। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সীতা দেখে মন্তব্য করেছিলেন—'সীতা দাঁড়িয়ে আছেন ভিনাসের ভঙ্গীতে।' সবাই জানেন, এই বিদেশীভাবের বিরুদ্ধে। সম্ভবত স্রোতেরও বিরুদ্ধে। কেননা, অবনীন্দ্রনাথ যখন

৬১. বাংলায় রাজপুত কলমের এই পরিণতি হয়তো ডেকে এনেছিলেন সেদিনের শৌখিন বাবুরাই।

রবিবর্মার সমালোচনা করছেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাঁর প্রশংসায় মুখর। তিনি লিখছেন—"দাক্ষিণাত্য এ বিষয়ে (অর্থাৎ চিত্রকলায়) বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক, তাহাই মিলিয়াছে—...একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কাপি না করিয়া সৌন্দর্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে, যে মধুপের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তের উড়িয়া গিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনে এবং সেই সৌন্দর্য্যের চাক বাঁধিয়া চিত্তহরণ করিতে জানে। এই প্রতিভা রবি বর্ম্মা।...তাঁহার সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা নায়ার রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডোল নিটোল গঠন ও নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয় বা সুভদ্রার্জ্জুনের প্রণয় দৃশ্য কাহার না চিত্ত হরণ করে ?" (রবি বর্ম্মা, ১৩০০) রবি বর্ম্মার এই প্রশস্তি, বলা বাহুল্য, তিনি সীতাকে ভেনাসের মতো করে দেখাতে পেরেছিলেন বলেই। তাঁর উর্বশীও কি বিলিতি পরীর মতো নয় ?

শেষ প্রশ্ন : উনিশ শতকের কলকাতাকে হঠাৎ পরীতে পেয়েছিল কেন ? নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ইতিহাসের বাঙালির ভাব-কল্পনা আর সৃষ্টি "হৃদয়াবেগ প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার অভিব্যক্তি।" এই 'ইন্দ্রিয়ালুতার' জন্যই কি কলকাতার সুখী বাঙালির হঠাৎ মনে পড়েছিল অপ্সরা আর যক্ষিণীদের ? নাকি বাবুদের হৃদয়াবেগ সেদিন আলোড়িত চারপাশের দৃশ্যাবলী দেখে ? একজন ফরাসী গবেষক ইউরোপে পরীর আবির্ভাব সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে অনুমান করেছেন—পরীর উৎস দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রাম্যমাণ অচেনা দুনিয়ার আগন্তুক রূপসী জিপসী মেয়েরা। তাঁরা এই আছেন, এই নেই। এই সুন্দরীরাই কল্পনার পরী। মথুরা বা সাঁচী যক্ষিণীরা অনেক দূরে। কলকাতায় সেদিন চোখ মেললেই পরী। আর, তাঁরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে বলেই অন্যভাবে তাঁদের ধরে রাখার জন্য এই উন্মাদনা। কেউ বন্দী করেছেন তাঁদের গিল্টি করা ফ্রেমে শোয়ার ঘরের দেওয়ালে। কেউ বা পাষাণীকে ধরে রাখতে চেয়েছেন সবুজে ফুলে আচ্ছন্ন করে বাগানে। উনিশ শতকের কলকাতায় তারাই মৌর্য কিংবা গুপ্তযুগের সুরসুন্দরী আর অপ্সরা। সাক্ষী রূপচাঁদ পক্ষী। তালে, সিন্ধু কাফী রাগিণীতে সেদিন কলকাতায় রূপচাঁদের গান—

"স্বর্গে আছেন ইন্দ্রের শচী, এমন শচী দেখলে হয় অরুচি,
ইংরাজের মিস্ কচি কচি অঙ্গভঙ্গি বহুতর ॥
(গাউনপরা রুমাল ভরা এসেন্স রোজ লাভেণ্ডর)
উর্ব্বশী কিন্নরী, রম্ভা নর্ত্তকী সুন্দরী সম... ।"

# বিবাহ করিব সুখে
# ইংরাজ-ললনা

'মাদ্রাজ মেল' সাহেবদের মুখপত্র। কলিকাতায় 'স্টেটসম্যান' বা 'ইংলিশম্যানে'র যে স্থান, মাদ্রাজে উক্ত পত্রও ও প্রায় সেই স্থান অধিকার করিয়া আছে। এ-হেন 'মাদ্রাজ মেল' কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় স্বামীদের নির্যাতিতা শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীদের জন্য হা-হুতাশ করিয়াছেন ও অশ্রুজল ফেলিয়াছেন। এইসব নির্যাতিতা পত্নীদের তিনি নাম দিয়াছেন—"Orphan Wives of Indians" বা ভারতীয়দের অনাথা পত্নীগণ! শ্বেতাঙ্গ সহযোগীর বিশ্বাস যে, ভারতীয়রা নানারূপ ছলাকলায় ভুলাইয়া এইসব শ্বেতাঙ্গিনীদের বিবাহ-বন্ধনে বাঁধিয়া এদেশে আনে ; তারপর বেচারী কোমলপ্রাণা পত্নীদের আর দুঃখের অবধি থাকে না।...

প্রকৃত কথা এই যে, শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীদের চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয় স্বামীরাই বেশী করুণার পাত্র। বেচারারা তরুণ বয়সে বিদেশে লেখাপড়া শিখিতে বা কাজকর্ম করিতে যায়, সে দেশের সামাজিক রীতিনীতি বা হালচাল বিশেষ কিছুই জানে না। এমতাবস্থায় প্রগলভা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী মেয়েদের হাবভাব ও ছলাকলায় সহজেই তাহাদের মাথা ঘুরিয়া যায়,—অনেক সময় নিরুপায় হইয়া বিবাহ-বন্ধনেও আবদ্ধ হইতে হয়। সকলের অদৃষ্টেই যে ভদ্রবংশীয়া পত্নী জোটে তাহা নয়, কাহাকেও বা ঘেষেড়ানী ধোবানী বা দাসী জাতীয়া মেয়েকেও মাথায় বহিয়া ভারতবর্ষ পর্যন্ত টানিয়া আনিতে হয়। 'মাদ্রাজ মেল' বলিয়াছেন যে, ভারতীয় স্বামীর হাতে পড়িয়া শ্বেতাঙ্গিনী পত্নী যারপরনাই দুর্দশা ভোগ করিতেছে। কিন্তু আমরা জানি অনেক শ্বেতাঙ্গিনী পত্নীর ভারতীয় স্বামী বেচারাদের যথার্থই হাড়ির হাল হইয়াছে,—জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।...."

কথাগুলো লেখা হয়েছিল আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে,—আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। একথা মনে করার কোন কারণ নেই, মাত্র সে বছরই (১৯২৩) বধূবেশে কিছু বিদেশিনী এসে নেমেছেন ভারতের শহরে, বন্দরে,—ভারতীয়রা শাঁখ বাজিয়ে তাঁদের তুলে এনেছেন আপন ঘরে। আর, তারপর বছর ঘুরে আসতে না আসতে বৈবাহিকদের মধ্যে এই বিবাদ। সহজেই অনুমান করা যায় বিতর্কটি নতুন নয়,—পুরানো। কেননা, আনন্দবাজারের অনেক আগে, সুদূর ১৮৭৫ সনে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর পৃষ্ঠায়ও দেখি একই আলোচনা। ওঁরা লিখছেন : ইংরাজ ভদ্রমহিলাদের প্রতি কোনও অসম্মান না-দেখিয়েই আমরা বলতে চাই, ইংরাজ মেয়েদের সঙ্গে ঘরকন্না করতে গিয়ে স্থানীয় যুবাদের ইতিমধ্যে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে অন্যাদের সতর্ক করে দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট।

সুতরাং বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই রাধা আর কৃষ্ণকে নিয়ে শুকসারির বিবাদের মতো সাদা-বিবি আর কালোবাবু ঘটিত তর্কাতর্কি চলছে অনেকদিন ধরেই। 'ধবলাঙ্গী ধূম্রকেশী বিড়াললোচনা,/বিবাহ করিব সুখে

**৬২. রাজাবাহাদুরের জীবনে দুর্লভতম মুহূর্ত। নাচের আসরে তাঁর দুপাশে বসে দুই বিদেশী সুন্দরী। 'লেজ অব ইন্ড' থেকে।**

ইংরাজ-ললনা', দুই ছত্রের এই পদ্যটি রচনা করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। এবং লিখেছিলেন বিলেত থেকে ফিরে নয়, বিলেত যাত্রার (১৮৮৮) বেশ কিছুকাল আগে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এ-পদ্য শাস্ত্রী মশাইয়ের যাত্রা-পূর্ব মনের কথা নয়, আসলে এর উপলক্ষ ছিলেন ভবানীপুর নিবাসী বিলেত-ফেরত এক বাঙালি ডাক্তার। শিবনাথ তাঁর উৎকট সাহেবিয়ানাকেই ব্যঙ্গ করতে চেয়েছিলেন মাত্র। তবে এটাও ঠিক, এ জাতীয় একটা সাধু-সাধ সেদিন অনেক তরুণেরই মনে মনে। কেননা, রবীন্দ্রনাথও দেখি (প্রথম যাত্রা—১৮৭৮) সকৌতুকে বিলেত থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন রামপ্রসাদী সুরে লেখা ইঙ্গবঙ্গের জাতীয়-সঙ্গীত :

মা, এবার মলে সাহেব হব—
রাঙা চুলে হ্যাট বসিয়ে পোড়া নেটিব
নাম ঘোচাব !
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে
বেড়াতে যাব—
আবার কালো বদন দেখলে পরে
"ডার্কি" বলে
মুখ ফেরাব··· ···

এ পদ্যের লেখক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তিনি রামপ্রসাদের মত শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত !" অন্যদিকে কিছু কিছু মেম কিন্তু তারও বহু আগে থেকে জানিয়ে চলেছেন তাঁরা কৃষ্ণ-ভক্ত। সে কৃষ্ণ-চৈতন্যের সূত্রপাত সঠিক করে বলা শক্ত। হয়তো সেই পালতোলা জাহাজের যুগেই। ১৮৭৫ সনে গৌরীর মুখে শুনি কৃষ্ণ-সঙ্গীত :

"I should like to marry
If I could but find.
A nice black man with money,
Well suited to my mind."

সাত সমুদ্রের এপারে ওপারে নায়ক নায়িকার মুখে যখন একই গান, মিঞা আর বিবি যখন রাজি, তখন কী করবে আর কাজী ? সুতরাং ১৭৯৯ সনে মির্জা আবুতালেব খান আয়র্ল্যাণ্ডের কর্ক শহর থেকে আমাদের জানালেন স্বপ্ন পূরণের সংবাদ। লণ্ডনে তিনি তিন তিনজন ভারতীয় রমণীর দেখা পেয়েছিলেন, তাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে সুখে শ্বেতাঙ্গ স্বামীর সঙ্গে ঘর করছেন। কর্কে পেলেন মুর্শিদাবাদের জনৈক দীন মোহম্মদকে। মির্জা সাহেবের এক বন্ধু ছিলেন ক্যাপ্টেন বার্কার। তারই এক ভাই দীন মোহম্মদকে সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলেন কর্কে। তিনি তাঁকে স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। সেখানে এক ভদ্রঘরের সুন্দরী মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়ে। ওঁরা দু'জনে অন্যত্র পালিয়ে যান। তারপর শুভ বিবাহ নিষ্পন্ন করে আবার ফিরে আসেন কর্কে। মির্জা লিখছেন—ওরা বেশ সুখে আছে। এক ঘর ছেলেপুলে। দীন মহম্মদ কেতাবও ছাপিয়েছে একখানা। পরের খবর, ম্যানচেস্টার স্কোয়ারে সে হুকা-ক্লাব হাউস খুলেছে ! *

দীন মোহম্মদ বিলেতি ঘর-জামাই। বিলেতের প্রতি শহরে তখন ভারতীয়দের জন্য জামাই-বারিক গড়ে

**৬৩. বিদেশিনীর সঙ্গে বিলিয়ার্ড-টেবিলে আর এক রাজাসাহেব। সাহেব-মেমদের সঙ্গে মেশার কোনও সুযোগই তাঁরা সেদিন হারাতে রাজি নন। 'লেজ অব ইন্ড' থেকে।**

না উঠলেও একথা অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না, ইউরোপে তিনি তখন একমাত্র ভারতীয় বাবা-জীবন নন। কেননা, কলকাতার বাবুরা লালপানির স্বাদ রপ্ত করার আগেই পশ্চিম উপকূলে সাধারণের মন থেকে কালাপানির ভয় কেটে গেছে। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের মতে আগে কেটেছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র অঞ্চলে, তার অনেক পরে এদিকে। তাই বুঝি তাঁর 'লুল্লু বলে—মহাশয়...আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে থাইতে পারি না। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা।...সমুদ্র পারের বায়ু লাগিলেই ধর্ম ফস করিয়া গলিয়া যায়, দ্বিতীয়ত, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিলেতে কোনও ইনক পাওয়েল-এর কথা দৈবাৎ শোনা যায়,—মাখামাখিতে তখন শ্বেতাঙ্গের মোটেই জাত যায় না। মনে মনে তাঁদেরও শ্লোগান—'অসবর্ণে আপত্তি-নাই।' কেউ কেউ নিশ্চয় বিলেতি সখীকে হাত ধরে নিয়ে এসেছেন এদেশেও। উনিশ শতকে দেখি কেউ কেউ আবার ঘরে বসেই পেতেছেন বিবিধরা-ফাঁদ। এমন কি এই কলকাতায় সেদিন চাঁদ-বদনীদের একটু ছোঁয়া পাওয়ার জন্য ধনীদের মধ্যে সে কী নির্লজ্জ ব্যাকুলতা! স্থানীয় ইংরাজ-কবি নাচের আসরে বাবুর বিবরণ দিচ্ছেন—'অ্যাণ্ড হি লেড টু এ কোচ দি কমিশনারস ওয়াইফ/অ্যাণ্ড সেইড ইট ওয়াজ দি হ্যাপিয়েস্ট আওয়ার অব হিজ লাইফ।' তাঁদের উচ্চকাঙ্ক্ষা কখনও এর চেয়ে উপরে ওঠেনি একথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? ১৮৭৫ সনে অন্তত আমরা খবর পাচ্ছি একজন অস্ট্রেলিয়ান মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল জনৈক ধনাঢ্য আফগানের সঙ্গে। বোম্বাইয়ে তা নিয়ে হুলুস্থুলু কাণ্ড!

তবে হ্যাঁ, শ্বেতাঙ্গিনী-বিজয়ীদের মধ্যে প্রথমদিকে স্বভাবতই অগ্রাধিকার হয় দীন মোহম্মদের মতো অতি-সাধারণের, না হয় অ-সাধারণ রাজন্যবর্গের। সংরক্ষিত এই ছাঁদনা-তলায় মধ্যবিত্ত পা বাড়িয়েছে পরে,—ক্রমে ক্রমে। রাজাদের সে বিলাস কাহিনী বর্ণনার সুযোগ এখানে নেই। সেকালে ইংরাজের সাধ যেমন মার্কিন-বিধবা, আমাদের রাজাদেরও নেশা তেমনই পশ্চিমী লাবণ্যময়ী। শুধু ইন্দোরের তুকাজিরাও হোলকার আর কাপুরথালার মহারাজা জগজ্জিৎ সিং নন, পুতুকোটার মার্তণ্ড তণ্ডিমান বাহাদুর, পোরবন্দরের
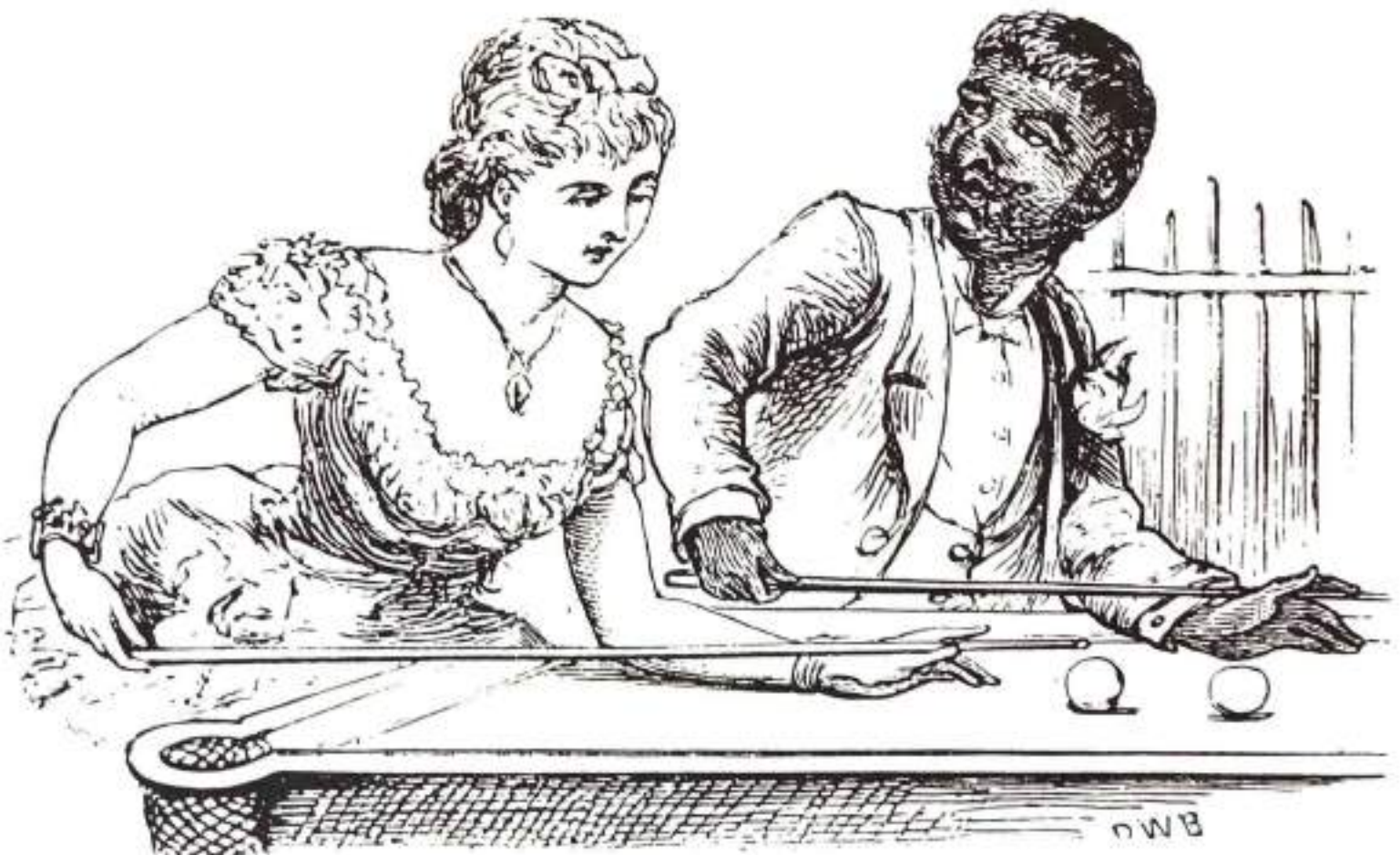
নটবর সিং, পালামপুরের নবাব তালে মোহম্মদ খান, পান্নার মহিন্দ্র যাদবেন্দ্র সিং—অনেক, অনেক নরপতিই সেদিন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়ার মতো প্রাসাদে অথবা বাগানবাড়িতে পুষছেন পশ্চিমী সুন্দরী। মনে হয় রাজাবাহাদুরদের হাসিখুশি রাখার জন্য, সেই সঙ্গে তাঁদের রাজকার্য থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখবার জন্য সাম্রাজ্য গড়ার কাজে নিযুক্ত বিশ্বকর্মারা তাঁদের এই ক্রীড়ায় উৎসাহিতও করতেন। মরশুমে ভারতীয় রাজাদের হাট জমে যেত ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং ইতালির সমুদ্র সৈকতে, হোটেলে, নৈশ ক্লাবে। ওঁরা দু'হাতে বিদেশে টাকা ওড়াতেন। টাকা বলা ভুল হবে, দু'হাতে বিলাতেন মুক্তোর মালা, হীরার অঙ্গুরীয়। ফলে বিবি-ধরা আদৌ শক্ত ছিল না। সুন্দরীদের মধ্যে বরং হুড়োহুড়ি পড়ে যেত কার আগে প্রাণ কে করিবে দান তাই নিয়ে।

স্পেনের রাজার বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে কাপুরথালায় মহারাজা জগজিৎ সিং সদলবলে গিয়ে অবতরণ করেছেন মাদ্রিদে। সেটা এই শতকের প্রথম দিককার কথা। হঠাৎ সেখানে তিনি এক স্প্যানিশ-সুন্দরীর প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটির নাম অ্যানিটা ডেলগাডোর। সে একটি শৌখিন নৈশ-আখড়ায় নাচে। রাজা বাহাদুর তাঁকে প্রস্তাব দিলেন—রানী হবে ? অ্যানিটা রাজী। কিন্তু বাবা তার গররাজী। তিনি আলু-কাবলি বেচেন, সংসার চলে, বলতে গেলে, মেয়ের আয়ে। তাছাড়া তিনি জানতে চাইলেন—মহারাজার অন্য স্ত্রী নেই কি ?—সব মিলিয়ে কটি ?—তার জন্য কোনও অসুবিধা হবে না, বাবাকে থামিয়ে দিল অ্যানিটা। মহারাজা বাচালবুড়োকে শান্ত করার জন্য ওখানে দাঁড়িয়েই ছয় হাজার ডলারের একটা চেক লিখে দিলেন। অ্যানিটা রাজা বাহাদুরের সঙ্গে চলে এল কর্পূরতলায়। তার পরের উপাখ্যানও সমান সংক্ষিপ্ত। বছর কয় পরে মহারাজার হঠাৎ সন্দেহ হল অ্যানিটা বিশ্বাসঘাতিনী। লণ্ডনের এক হোটেলে, বলতে গেলে প্রায় হাতেনাতেই ধরা পড়ে গেলেন বিদেশিনী রানী। ক্ষেপে গিয়ে মহারাজা তাকে বিদায় দিলেন। অ্যানিটা মুক্তিপণ আদায় করল বছরে ছত্রিশ হাজার টাকা। খোকার জন্য বছরে আরও চব্বিশ হাজার টাকা। তারপর থেকে সে আবার মাদ্রিদবাসিনী।

৬৪. বিয়ের আগে ইংরাজ ললনার কল্পনায় ভারতীয় রাজকুমার।

এ ধরনের অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে আছে 'হিজ হাইনেস'দের বর্ণাঢ্য জীবন বৃত্তান্তে। কাপুরথালায় যুবরাজ স্টেলামাজ নামে এক ইংরাজ রূপসীর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন। যুবরাজকে বংশ রক্ষার্থে বিয়ের অনুমতি দিয়েছিল সে দশ লাখ টাকা সেলামির বিনিময়ে! কাণ্ডকারখানা দেখে ইংরাজ বাদশারা পর্যন্ত স্তম্ভিত। ব্যাধি যে রাজন্যবর্গের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে তা তাঁরা নিজেরাও ভাবতে পারেননি। প্রতি রাজবাড়িতে যেন মেমব্যামো। সুতরাং কার্জন বাতলালেন কড়া দাওয়াই। এক নম্বর—বিদেশে যেতে হলে ভাইসরয়ের অনুমতি লওয়া চাই। দ্বিতীয়, ঘোষণা করা হল—বিদেশিনী কোনও পত্নীর সন্তানকে উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করা হবে না। এই ব্যবস্থাটা বলা নিষ্প্রয়োজন, মেম সাহেবদের উৎসাহে কিছু ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেওয়ার বাসনায়। কার্জন আরও একটা কাণ্ড করলেন—গ্রীষ্মের সিমলা তিনি কিছু বেপরোয়া এবং অতি ফূর্তিবাজ রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা বলে ঘোষণা করলেন। রাজাদের মেম-শিকারের ওটাও ছিল অন্যতম উদ্যান। শোনা যায়, কার্জন এই হুকুমটা জারি করেছিলেন ক্ষেপে গিয়ে। তার আগের বছর সিমলায় পাতিয়ালার মহারাজা যা করেছিলেন তার তুলনা নেই। স্বয়ং লেডি কার্জনকেই তিনি শাড়ি পরিয়ে ফটো তুলেছিলেন।

সে যা হোক, রাজার ঘরে যে ধন আছে, ক্রমে টুনিরাও জানিয়ে চলল তাদের ঘরেও সে ধন আছে। থাকতে পারে। এঁরা যে লটারিতে দাঁও মারার স্টাইলে কোটি-পতি হয়েছেন তা নয়। প্রক্রিয়াটি সহজ এবং স্বাভাবিক। এক কথায় সেসব কার্য-কারণের বিবরণ—দুই দেশের মধ্যে যাতায়াত বৃদ্ধি। বিলেত আর 'মধ্যবিত্তে'রও নাগালের বাইরে রইল কই? রামমোহন নাকি বাঙালিদের মধ্যে প্রথম বিলেত-যাত্রী। হয়তো নয়। তবে খ্যাতিমানদের মধ্যে তিনি যে অগ্রগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি বিলেত যাত্রা করেন ১৮৩০ সনে। তাঁর দশ বছর পরে যাত্রী সাজালেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। ১৮৭৮-এ রবীন্দ্রনাথ। তিনি

৬৫. বিয়ের পরে বাস্তবে বিদেশিনীর ভারতীয় স্বামী। 'দি ইণ্ডিয়ান চারিভারি অর ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' থেকে।

জানাচ্ছেন—"বিলাতী বাঙ্গালির চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে !" অর্থাৎ বিলেতে তখন অনেক বাঙালি । তাছাড়া ছিলেন অন্য রাজ্যের অভিযাত্রীরাও । তাঁরা কি সবাই খালি হাতে ফিরেছিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সমসাময়িক ভ্রমণ-কাহিনীর পাতা হাতড়ে লাভ নেই । কেননা, লেখকরা প্রায় সকলেই স্বনামধন্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, তাঁদের জীবনকাহিনী মোটামুটি জানা । বিলেতে গিয়ে তাঁরা কী দেখেছেন, কী ভেবেছেন—তার চেয়ে বেশি কিছু খবর তাঁরা জানাতে নারাজ । তবে সেখানকার সমাজ এবং চলতি হাওয়া সম্পর্কে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় এই যা ।

লণ্ডনে পা দেবার পর তৎকালের প্রায় সব ভারতীয় দর্শকের চোখে প্রথম যিনি বিশেষভাবে ধরা পড়েন তিনি সেই বিবিজান, কলকাতার চৌরঙ্গীপাড়ায় যাঁকে দেখে বাঙালি কবি একদা লবেজান । ব্যতিক্রম দেখছি একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই (যাত্রা—১৮৬৮) । তিনি পড়ার বই থেকে মোটে যে চোখ তুলছেন না এমন নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরাজী ভ্রমণকাহিনীর সমালোচনা প্রসঙ্গে তারিফ করে বলেছেন—লেখকের চোখ আছে, তিনি চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের রস গ্রহণ করতে জানেন । এমন সুরসিক রমেশচন্দ্র কিন্তু বিলাতি-রূপসীদের সম্পর্কে প্রায় নীরব । তিনি অট্টালিকা স্তম্ভাদি কিংবা রাজনীতি সমাজনীতি নিয়েই যেন বেশি ব্যস্ত । দ্বিতীয়বার যখন বিলেত গিয়েছেন তিনি তখন সঙ্গে গিন্নি এবং চার চারটি ছেলেমেয়ে । প্রথমবারও, বয়স যদিও তাঁর কুড়ির আশেপাশে, ঘরে কিন্তু তাঁর বউ এবং তিনি দুই ছেলের বাপ । সুতরাং দ্বিতীয়বারে দেখছি, পছন্দসই বাড়ি আর পাচকের সন্ধানেই তাঁর সময় চলে যাচ্ছে ! রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বারও (১৮৮১) সমান উচ্ছ্বসিত বিলেতি-মেয়ের রূপের প্রশংসায় । য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারিতে লিখেছেন— নবনীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘ পল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র—দেখে পথ কষ্ট দূর হয়ে যায় । শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন এবং প্রিয় বয়স্যারা পরিহাস করবেন, কিন্তু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে—সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে । একই বছরে (১৮৮১) আর এক দর্শক গিরিশচন্দ্র বসু লিখছেন—"পোষাক-পরা, হাসিভরা, সাদা সাদা বালক বালিকার এরূপ দ্রুত গমন বড় চমৎকার দৃশ্য ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন—"বালিকা মানে দুগ্ধপোষ্য মেয়ে নহে । এদেশের লোক বলে—'তিনি কেবল ১৮ বৎসরের বালিকা, তিনি কেবল এক কুড়ি দুই বৎসরের বালিকা··· ।" অন্যত্র একটি ভোজসভায় বিবরণ দিতে গিয়ে লিখছেন—'মনুষ্য উদ্যান মাঝে যেন নব মল্লিকার ফুল ফুটিয়া গেল । স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘাঙ্গী, খর্বাঙ্গী—নানা শ্রেণীর মহিলা নয়ন পথের পথিক হইলেন ।" (ইউরোপ ভ্রমণ) । ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় (যাত্রা—১৮৮৬), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৮৮) বি এম মালাবারী ('দি ইণ্ডিয়ান আই অন ইংলিশ লাইফ', ১৮৮৯) প্রমুখ লেখকরা কেউ-ই মেম প্রসঙ্গে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারেননি । মালাবারী চলমান মেয়েদের দেখে লিখেছেন : 'এ দৃশ্য অচিরে ভোলা যাবে না । তবে প্রকৃত রসিকের মত তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন—আমার পক্ষপাতিত্ব আইরিশ-টাইপের দিকে । তার চেয়েও ভাল লাগে আমার, বরং বলতে পারি ঝোঁক আমার ফরাসী এবং ইতালিয়ান' সুন্দরীর দিকে । তবে মেয়েদের রূপ বর্ণনায় এবং বিশ্লেষণে সবাই ওঁরা হার মেনেছেন অগ্রপথিক (১৭৯৯) সেই মীর্জা আবু তালেব সাহেবের কাছে ।ইংরাজ মেয়ে তাঁর কাছে পরী, বেহেস্তের হুরী। তিনি খোলাখুলি বলেছেন মেয়েদের প্রতি তাঁর চিরকালের আসক্তি, কিন্তু সে মেয়ে ফরাসী হলে তাঁর মন ভরবে না. তাঁর হৃদয় কেড়ে নিয়েছে ইংরেজবিদ্যাধরী ।

রূপ-বর্ণনায় অনিবার্যভাবে এসেছে ফ্যাসানের কথাও । ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় খেদ করেছেন—পোষাকে ওরা প্রতি বছর কী পরিমাণ টাকাই না ওড়াচ্ছে ! মালাবারীর মন্তব্য : দেখলেই বোঝা যায় যুক্তি নয়, মেয়েরা প্রবৃত্তির বশ । রবীন্দ্রনাথের কথা—পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত । কীভাবে

**৬৬. ভবিষ্যতের সাদা-কালো সমাজ । ভারতীয় দম্পতি আর ইংরেজ দম্পতির মিলিত বৈঠক । 'দি ইণ্ডিয়ান চারিভারি অর ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ' থেকে ।**

ওরা মন ভোলাবার চেষ্টা করছেন তার আভাস দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র বসু : "শরীরের উপরাঙ্গ সুব্যক্ত ও স্ফুটতর করিয়া দেখানোই তাঁহাদের চিরাভিলাষ । শরীরের যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন ভাবে আছে কাপড় দিয়া ঢাকিলেও সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন ঠিক সেই রকম দেখা যায় ইহাই বুঝি ইংরাজ মহিলার পোষাক নীতি ।"

চোখ বন্ধ করে আর যাই সম্ভব হোক না কেন, পোশাকের খুঁটিনাটি সমালোচনা সম্ভব নয় । একালের রূপের বিচারকদের মতো ফিতে হাতে আসরে না নামলেও সন্দেহ নেই কি তরুণ রবীন্দ্রনাথ, কি গিরিশ বসু—কেউ-ই বিশেষ দ্রষ্টব্যটুকু লক্ষ্য করতে ভোলেননি । গিরীশবাবুর 'ক্ষীণ-মধ্যা'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । রবীন্দ্রনাথের মনে পড়েছে 'বোলতা'র কথা ! বিদেশে মেয়েদের সঙ্গে ওঁরা প্রত্যেকে কমবেশি মিশেছেনও । ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় বিলেত গিয়েছিলেন 'এম্পায়ার অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' প্রদর্শনী উপলক্ষে । প্রদর্শনীতে তাঁকে নিয়ে টানাটানি । গ্রিনরুমে এক নাবিক ধরে পড়ল তার বউয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে হবে । আর এক জায়গায় দেখা গেল একটি তরুণী তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য উসখুস করছে । সুরসিক ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় কাউকেই নিরাশ করেননি । কেননা নয় তো ওরা কী করে আগামী ছ' মাস ধরে বলে বেড়াতে পারবে যে,—একজন সত্যিকারের 'ব্লাকি' দেখেছি, এমন কি তার সঙ্গে কথাও বলেছি । তিনি লিখেছেন, আমরা সব চেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষণা পেয়েছি মেয়েদের কাছ থেকে । সবুজ, ধূসর, নীল, কালো কত রঙের চোখ যে আমাদের এফোঁড়-ওফোঁড় করেছে কী বলব ! ওদের অন্যতম আলোচ্য ছিল আমাদের পত্নীসংখ্যা । ওরা ধরে নিয়েছিল গড়ে আমাদের আড়াই শ' করে গিন্নি রয়েছে । আমাদের একজন একটি মেয়েকে রহস্য করে বলল—আমার চল্লিশ নম্বর বউ সম্প্রতি মারা গেছে । তার জায়গা নিতে রাজি ? ইত্যাদি । মীর্জা আবু তালেব রূপের ভক্ত । তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়লে মনে হয় মেয়েদের কাছেও তিনি যেন চুম্বকের মতো । তালেব সেকালের আশ্চর্য অভিযাত্রী । তিনি ইংল্যাণ্ডে যাঁদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন, কথাবার্তা বলেছেন, সমানভাবে মিশেছেন প্রত্যেকেই তাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি, দেশ ও সমাজের মাথাবিশেষ । রাজা-রানী অসংখ্য ডিউক ডাচেস লেখক চিত্রকর ছাড়াও সে তালিকায় আছেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, ক্লাইভ প্রমুখ ধুরন্ধরগণ । তাছাড়া শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে নয়, মীর্জা আবু তালেব কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান—সব বিষয়ে পরম কৌতূহলী । কিন্তু এরই মধ্যে প্রকৃত রসিকের মতো তিনি ব্রিটিশ-সুন্দরীদের নিয়মিতভাবে দিয়ে চলেছেন তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ্য । ডাচ ভাষা না জানা সত্ত্বেও রূপসীদের সঙ্গে কেপ-এ তিনি এমন রসিকতা করেন যে লজ্জায় তাদের গাল 'দামাস্কাসের গোলাপের মত লাল' হয়ে যায় ! যথাস্থানে তিনি বলতে পারেন—না, এই মিষ্টি হাতের ছোঁয়ার পর চায়ে আর চিনি চাই না ! ( মেয়েদের মনোজয়ের ব্যাপারে

এই বাক্যটি মনে হয় বহুকাল ধরেই প্রেমের প্রথম পাঠে ছিল। কেননা, রবীন্দ্রনাথও বাঙালি যুবার মুখে শুনিয়েছেন একই কথা—'না নেলি তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছিনে! আবু তালেব অক্সফোর্ডশায়ারে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ লণ্ডনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, রাখ-ঢাক না ক'রে সোজাসুজি বলেন—আমি কামদেবের শরে আহত, লণ্ডনে আমার বান্ধবীর কাছে ফিরে না গেলেই নয়। লণ্ডনের নামে তিনি কবিতা লেখেন—অতঃপর আমরা জীবন সমর্পণ করব লণ্ডন আর তার চিত্ত আলোড়নকারী রূপসীদের হাতে। মক্কার শেখ যদি আমাদের এই কথোপকথন শুনে অখুশী হন, আমি পরোয়া করি না।...এখানে নতুন জীবন পেয়েছি আমি! চিত্রকররা তাঁর ছবি এঁকেছেন, তিনি আঁকিয়েছেন আপন বান্ধবীর চিত্র। মেয়েরা সাগ্রহে তাঁর 'মেহমানদার' হয়েছেন, তাঁকে বাহুবন্দী করে কুঞ্জে বেড়িয়েছেন। তালেব তাঁদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁরা সাগ্রহে সে-সব পদ্য সংগ্রহ করেছেন। 'পার্শিয়ান প্রিন্সে'র জন্য তাঁরা পাগল। মীর্জা আবু তালেব বারবার বলেছেন—তিনি 'প্রিন্স' নন। কিন্তু কার কথা কে শোনে। এহেন তালেবকেও দেখি চার বছর পরে (১৮০৪) কলকাতায় ফিরে আসছেন একাকী।

তাই বলে মেমরা যে সব জন্মজন্মান্তর ধরে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেই বন্দী রয়ে গেলেন তা নয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে ব্রহ্মধর্মের অনুরাগিনী একটি মেয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তিনি রহস্যচ্ছলে সে-কাহিনীর বিবরণ দিয়ে জানাচ্ছেন—"ভয়সা সাহেবের একটি মেয়ে সিন্ধু দেশের একটি ব্রহ্ম যুবককে বিবাহ করিয়া এদেশে আসিয়াছে, সে সেই মেয়েটি কিনা জানি না।" উপলক্ষ যা-ই হোক, মেমরা কেউ কেউ যে এদেশে আসবেন সে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। আমাদের তরুণদের প্রবাস জীবন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন "বাড়িতে পদার্পণ করেই (এঁরা) তাঁর ল্যাণ্ডলেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নেন। দু' তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নামকরণ হয়, সপ্তাহ অতীত হলে তার নামে হয়তো একটি কবিতা রচনা করে তাকে উপহার দেন।...ইত্যাদি।" ঘটনা এইভাবে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বাঙালী আগন্তুকরা মেয়েদের সঙ্গে যদৃচ্ছ মিথ্যে কথা বলেন, কেউই কবুল করেন না যে, তাঁরা বিবাহিত।" তাছাড়া প্রত্যেকে তারা এক একজন মস্ত ব্যাঘ্র শিকারী। এই সব সাজানো আর বানানো কথায় যদি বা কোনও মহিলা তাঁর দিকে একটু ঝুঁকলেন অমনি সেই দিনই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠি লেখা স্থগিত করলেন।' স্বদেশ থেকে কোন 'মান্য বন্ধু' তাঁকে শিখরিণী ছন্দে যা লিখে পাঠিয়েছিলেন তাতেও একই কথার প্রতিধ্বনি : 'ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে—/কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।/বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,/বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি!'

এ সব কাণ্ড যে অসম্ভব নয় তা পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্রও। তিনি লিখেছেন 'টাইমস'-এ তাঁরএক বন্ধু বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ভদ্রপরিবারে আশ্রয়ের সন্ধানে। তার উত্তরে চিঠি আসে শত শত। সবই প্রায় মেয়েদের লেখা। "অনেক পত্রেই লেখা যে, আমার পরিবার মধ্যে এক দুই বা ততোধিক প্রাপ্তবয়স্কা রূপবতী কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী বা অন্য কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বাস করেন;...কেহ কেহ তাঁহাদের পরিবারস্থ নবযৌবনসম্পন্না স্ত্রীলোকদের বয়ঃক্রম পর্যন্ত দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ বোধ করিয়াছেন।" তারপরও কি আশা করা যায় চিরকাল ওঁরা ওঁরাই থাকবেন, আর আমরা—আমরা? বহুকাল পরে (১৯৩২) এক বাঙালি দম্পতি—'দাসী' আর 'দোকানের কর্মচারিণী' নয়তো 'অপিসের টাইপিস্ট' মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি ছেলেদের নাচানাচি দেখে মন্তব্য করেছেন—'ফল যে কী হয় অনুমান করা শক্ত নয়।' (বিলাতে বঙ্গনারী—প্রতাপচন্দ্র দত্ত) গিরিশচন্দ্রও বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন—লক্ষণ ভাল নয়।—'এদেশে যেন একরকম প্রেমের দোকানদারি চলিয়াছে।'

সে-হাটে দেশের তরুণেরা যাতে কেনাবেচায় মেতে না-ওঠেন তার জন্যে কোমর বেঁধে আসরে নামালেন

**৬৭. দূর লণ্ডনে ভারতীয় প্রেমিক। বাবু হরিবংশে জব্বরজি আর মিস জেসমিনা বাইরে খেতে চলেছেন। 'বাবু হরিবংশে জব্বরজি, বি· এ' থেকে।**

## Advance Season's Millinery Fashions

## Quality Goods at Moderate Prices

M32/1063 Becoming Hat of Fancy Hemp Straw, trimmed three-color Petersham Ribbon. Colors: Green, Gold, Beige, Navy, Russet, Pink and Black.
Rs. **12-15**

M524 A Pretty Hat in Fancy Straw, with a dome crown, and with the brim wider on one side, trimmed two-color narrow Petersham Ribbon and Silk leaves worked on brim. In Tuscan trimmed Blue, Green, Brown, Beige and White trimmed Sky.
Rs. **12-15**

M32/606 Smart Hat in Hemp Straw, stitched with colored silk and finished with Petersham Ribbon. Colors: Light Blue, Nile Green, Gold, Beige, Crystal Pink, Oakapple and Black.
Rs. **17-8**

M32/805 Pretty Hat of ... Straw, trimmed with a ... of narrow Ribbon and Cr... line. Colors: Light ... Navy, Beige, Gold, ... Russet, Crystal Pink and ...
Rs. **25-8**

M32/1066 A large Leghorn Picture Hat, trimmed three-tone Petersham Ribbon and an Ornament. Colors: Light Blue, Navy, Oakapple, Beige, Gold, Light Green, Pink and Black. Rs. **21-8**

M814 Smart Hat of Fancy Cellophane, with a Crinoline edge, trimmed with Velvet. Colors: Grey, Mimosa, Flax, Sable, Cactus Green and Black.
Rs. **15-8**

M500 Becoming Hat of Fancy Shot Straw, with rows of Crinoline on edge of brim, trimmed with two-colored Petersham Ribbon and smart Buckle. Colors: Pearl Grey, Navy, Powder Blue, Red, Beige and Mid Brown.
Rs. **15-8**

M32/938 Hat in fine Ban... trimmed with narrow Pe... sham Ribbon and fine ... Straw. Colors: Light ... Green, Beige, Navy, Oak... Gold, Crystal Pink and ...
Rs. **19-8**

M1828 An Attractive Hat in fine Crochet Visca Straw, with Crinoline Straw on edge of brim, trimmed narrow Petersham Ribbon. Colors: Navy, Oakapple, Beige, Gold, Nile Green, Light Blue and Black.
Rs. **24-8**

M23/1074 An Attractive Hat of Fancy Pedal Straw, smartly trimmed with Satin Ribbon. Colors: Yellow, Pastel Blue, Light Beige, Light Nasturtium and Pastel Green.
Rs. **12-8**

M152 A Small Hat in Fancy Hemp Straw, trimmed with a Petersham Ribbon Band and Rosettes on side of Crown. In Light Brown, New Blue, Dark Beige and Beige. Rs. **5-15**

M32/1031 A Fancy Hemp Straw Hat, trimmed with narrow Petersham Ribbon and Lace Straw. Colors: Light Blue, Nile Green, Beige, Gold, Navy, Oakapple, Crystal Pink and Black. **Rs. 17-8**

আমাদের সমাজপতিরা। আর, বেচারা প্রেমিকদের এমনই মন্দভাগ্য, তাঁদের বিরুদ্ধে এইসব 'ধর্মযোদ্ধা'দের গোলা বারুদ জুটিয়ে গেলেন ভ্রমণকারী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা। এ-ব্যাপারে একমাত্র ভিন্ন মত দেখছি 'ডমরু-চরিতে'র লেখক, সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক বিষয়েই মুক্তদৃষ্টি-পুরুষ ত্রৈলোক্যনাথের। তিনি বলছেন : আমাদের বর্তমান সভ্যতা যদি আরও উন্নত হত এবং ভারতের ইউরোপীয়ানরা যদি জাতিবিদ্বেষ এবং বর্ণবিদ্বেষে এমন পীড়িত না হত, তবে আমি আমাদের যুবকদের বিলেতি-বিবি সংগ্রহ করতেই পরামর্শ দিতাম। কিন্তু আজকের অবস্থায় এসব অবান্তর চিন্তা। অন্যরা কিন্তু পুরোপুরি নিরুৎসাহী। সম্ভবত ভারতীয় তরুণদের উৎসাহকে দমন করার জন্যই তাঁরা দেখি সেদিনের স্বাধীন-রমণীর প্রশংসা করতে করতে হঠাৎ যেন পিছুতে শুরু করেছেন। এভাবে এক পা এগিয়ে দুই পা পিছানোর মধ্যে আজকের পাঠকের অন্তত মনে হবে এক সূক্ষ্ম রণকৌশল ক্রিয়াশীল। মীর্জা আবু তালেব ইংরাজ মেয়েদের এত সুখ্যাতি করলেন, মুক্ত নারীর এত বন্দনা গাইলেন, কিন্তু সে মেয়েরাই যখন প্রশ্ন তুললেন ভারতীয় রমণীর হাল সম্পর্কে তখন তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। নানা যুক্তি এবং কু-যুক্তি ফেঁদে তিনি বোঝাতে চাইলেন, পর্দা আদৌ খারাপ জিনিস নয়, মেয়েরা নাকি ইচ্ছে করেই পথে বের হতে চান না, আর বের হলে মিছেমিছি পয়সা খরচ। 'তিনি এমনকি বহুবিবাহের পক্ষেও সওয়াল করলেন। এ যেন ওভিংটন বর্ণিত সুরাটের (১৬৮৯) সেই গৃহস্থের আচরণেরই রকমফের। সাহেবকে তিনি নাকি বলেছিলেন—ইংলিশ ফ্যাশন, সাব, বেস্ট ফ্যাশন হ্যাভ, ওয়ান ওয়াইফ বেস্ট ফর ওয়ান হাসব্যাণ্ড! অথচ ঘরে নাকি তাঁর অনেক বউ। আকবর বাদশাও হারেমে তিনশ বিবি মজুত করে মজুতদারির বিরুদ্ধে এমনি বক্তৃতা করেছিলেন। সেই ট্রাডিশনই সমানে চলেছে তখনও।

মীর্জা আবু তালেবকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মোটামুটি একই বৈপরীত্য দেখি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও। প্রথমবার নারী স্বাধীনতার নামে তিনি উচ্ছ্বসিত,—ডগমগ। তাঁর পত্রাবলী পড়ে 'ভারতী' সম্পাদক যেন রীতিমত বিচলিত। ফুটনোটে কবির প্রতিটি বিবৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ—"স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত।" কেন না—দুই দেশের জলবায়ু স্বতন্ত্র। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—তুমি বিলেত বিলেত করছ কেন, জাপান কিংবা 'বোম্বাই দেশে'ও কি স্ত্রী স্বাধীনতা নেই? আমরা যখন দেখি তাঁর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েও রবীন্দ্রনাথ আপন ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তখন মনে মনে হাততালি দিয়ে উঠি। কিন্তু আমাদের এই সাহসী নায়ক যেন দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করতে গিয়ে রীতিমত দ্বিধাগ্রস্ত। আবু তালেবের মতই তিনিও সাহেবদের বলছেন,—"আমাদের সমাজ সম্পর্কে তোমরা কিছু বুঝতে পারবে না।' বলছেন—'আমার তো মনে হয় আমাদের মেয়েরা ইংরাজ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশী সুখী!"

এই সব বিবৃতি স্বদেশে কীভাবে গৃহীত হত সহজেই অনুমান করা যায়। একটু নমুনা দিচ্ছি। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে একটি বাংলা কাগজে (জন্মভূমি) দীর্ঘ একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় : বিলাতে নারী-সভা। লেখক লিখছেন—"আমাদের দেশে মেয়ে-যাত্রা আছে, মেয়ে-পাঁচালি আছে, মেয়ে-কীর্তন আছে, মেয়ে থিয়েটারের কথাও শুনিয়াছি; কিন্তু পূর্ণমাত্রায় মেয়েসভার এখনও স্ফুরণ হয় নাই। বিলাতে কিন্তু মেয়ে-সভা আছে।....হিন্দুর পবিত্রভূমে, ওরূপ নারীসভা তিষ্ঠিতে পারে না। সে যাহা হউক, একজন পুরুষ সেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা সকলেরই শ্রবণ করা উচিত।" বক্তা—"শ্রীযুক্ত উমেদরাম লালভাই দেশাই, জনৈক মারহাট্টা ব্রাহ্মণ যুবক, বিদ্যা উপার্জনার্থে বিলাতে আছেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান বিলাত গিয়াছেন অবশ্য গ্রহবৈগুণ্যে; কিন্তু পিতৃ-পিতামহের পূণ্যবলেই বলিতে হইবে, এই ব্রাহ্মণ যুবক মলিন ম্লেচ্ছভূমে নিক্ষিপ্ত হইয়াও একেবারে আত্মহারা হয়েন নাই।" বিলাতি-নারীসভায় ভাই লালভাই যা বলেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। তাঁর বক্তব্যসার : সহমরণ, সন্তান বিসর্জন অমানুষিক কোনও প্রথা ছিল না।

৬৮. **বিজ্ঞাপনের মেমসাহেবরা। চোখের সামনে দিয়ে যে বিবিজান চলে যান লবেজান করে, তিনিও কিন্তু বিজ্ঞাপনের সুন্দরীদের মতোই নাগালের বাইরে। কলকাতার সাহেবি দোকানের ক্যাটালগ থেকে।**

"পরন্তু তাহা বাল্যবিবাহ ও বৈধব্য প্রথার ন্যায় অতিপবিত্র ও স্বাস্থ্যকর অনুষ্ঠান ।" বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত : "কুমারী যখন একান্তই না পাওয়া যাইবে তখন না হয় আমরা বিধবা বিবাহ করিব । কিন্তু আগেভাগে কদাচ উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিব না ।" ইংরাজদের তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন—"আপনারা ঘরের মটকায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করেন যে, ইংলণ্ডে ইংরাজিনী যেমন সুখ ও স্বাধীনতা ভোগ করেন, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও নারীজাতির ভাগ্যে ঘটে না ।" কিন্তু আসল কথাটি এই "...হিন্দুস্থানে স্ত্রীজাতির অবস্থা অশীতি লক্ষ গুণে উৎকৃষ্ট ।" কলকাতার কাগজে এই বক্তৃতা উপলক্ষে মন্তব্য : এখন আমাদের দেশের লোক বুঝুন বিলাতে নারীজাতির সুখ কিরূপ ।
বিলেতে মেয়েদের সুখ নেই, শান্তি নেই, সমগ্র দেশ অনাচারে ভাসছে, মেয়েরা সেখানে সহজলভ্য, বিশেষত 'দাসীশ্রেণীর' মেয়েরা, এইরকম একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা দেখা যায় বিলেতে যারা যাননি তাঁদের রচনায়ও । এমনি একটি রচনা থেকে কয়েকটি শ্রবণ সুখকর বাক্য উদ্ধৃত করছি ।—"বিলাতে বিবাহ শিশুর খেলা—ইন্দ্রিয়ের লীলা" । "—ইউরোপীয় বিবাহ ইতর জাতির বিবাহের ন্যায় ।"...."প্যারিস নগরে প্রতি দেড়টি সন্তানের মধ্যে একটি জারজ ।"...."বিলাত অদ্ভুত রাজ্য, জনবহুল এই রাজ্যের অধিবাসী ; এই রাজ্যে জারজ সন্তানের নাম—ন্যাচেরাল চাইল্ড ।" তারপরই সহসা লেখকের হুঙ্কার—"কত দেখাইলে ! কত করিলে । কহিনুর লইলে লক্ষ্মৌ ভাঙ্গিলে । ব্রহ্ম জয় করিলে ! শিখ দমন করিলে !....কিন্তু (হে বৃষ !) তুমি আমাকে আমি যাহা চাই তাহা দেখাইলে কোথায় ?...." (বিলাতী সভ্যতা, জন্মভূমি ১২৯৭) ।
ভারতীয় অভিভাবকেরা যখন নানাভাবে বিলেতি মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছেন, অর্থাৎ ল্যাণ্ডলেডির মেয়েটির সঙ্গে বামুন-ঘরের ছেলেটির বিয়েতে ভাংচি দেবার চেষ্টা করছেন, মেয়ে-তরফও কিন্তু তখন বসে নেই । বিশেষ করে এ দেশের সাহেবরা । সেটা স্বাভাবিক । কেন না, "যে ভারতে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের কুলি ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারে না, যেখানে শ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গিনীদের বুটের আঘাতে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়দের প্লীহা ফাটিবার ষোলআনা সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে শ্বেতাঙ্গিনীরা কৃষ্ণাঙ্গদের ভার্যাত্ব মানিয়া লইবে—এও কি প্রাণে সহ্য হয় ?" (আনন্দবাজার, ১৯২৩)
বড়-ঘরের তথা রাজার-জাতের মান রাখবার জন্য ওঁরাও নানাভাবে মেয়ে সামলাবার চেষ্টা করেছেন । এ-ব্যাপারে এ দেশে সেদিন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ইংরাজ-পরিচালিত নানা পত্রপত্রিকা । কাগজে তখন প্রায়শ এ দেশের দুঃখিনী বউদের খবর বের হয় । যথা : একজন নেটিভ তার বউয়ের নাক কামড়ে দিয়েছে । অস্যার্থ—মেমগণ, সাবধান, নাক খোয়া যেতে পারে । কখনও কখনও তারা কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত । মিস মারি কার্পেন্টার দিশি মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করতে কলকাতা আসছেন শুনে একটি কাগজ লিখেছিল : ব্রাদার রাম ডস্-এর এবার খুব সুযোগ । মিস মেয়েদের সম্পর্কে যখন এত উৎসাহী তখন হিন্দু ছেলেদের দিকেই বা তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করা যাবে না কেন ? মনে হয় রাম ডস্ সে-জন্য তৈরিও হচ্ছে । ভালই হয়, মিস তবে জেনানায় কয়েদ হন ! আলিফ চীম'কৃত 'লেজ অব ইন্ড' (১৮৮৮) বইয়ে একাধিক কবিতায় সাদা-কালোর মধ্যে ঢলাঢলির ব্যঙ্গ করা হয়েছে । একটি কবিতায় একজন বিলেত ফেরত কৃষ্ণাঙ্গ রাজার চরিত্রে নানা পরিবর্তনের কথা বলে মেয়েদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—ভেতরে ভেতরে রাজা বাহাদুর কিন্তু সেই অকৃত্রিম নেটিভই রয়ে গেছেন । কবি খেদ করছেন—হায়, মেয়েরা তবু বোঝে না ।—"দোজ সিলিজ হু সাম হাউ ফিল সো সেন্টিমেন্টাল/দি মোমেন্ট দে মিট উইথ এ রিচ ওরিয়েন্টাল !" আর এক কবি কালো-বর নিয়ে ঘর করার ঝকমারি নিয়ে পদ্য লিখেছেন—

> "Needles and Pins
> Dart their black skins.
> When a girl marrys
> Her trouble begins."

৬৯. **স্বপ্ন-সুন্দরী । চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্বেতাঙ্গিনীরা । তবু তাঁরা অধরা, অলীক যেন । কেননা, রাজা-প্রজা সম্পর্ক । বাবুরা বোধহয় সেকারণেই আরও ঝুঁকেছিলেন মর্মর-সুন্দরীদের দিকে ।**

উনিশ শতকের একটি বিখ্যাত সাময়িকপত্র "দি ইণ্ডিয়ান চারিভারি" বা ভারতীয় "পাঞ্চ"-এর পাতায় পাতায় রয়েছে এমন অনেক ব্যঙ্গচিত্র মেম-মহলে কালোবরের কদর কমানোই যার একমাত্র লক্ষ্য। একটি চিত্রে কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ইংরাজ-মেয়ে ভারতীয় রাজপুত্তুর বলতে বোঝে সুবেশ সুঠাম তাজ-তলোয়ার শোভিত রূপকথার নায়ককে। আসলে যে সেটা নিছক কল্পনা দ্বিতীয় ছবিতে তা-ই দেখাবার চেষ্টা। শ্বেত-বিদুষকের আঁকা সে-চিত্রে দেখি পেটমোটা রাজপুত্র ধুতি পরে, খালি গায়ে হাতে তার হুকো। ঘরের এক কোণে ভৃত্য খোল বাজিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে। 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে'র উক্তির প্রতিবাদেও এই সাহেবি-হট্টমেলার পাতায় একই ধরনের ছবি,—বরের আসল চেহারা দেখে মেম পালাতে পারলে বাঁচেন!

শুধু কলকাতা আর বোম্বাইয়ে নয়, উনিশ শতকে বিলেতেও কালো-ছেলেদের সঙ্গে সাদা-মেয়েদের ফষ্টিনষ্টি নিয়ে নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাসি তামাশা। 'পাঞ্চ'-এ প্রকাশিত এফ অ্যানসটে লিখিত 'বাবু হারি বংশো জব্বরজি, বি-এ' (Baboo Hurry Bunghso Jabberjee, B. A.) বইটির কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এমন উপভোগ্য বই কদাচিৎ হাতে পড়ে, যদিও ব্যঙ্গের উপলক্ষ আমরাই।

জব্বরজি বঙ্গ সন্তান। বাবু কলকাতার ছেলে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। বিলেতে গেছেন তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে। বিচিত্র তাঁর সব অভিজ্ঞতা। সবই তাঁর কাছে অদ্ভুত ঠেকে, কিন্তু জব্বরজি কদাচিৎ বিচলিত। তিনি ওদেশের টম-ডিক-হারি নন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। শেক্সপীয়ার তাঁর মুখস্থ। তাঁর মুখে প্রতি মুহূর্তে জটিল বাক্য, প্রতিবার নিঃশ্বাস ফেলতে তিনি ইংরাজী ফ্রেজ তো ব্যবহার করেনই, যথাস্থানে লাতিন ব্যবহারেও তিনি রীতিমত পারঙ্গম। (যদিও তিনি অনারেবল ইবসন বা তাঁর থিয়াট্রিক্যাল ড্রামার কথা শোনেননি, জনসনকে 'বসওয়েলস বায়োগ্রাফি'র লেখক বলে জানেন!) শুধু তাই নয় তিনি টেনিসন-কুপার অ্যাণ্ড কোং-এর মতো কবিতাও লিখতে পারেন। এবং সে অধিকার বলে রাজকবি হওয়ার বাসনাও প্রকাশ করেন।—কেন আমাকে নিয়োগ করা হবে না? রানী যখন ভারতেরও সম্রাজ্ঞী তখন দু'জন সভাকবি থাকাই সঙ্গত নয় কি?

যা হোক, এমন তুখোড় একদিন জীবনেও এল জব্বরজির প্রত্যাশিত সংকট। ল্যাণ্ডলেডির মেয়ে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে এল। আজ তাকে নিয়ে চিত্রশালে যেতে হয়, কাল প্রদর্শনী কিংবা মেলায়। অবশেষে প্রণয়। সেদিন মেয়েটি বলল—প্রাসাদে থেকে তোমার অভ্যাস, আমাদের এ-বাড়িতে নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া, অনেকদিন বাঘ শিকারেও যেতে পারছ না,—তাই না? বাবুজি সংক্ষেপে হ্যাঁ, না জবাব দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আর পারলেন না, আত্মসমর্পণ করতেই হল। আর তক্ষুনি, ঠিক তক্ষুনি, ('হুয়াইল ইমপ্রিন্টিং এ চেস্ট স্যালুট আপন হার রোজ বাড লিপ্স') ঘরে ঢুকলেন 'হার ফিমেল পেরেন্ট',—মেয়ের মা। বালিকা ঘোষণা করলে আমরা—'এনগেজড।' জারজী এর পর থেকে মিস্ জেসমিনাকে জেসি বলে ডাকেন, তার মাকে বলেন—মাম্মা।

দিন কাটে। এদিকে হঠাৎ এক সহপাঠীর বোনকে দেখে বাবুজি আবার সমস্যায়। এ মেয়েটির ডাক নাম মিস 'উই-ই—উই-ই!' সে বড়ঘরের মেয়ে। জেসির চেয়ে দেখতে ভাল। সুতরাং, বাবুজি তাঁকে নিয়ে শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান দেখতে গেলেন। ক্রমে তিনি ওদের কাছাকাছি থাকবার জন্য বাড়ি পালটালেন। জেসমিনা এত সহজে তাঁকে ছাড়বার পাত্রী নয়। সে লেগে রইল। জব্বরজি তাকে লিখলেন—দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হলে রক্ষে নেই। আমাদের পারিবারিক গণৎকার বলেছে, আমার সিংহ রাশি আর তোমার মেষ রাশি। প্রকৃতি-বিজ্ঞান পড়লে জানতে পারবে এই দুইয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক। জেসমিনা তবু নাছোড়বান্দা। জব্বরজি তাকে লিখলেন—দেখ, আমি 'প্রিন্স' নই। লণ্ডনের অমুক ঠিকানায় কলকাতা

৭০. মিস উই-ই উই-ই আর বাবু জব্বরজি। ওরা সেক্সপিয়ারের বাড়ি দেখতে চলেছেন। 'বাবু হরিবংশ জব্বরজি, বি. এ' থেকে।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব এক জজ আছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে আমি আসলে একজন সম্পন্ন মোক্তারের ছেলে। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। আমরা ইচ্ছে করলে তিরিশ চল্লিশটি বিয়ে করতে পারি। আমি অবশ্য এখনও সে-অধিকার প্রয়োগ করিনি। তবে বাল্যে একবার বিয়ে করেছি। আমার বন্ধু 'বাবু চুকেরবর্তিরাম'কে জিজ্ঞেস করলেই সত্যাসত্য জানতে পারবে। ইত্যাদি। জেসমিনা আর তার মা যখন দেখল এ ছেলেকে ধরা শক্ত, তখন ওঁরা ছুটলেন আদালতে।—তাতে কী আসে যায়? বাবুজি ইতিমধ্যে ব্যারিস্টার হয়ে গেছেন। স্থির করলেন নিজেই নিজের মামলা লড়বেন। সে তখন দেখা যাবে। তখনকার মতো তিনি চললেন স্কটল্যাণ্ডে, মিস উই-ই-উই-ই'র মা-বাবার পল্লীভবনে ছুটি কাটাতে। সেখানে শেষ পর্যন্ত সুবিধা হল না। উই-ই-উই-ই মালাদান করলেন স্থানীয় এক যুবাকে। সেজন্য বাবুজির কোনও খেদ আছে মনে হয় না, জয় মা-কালী বলে তিনি লণ্ডনে ছুটলেন মামলা লড়তে।
মামলায় বিবাদীরা হেরে গেলেন। মুক্ত বাবুজি এবার কলকাতার জন্য সাগ্রহ অপেক্ষায়। বইটির আগাগোড়া শিক্ষিত বাবুর ইংরাজীতে লেখা। তার কাছাকাছি নমুনা বলা যেতে পারে বোধ হয় মহেন্দ্রনাথ মুখার্জি কৃত 'মেমোয়ার অব লেট অনারেবল অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি'।
('The Memoir of the late Honourable Onoocool Chunder Mukherjee'—1875)
যা পড়ে মার্ক টোয়েন পর্যন্ত মুগ্ধ। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কলকাতার সাহেবি কাগজে তখন আর এক বাঙালি চরিত্র 'বাবু ঘী চন্দর বাটারজী'!) কিন্তু জারজী কি শুধুই হাসির বই। অবশ্যই নয়। লেখক কিন্তু প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন এ-বইয়ের জেসি হাবা-মেয়ে, বুদ্ধিমতী যদি কেউ থাকে তবে সে উই-ই-উই-ই। আর জারজী?—ওই ছোকরা সরল হলেও জটিল, আপাত বোকা হলেও, অতিশয় চালাক। সুতরাং সে নিছক হাসির পাত্র নয়, তার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকাই ভাল।
কন্যাপক্ষ এবং পাত্রপক্ষ, দু'তরফের প্রাণপণ চেষ্টায়ও কিন্তু নিয়তিকে ঠেকানো গেল না। উনিশ শতকে সাধারণ ঘরেও সাদা আর কালোর মালা বদলের ঘটনা অনেক। অনেক অর্থ অবশ্য অগুন্তি নয়। পাড়ায় পাড়ায় সত্যিকারের মেম-বউদি তখন অবিশ্বাস্য দৃশ্য, অতি-ফর্সা বা রাঙা-বউরাই তখন কোনও কোনও পল্লীতে আদরের মেম-বউদি। কেন না, প্রভূত ধৃষ্টতা ছাড়া কারও পক্ষে সাদা মেয়ে আমদানি সেদিন সম্ভব নয়। আজ হয়তো বিদেশ থেকে একখানা মোটরগাড়ি বা ক্যামেরা আনা অনেক কঠিন, তুলনায় বেশ সহজ বউ আনা। সেদিন, বলা নিষ্প্রয়োজন, দুই-ই বেশ কঠিন, ট্যাঁক এবং কলজেয় যথেষ্ট জোর না থাকলে সমুদ্রের একূল থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া করার কিছু ছিল না। মনে রাখতে হবে প্রমথ চৌধুরী চার ইয়ারী গল্প-এর (১৯১৬) চার শেতাঙ্গিনীই স্বপ্নসুন্দরী, শেষ পর্যন্ত অধরা। যদিবা কেউ ধরা দিল তখনও সেই পুরনো তর্ক,—এ বিয়ে কি ঠিক?
প্রশ্নটা তুলেছিলেন অন্তত একজন বিদেশী বউ নিজেই। মেয়েটির নাম ফ্রিডা। দেশ—সুইজারল্যাণ্ড। আমেরিকায় গিয়েছিলেন তিনি লেখাপড়া করতে। সেখানেই ক্যালিফোর্নিয়ায় ভারতীয় তরুণ সরঙ্গধর দাসের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় এবং বিয়ে। দাস ওড়িশার ঢেঙ্কানলের ছেলে। তাঁর মামা অথবা কাকা ছিলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সরঙ্গধর লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন। রাজা উদ্যোগী হয়ে তাঁকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন চিনির কলের ব্যাপারটা বুঝে আসতে। এসব রুশ-জাপান যুদ্ধের পরের কথা। সরঙ্গধর সেখান থেকে চলে যান আমেরিকায়। তারপর ফ্রিডার সঙ্গে ভালবাসা। ফ্রিডা তাকে বলেন—আমার ভালবাসার 'সুগার-কিং।'
পাত্র পাত্রী দুজনেই উচ্চশিক্ষিত। ফ্রিডা ভারত সম্পর্কে বিস্তর খবর রাখেন। এদেশের কাগজে তিনি প্রবন্ধাদিও লেখেন। লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। আমেরিকায় চেনাজানা হয়েছে সার

৭১. আমোদের সন্ধানে ইউরোপে ভারতীয় রাজা। শাসকদের সতর্ক প্রহরাকে বানচাল করে দিয়ে তারা কেউ কেউ ঘরে ফিরতেন শ্বেতাঙ্গিনী সুন্দরী নিয়ে।

জগদীশ এবং লেডি অবলা বসুর সঙ্গেও। সকলের এক পরামর্শ—চলে এসো।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামী স্ত্রী এসে নামলেন বোম্বাই। প্রথম মহাযুদ্ধ সবে মিটেছে। ভারতে আবির্ভূত হয়েছেন নতুন কালের নায়ক গান্ধী। কিন্তু ওঁদের অন্যদিকে তাকাবার অবসর কোথায়? প্রথম হোঁচট বোম্বাইয়ে, সেখানে কেউ ওঁদের ঘরভাড়া দিতে রাজি নন। তারপর ক্রমে ক্রমে আরও অভিজ্ঞতা। ফ্রিডা তার বিস্তারিত কাহিনী বর্ণনা করেছেন তাঁর বইয়ে; এ বইয়ের (A marriage to India—by Frieda Hanswirth, 1931)

পাতায় পাতায় একটি স্পর্শকাতর বিদেশী মেয়ের কান্না। এমন সূক্ষ্ম হৃদয়বিদারক রচনা সমসাময়িক আর কোনও বিদেশিনী লিখেছেন বলে জানি না। বড় বড় শহরের স্বদেশী ঘরে বিদেশী বউদের সম্পর্কেও অনেক খবর শুনিয়েছেন তিনি।

ফ্রিডার মতে ভারতে ভারতীয়কে নিয়ে সুখের সংসার পাতার পক্ষে হাজার সমস্যা। তার আগে কয়েকটা শর্ত পূরণ হওয়া অত্যাবশ্যক। চাই—ভারতের স্বাধীনতা। চাই—আন্তর্জাতিকতার আরও প্রসার। সাদা কালোর মধ্যে বাইরে যে সম্পর্ক তাতে দু'জন মানুষের ভালবাসা, তা যত গভীরই হোক না কেন, সুখী শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ভারতীয়কে বিয়ে করলেই সুখ হবে না, ফ্রিডা বলেন—বিয়ে করতে হবে গোটা ভারতকে। ক'জন সেটা পারেন? সুতরাং, বিয়ের পর দ্বিরাগমনও চলছে।

প্রায় দশ বছর ভারতে ঘর করার পর ফ্রিডার কথা:

None but the Supremely great or Supremely favoured or Supremely dull, could hope to succeed in the present age.

অর্থাৎ, হয় কোনও মহিয়সী, না হয় কোনও বিলাসিনী, অথবা নির্বোধ রমণী—সফল হতে পারে একমাত্র তারাই।

'মাদ্রাজ মেল' বনাম 'আনন্দবাজারে'র বিতর্ক অতএব আমাদের কাছে আজ যত অবান্তরই মনে হোক, ফ্রিডার মতে মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। ওঁর জবানবন্দী আর সেই সম্পাদকীয়টি কিন্তু কাছাকাছি সময়েরই রচনা। আনন্দবাজার লিখছেন—"কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না। ভারতীয় পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গিনী নারী....এই দুই পক্ষের একজনেরই নির্বুদ্ধিতার ফলে বিয়োগান্ত নাটকের সৃষ্টি হয় এমন কথা কেহই বলিবে না।" ফ্রিডা কিন্তু নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা মানতে নারাজ। স্বামীকেও তিনি একবারও বলেননি—তুমি বোকা।—সারঙ্গ তুমি নির্বোধ। বিদেশিনী ধিক্কার যদি কাউকে দিয়ে থাকেন তবে দুইটি নিষ্ঠুর, অন্ধ, সংকীর্ণ, জড়বুদ্ধি সমাজকেই। অর্থাৎ—যুগকে। বিদেশ থেকে প্রকাশিত 'পলাতকা'র বিষণ্ণ বিয়োগান্ত এই জবানবন্দীটি কিন্তু উৎসর্গ করেছেন তিনি তাঁর ভারতীয় স্বামীকেই, '—টু এস ডি'। সরঙ্গধর তখনও ঢেঙ্কানলের এক দুর্গম এলাকায়। হয়তো মাঝে মাঝে মনে মনে আর্ত চীৎকার করছেন—ফ্রেডি!—ফ্রেডি! স্বপ্নটা কিন্তু ওঁদের দু'জনেরই ছিল।

# সেদিনের দিশি মেমরা

"কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী।... সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘ কেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্ব সহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে ; খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদালীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে তাকে দেখতেই পায় না, যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না,...প্রথম বয়সে ঠোঁট দুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে।...মোটের ওপর চোখে পড়ে, উপরের পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত ; আর অনাবৃত বাহু দুটিকে কখনও কখনও টেবিলে, কখনও চৌকির হাতায়, কখনও পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গীতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জিত নখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলঙ্করণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সবচেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চখুরওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গীমায়।"—শেষের কবিতা

বাঙালি সমাজে সাধারণের চোখে দিশি-মেমের উজ্জ্বলতম নমুনা ছিল এক সময় রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'র কেটি মিটার,—ওরফে কেতকী মিত্র। 'শেষের কবিতা' বাংলা ১৩৩৫ সনে লেখা। ইতিমধ্যে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কেটির খোঁজ আজ আর শিলং-দার্জিলিং, সিমলা-নৈনিতাল বা দিল্লি বোম্বাই কলকাতা ছুটে বেড়াতে হয় না। ছোট বড় মাঝারি—ভারতের সব শহরেই কম বেশি তাঁদের দেখা যায়। কেটির বৈশিষ্ট্য : সে চুল ছাঁটে। সে হাইহিল জুতো এবং লো-কাট ব্লাউজ পরে। সে মুখে স্নো-পাউডার-রুজ মাখে, ঠোঁটে লাগায় লিপস্টিক, নখে নেইল-পালিস ! তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সর্বক্ষণ তার হাতে থাকে একটি 'চেনওয়ালা থলি।' অর্থাৎ, ভ্যানিটিব্যাগ ! শুধু তা-ই নয়, কথাবার্তায়ও কেটি নাকি অন্যরকম। সে ইংরাজী মিশিয়ে বাংলা বলে। কখনও বা বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেয়, কিংবা ছুঁড়ে দেয় ইংরাজী বাক্য। কেটির মেমগিরির চূড়ান্ত হাতে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সে অপরিচিতের কাছে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে বলে বসে—গট ম্যাচেস !

আজকের দিশি-মেমরা, বলাই বাহুল্য, কেটিকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। আমি এমন একজন

৭২. 'রং কোঅপারেশন।' গায়ের রঙ বলছে এ সহযোগিতা ভ্রান্ত। গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গ চিত্র। 'অদ্ভুত লোক' থেকে। শিল্পীর মন্তব্য—দিন পাল্টাচ্ছে। সেই সঙ্গে পাল্টাচ্ছি আমরাও।

বাঙালি-মেমকে জানি যিনি একহাতে স্টিয়ারিং ধরে অন্যহাতে অনায়াসে ঠোঁটের সিগারেট ধরাতে পারেন। এমন বাঙালি-মেম দেখার সৌভাগ্যও হয়েছে এই অধমের যিনি একখানাও বাংলা বই পড়েননি। দেখেছি এমন মেম যিনি বিলাতি বুলি ছাড়া বলেন না, বিলাতি প্রসাধন ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শ করেন না, এবং বিলাতি পানীয় ছাড়া তাঁর তেষ্টা মেটে না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শাড়ি পরিয়েই কেটিকে হাজির করেছিলেন আমাদের সামনে, কিন্তু আজকের দিশি-মেমরা কে না জানেন, পোশাকে রীতিমতো আন্তর্জাতিক। নাইটি প্যান্টি, মিনি ম্যাকসি, সুইমিং সুট—তাঁদের কাছে কোনও কিছুই অবিদিত নয়। কেটির হাতে সিগারেট দেখে আঁৎকে ওঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সিগারেট তো ডাল-ভাত। একটি আসরে একজন দিশি-মেমকে বলতে শুনেছিলাম—নো, আই লাইক ইট নীট। ঘর ভর্তি ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা সপ্রশংস দৃষ্টিতে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন সাহসী বাঙালি মেয়েটির হাতের গ্লাসটির দিকে। মধ্যরাতে খাওয়ার ডাক যখন এলো তখন তাঁকে নিঃসঙ্কোচে বলতে শোনা—নো, থ্যাঙ্ক য়ু, আই ডোন্‌ট লাইক টু স্পয়েল মাই ড্রিংকস উইথ ফুড।

তবু যে আজ এই খৃষ্টীয় ১৯৭৮ সনে দিশি-মেমদের নিয়ে লিখতে বসেছি তার কারণ একটাই, নিত্য আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যেসব বিবিজান চলেছেন দর্শকের লবেজান করে তাঁদের একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া—এ-সিদ্ধি এক দিনে আসেনি। মেমগিরির পক্ষে তাঁদের আগেও ছিলেন সাধিকার দল। পঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙালি মেয়ে কেটি মিটার তাঁদেরই একজন। সেদিক থেকে বিচার করলে কেটি বোধহয় সম্পর্কে আজকের সব দিশি-মেমের দিদি।

কেটি-মিটার বাংলায় সিরিয়াস সাহিত্যে প্রথম সত্যিকারের বাঙালি-মেম। কিন্তু তার অনেক আগেই বাংলা-প্রহসনে আবির্ভূত হয়েছিলেন আরও কিছু কিছু কেটি। কেটি অবশ্য বিলেত-ফেরত। সে লেখাপড়া করেছিল অক্সফোর্ডে। উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালি সমাজে 'মেম' খেতাব পেতে হলে কিন্তু বিলাত যাত্রা করতে হত না, অক্সফোর্ড কেমব্রিজেও পড়তে হত না। তার জন্য কলকাতার স্কুল কলেজই ছিল যথেষ্ট। যে মেয়ে লিখতে পড়তে জানে বাড়ির বাইরে বের হতে যার আপত্তি নেই, যে নভেল পড়ে বা পদ্য লেখে সে-ই তখন 'মেম'। উনিশ শতকের শেষ দিকে তাদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল অসংখ্য প্রহসন। তাদের নাম শুনলেও আন্দাজ করা যায় দুই মলাটের ভেতরে কী ছিল। যথা : পাসকরা মাগ, স্বাধীন জেনানা, নভেল-নায়িকা বা শিক্ষিত-বউ, বৌমা, কলির মেয়ে ও নবাবাবু, ছোট বউয়ের গুপ্ত প্রেম, বৌবাবু, শ্রীযুক্তা বৌবিবি, মাগমুখো ছেলে, মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা, পাস-করা আদুরে বৌ, মিস বিনো বিবি বি-এ—ইত্যাদি ইত্যাদি। সব রঙ্গ ব্যঙ্গের উপলক্ষ—'মেম'। অর্থাৎ লেখাপড়া জানা আধুনিক বাঙালি মেয়ে। আর যেসব মা বাবা অথবা স্বামী তাদের উৎসাহ জোগান তাঁরা।

'পাস-করা মাগ'-এ 'বেথুন স্কুলে হাই প্রাইজ' পাওয়া বাঙালি মেয়ে কিরণশশী বলছে—যেদিন তার বোনের বিয়ে হয় সেদিন কিরণের মুখে "ইংলিশ স্পীচ" শুনে তার স্বামী নাকি "থান্ডার স্ট্রোক" হয়েছিল। আর মেমের মতো তার বাহারি "ড্রেস দেখে ফেয়ারী (পরী) মনে করে, জগৎকে নাথিং জ্ঞান করেছিল।" কিরণ পুরুষবন্ধুর হাত-ধরে গান গায়—"ও প্রাণ ডিয়ার/ভ্রাতা সব কাম হিয়ার।/ লেকচার দিব গার্ডেনে, হাত ধরে পুরুষ সনে/ বেড়াইব নির্জনে, দিবানিশি হৃদয় চিয়ার।/ হাজব্যাণ্ডে করে ডিসমিস, হয়েছি প্রাণ নিউ মিস,/ দিব আমি সুইট কিস,—ফ্রি লাভ নেভার ফিয়ার!" এই 'মেম' মেয়েটি অবলীলায় একজন স্বামীকে ত্যাগ করে আর একজনের গলায় মালা পরিয়ে দেয়। কেননা, "হিন্দুর ডটার হলেও অনেক লেকচার অ্যাটেণ্ড করে ও অনেক ইংলিশ সভ্যের সঙ্গে ওয়াকিং এবং ইটিং করে সে বিলাতি সভ্যতা শিখেছে। এখন সে সভ্য লেডি হয়েছে!"

আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড-ফেরত কেটির হাতেও সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তুলে দিতে

৭৩. **বিদ্রোহিনী মৃণালিনী। আপন ভাগ্যকে জয় করার অধিকার সেদিন অবলীলায় কেড়ে নিয়েছিলেন এই নারী।**

পারেন নি। কিন্তু বাংলা প্রহসনের কোনও কোনও 'মেম' যেন পানাসক্তিতে জলের মাছের মতোই। বিবিয়ানার অন্যতম লক্ষণ অবশ্য তৎকালে মদ্যপান করা নয়, পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বের হওয়া, হোটেল রেস্তোরাঁয় খাওয়া, ইংরাজী মিশিয়ে কথা বলা, ঘরের কাজ না-করে সাজগোজ করে বসে বসে নভেল পড়া—এসব। কিন্তু কোনও কোনও মেয়ে বইয়ের সঙ্গে দিব্যি হাতে তুলে নেয় গ্লাস। "কামিনী" নামের এক প্রহসনে নায়িকা নিয়মিত ড্রিঙ্ক করে। মত্ত অবস্থায় একদিন সে একজন বিবাহিত পুরুষ বন্ধুর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। সে বাড়িতে সেদিন মাইফেল বসেছে। বাইরের ঘরে বাঈজীর নাচ হচ্ছে। অন্দরমহলে কামিনিও নাচতে শুরু করে। তাকে কিছুতেই আর শান্ত করা যাচ্ছে না। সে বলে—"আমরা যাবো মুজরো শুনতে? আমাদের মুজরো কে শোনে!"



একটি বাংলা-প্রহসনে দেখি মেয়েরা কলকাতার পথে দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে চলেছে—"আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে,/ চুরুট মুখে, ছড়ি হাতে।/ বেড়াব, হোটেলে যাব, সাপার খাব,/ ফিরব আবার রাতে রাতে।" এই দলটিই গঙ্গায় জাহাজে উঠে আবার গান ধরে—"আয়, আয় আয়, দেখরে হেথায়/ স্বাধীন পবন বইছে এখন।/ স্বাধীন লতা, পাতা/ স্বাধীন প্রাণে দুলছে কেমন।" আর একটি প্রহসনে নায়িকা বলছে মা-বাবার পছন্দ করা বর তার আদৌ পছন্দ নয়। তার সাফ কথা—"প্রণয়ে যুদ্ধ হল না, বিচ্ছেদ হল না, বিরহ হল না, যাতনা হল না, আমার হিস্টিরিয়া হল না (আর) তবু আমার সহজ বিবাহ হবে!" সে কিছুতেই তাতে রাজি নয়। সে 'মেম' হবে। নিজেই পছন্দ করে নেবে তার বর।

প্রহসনের নায়িকারা কেউ তখনও কেটির মতো কালাপানি পাড়ি দেয়নি। তবে বিলেত যাওয়ার কথাবার্তা চলছে তখন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনে (১৮৮৪) জনৈক সিং একটি শিক্ষিতা বাঙালি মেয়েকে বলেছেন—"নেটিভ স্ত্রীলোক বিলাতে গেলে সাহেবরা যত্ন তো যত্ন—লুফে নেয়।" সে বলে—"You will be a curiosity there! ওঃ আপনি বাড়িতে খাবার শোবার সময় পাবেন না। Tea there, Dinner here, Picnic aborad, Yachting, Skating, Riding, Driving, Sightseeing,—আজ Crystal Palace, কাল Vaux Hall, holiday|everyday and presents! Rings, Broaches, Dresses: a-la Paris!"

সেদিনের দিশি-মেমদের এক স্বপ্ন—বিলেত যাওয়া, খাস বিলাতি হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো। কিংবা যদি না-পারা যায়, তবে এদেশেই সত্যিকারের সাহেব মেমদের সঙ্গে খানাপিনা নাচা গানা কিংবা হল্লা করা। কিন্তু কজনের ভাগ্যে আর তা ঘটে। সত্যিকারের খানদানী সাহেবদের নাক সেদিন খুবই উঁচু। বিশেষত, সরকারি কর্তাব্যক্তিরা। তাঁরা আমাদের বড়ঘরের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে। বোধহয় একালেও তা-ই নিয়ম। সাহেব ভাবাপন্ন সত্যিকারের এদেশী বনেদী পরিবারের বাবু বিবিরাও কিন্তু লোকদেখানো আজকের দিশি সাহেব মেমদের তাচ্ছিল্যই করেন। সেদিনের পরিবেশ স্বভাবতই আরও জটিল। একটি প্রহসনে দেখি লাটভবনে "বল" নাচে যোগ দিতে গেছেন একজন বাঙালি বিবি। সাহেব মেমরা নিজের ম্যাচ মিলিয়ে নাচছেন, কেউ আর তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। তা-ই দেখে এক গোরার করুণা হল। সে আমাদের "দিশি ম্যাম" "মিসেস উলুইচণ্ডীকে দেখে মনে মনে বলল—"সি ইজ এ প্রেটি ইয়ং লেডি, কিন্তু আপসোসের বিষয় এই সব ইউরোপিয়ান নেটিভকে ঘৃণা করে বলে ওর সঙ্গে কেউ আলাপ পর্যন্ত করছে না।" "মিসেস উলুইচণ্ডী"কে ডেকে বলে—'তুমি নেটিভ হেটারদের সঙ্গে কক্ষণো আর মিশতে চেষ্টা করো না। তোমার হাজব্যাণ্ডকে বলে বরং ফের পর্দানসীন হওগে, তাহলে আর এমন ফলস পজিসনে পড়তে হবে না…!' কোনও কোনও দিশি-মেম এখনও স্বদেশেই কিছু কিছু আসর থেকে কিন্তু মনে মনে এ-ধরনের প্রতিজ্ঞা নিয়েই ঘরে ফিরতে বাধ্য হন। কেননা, দিশিমেমদের মধ্যেও 'U' আর "Non-U" উচ্চ

**৭৪. তরু দত্ত। যদিও সযত্নে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত তবু রামবাগানের দত্ত পরিবারের এই প্রতিভাময়ী কন্যা ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙ্গালিনী।**

নীচ ভেদাভেদ আছে। এক মেম হয়তো ঠোঁট বাঁকিয়ে অন্য মেমকে বলেন—"এবারই বুঝি তোমরা প্রথম কন্টিনেন্টে গেলে!" কিংবা—সরি, বাই 'বাপু' য়ু মিন গান্ধী, ইজ নট ইট!" অথবা—এক্সট্রিমলি সরি, উইল ইউ প্লিজ টেল মি হু ইজ প্রেমচানড,—আই হিয়ার, হি ইজ মেকিং এ ফিলম উইথ রে ইন ক্যালকাটা! (এই 'মেমে'র কাছে 'রে' অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় 'আপার', কিন্তু মুন্সী প্রেমচাঁদ 'নন-ইউ', তিনি মোটে তাঁর নামই শোনেননি!)

প্রহসনে, সন্দেহ নেই, ব্যঙ্গের অন্যান্য উপলক্ষের মতো দিশি-মেমদের নিয়েও কিছু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। সেটার কারণ বুঝতে কোনও অসুবিধা নেই। উদ্দেশ্য যেখানে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, কশাঘাত সেখানে নির্মম হাতে চালানো হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এভাবে ফেনিয়ে বলা, সন্দেহ নেই, সমালোচনাকে অসহ্য করে তোলার জন্যই। তাছাড়া আরও একটা কথা। উনিশ শতকের এইসব বই পড়লে সহজেই জানা যায় দিশি-মেমদের সম্পর্কে প্রহসন লেখকদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ, কিংবা তাদের ধ্যান ধারণা বা জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে আদৌ কোনও অভিজ্ঞতা নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্ত লেখক যখন বড়ঘরের কাহিনী নিয়ে উপন্যাস ফাঁদেন তখন যে-কৃত্রিমতা উঁকি দেয়, এসব প্রহসনেও তা-ই চোখে পড়ে মাত্র। ঔপন্যাসিক যেমন অনেক সময় ড্রেসিং গাউন, পাইপ আর অ্যালসেসিয়ান দেখিয়েই মনে করেন বড় মানুষ দেখানো গেল, প্রহসনকারও তেমনই মাথায় বব্‌করা চুল আর ঠোঁটে লিপস্টিক দেখিয়েই বোঝাতে চেয়েছেন ইনি একজন 'মেমসাহেব।'

তাই বলে এমন মনে করার কোনও কারণ নেই যে, বাস্তবে সেদিনের বাঙালি সমাজের অঙ্গনে মেম-বিবিদের ছায়াপাত পর্যন্ত ঘটেনি। উনিশ শতকে নব্য-বাংলা উত্থান এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের পর বাংলায় যে নতুন প্রেক্ষাপট তারই পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করে দেখতে হবে এইসব শস্তা পুঁথিপত্র। বাস্তবেও কমবেশি সবই ঘটছিল তখন। ঘটছিল নানা অভাবিত কাণ্ডকারখানা। তারই মধ্যে কখনও সখনও খুটখুট পায়ে ভুবন আলোড়িত করে সত্যি সত্যি সেদিন চলাফেরা করছিলেন এমন কিছু বাঙালি মেয়ে সমাজের চোখে যাঁরা—মেম।

শ্যামল কোমল, শাড়ি পরা, খোঁপা-বাঁধা বাঙালি মেয়েকে মেম-এ পরিণত করার ব্যাপারে ইংরাজীশিক্ষার ভূমিকার কথা আজ সকলের জানা। মেম-গড়ায় ব্রাহ্মসমাজের অবদানও প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয়। বিশেষ করে বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন এবং একসময় বাঙালি 'সংস্কৃতির রাজধানী' বলে গণ্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির। কেশব সেন অনেক বিষয়েই কলকাতায় ফার্স্ট। তাঁর কলুটোলার বাড়ি থেকে প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে পালকি চড়ে জোড়াসাঁকো যাত্রা করে কলকাতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। কলকাতার রাজপথে সে-ই নাকি প্রথম সস্ত্রীক পালকি ভ্রমণ। কলকাতায় তিনিই প্রথম গড়ে তোলেন ব্রাহ্ম মহিলাদের এক সংঘ—"ব্রাহ্মিকা সমাজ।" তাঁরই উৎসাহ আর উদ্যোগে ১৮৬৬ সনে কলকাতায় দেখা যায় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য—মাঘোৎসবে শুধু পুরুষ ব্রাহ্ম নয় যোগ দিয়েছেন মহিলারাও। তাঁরা অবশ্য আসন পেয়েছিলেন চিকের আড়ালে! তা-ই বা কম কীসে? প্রগতিশীল ব্রাহ্ম তরুণরা কিন্তু চিকের আড়াল মেনে নিতে রাজি হলেন না। আন্দোলন করে বাঁশের-পর্দা উচ্ছেদ করেছিলেন তাঁরা, মেয়েরা অধিকার পেয়েছিলেন পুরুষদের পাশে বসবার। তার কিছুদিন পরেই কেশব সেন আর এক চাঞ্চল্যকর কাণ্ড করে বসলেন। একদল ব্রাহ্ম মহিলাকে নিয়ে তিনি চললেন বরসন নামে এক পাদরির বাড়ি চা-পার্টিতে যোগ দিতে। আবার চায়ের-পেয়ালায় তুফান। এমনি করেই ধীরে ধীরে আলো ফুটছিল সেদিন। আর, অবশিষ্ট সমাজের মতো প্রহসন রচয়িতারাও সবিস্ময় এবং সভয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন বাঙালির ঘরে আবির্ভূত হচ্ছেন অন্য রকমের সব বাঙালি মেয়ে। তারা 'মেম' বই কি!

৭৫. **কামিনী কুন্তল। আধুনিক মেয়েদের কেশচর্চা নিয়েও সেদিন রঙ্গ, ব্যঙ্গ, রসিকতা।**
**শিল্পী : যতীন্দ্রকুমার সেন।**

খোট্টা খোঁপা

জাক্ জনসন (তোপ) খোঁপা

ফুল আলবার্ট

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ

লোলন খোঁপা

ফিরিঙ্গি খোঁপা

পাতায় কপাল চাপা

ব্রহ্মচূড়

পাতার পরিণতি

ফ্যাশনেবল্ আড়পাতা

খেয়াল খোঁপা
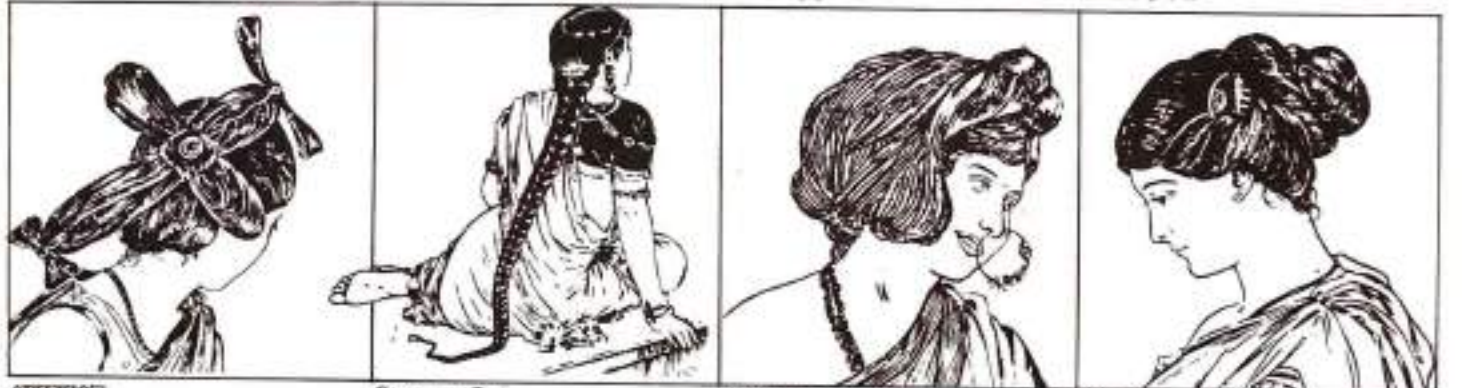
এয়ারোপ্লেন

বিদ্যার "বেণী"

বৈষ্ণব চূড়

বিবি-গৌজ খোঁপা

ভৈরবী খোঁপা

কুশন খোঁপা

বেণে খোঁপা

সোহাগী খোঁপা

ওদিকে ঠাকুর-বাড়িতেও অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস। তাঁর খুবই ইচ্ছে ছিল স্ত্রীকে তিনি বিলেত নিয়ে যান, সেখানকার মুক্ত হাওয়ায় তাঁকে অন্যরকম করে গড়ে তোলেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনুমতি দিলেন না। সুতরাং, 'ইউরোপীয় রমণীর আদর্শে' স্ত্রীকে দীক্ষিত করার সুযোগ পেলেন না সত্যেন্দ্রনাথ। তাই বলে সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী কিন্তু বিবিয়ানায় কম ছিলেন না। বাঙালি মেয়েদের কাছে চিরকাল তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, কেননা, নতুন স্টাইলে তিনি তাদের শাড়ি পরাতে শিখিয়েছিলেন। মেয়েদের কাছে সে এক রীতিমতো রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। তাঁর স্ত্রী সোজাসুজি মেমদের মতো গাউন পরতেন। প্রগতিশীল ব্রাহ্ম-মেয়েরা (যেমন দুর্গামোহন ঘোষের স্ত্রী ব্রহ্মময়ী, গুরুচরণ মহলানবিশের স্ত্রী—প্রভৃতি আর কেউ কেউ) বের করেছিলেন জগাখিচুড়ি এক পোশাক। স্বামীদের সঙ্গে রাস্তায় বের হওয়ার সময় তাঁরা "মেমসাহেবদিগের গাউনের উপরভাগে আঁচল জুড়িয়া এক প্রকার আধা বিলাতী আধা-দেশী পরিচ্ছদ সৃষ্টি করেন।" জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীর সঙ্গে কিছুকাল বোম্বাই ছিলেন। তিনি গাউন আর এই জগাখিচুড়ি পোশাকের বদলে বেছে নিলেন পার্শি মেয়েদের শাড়ি পরার স্টাইল। তারই রকমফের করে বাঙালি মেয়েদের শেখালেন নতুন করে শাড়ি পরতে। কাগজে কাগজে তা নিয়েও নাকি রীতিমতো সোরগোল। জবাবে ব্রাহ্মদের একটি কাগজ লিখেছিল :

"This Bushan (dress) is not at akk Bibiana (like European ladies). No doubt they do not wear their saries without covering on their bodies, but they are decently clad. Is this Bibiana ?"

লক্ষণীয়, পার্শি বা গুজরাতী মেয়েদের অনুকরণও একসময় বাংলার 'বিবিয়ানা' বলে গণ্য করা হত। সত্য বলতে কী, আব্রুহীন পার্শি এবং গুজরাতী মেয়েরা ছিলেন সেদিন নানা বিষয়ে তাঁদের বাঙালি বোনদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সওয়াল করতে গিয়েও প্রগতিশীল পুরুষরা বারবার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বোম্বাই বা আমেদাবাদের দিকে।

সে যাহোক, শাড়ির নতুনত্ব ছাড়াও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী আর দুটি আইডিয়া আমদানি করেছিলেন বাঙালি সমাজে। এক—বাড়িতে ছেলে মেয়েদের জন্মদিন পালন করা। ("বার্থ ডে",—কে না জানেন, দিশি-মেমদের সমাজে বিশেষ পরব!) দ্বিতীয়—রোজ বিকালে বেড়াতে বের হওয়া। বেড়াতে বেড়াতে একবার তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন খাস লাট-ভবনে স্বয়ং লাটবাহাদুরের সামনে। তা-ই নিয়েও বিস্তর হট্টগোল। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ি এসে স্ত্রীকে গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে গিয়েছিলুম। সে কি মহাব্যাপার! শত শত মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী একমাত্র বঙ্গবালা। তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর জীবিত ছিলেন। তিনি তো ঘরের বৌকে প্রকাশ্যস্থলে দেখে রাগে লজ্জায় সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।" রাজভবনে নিজের অভিজ্ঞতার কথা নিজেই শুনিয়ে গেছেন জ্ঞানদানন্দিনী। প্রহসনের সেই মেয়েটি, মিস উলুইচণ্ডীর মতো তাঁকে কিন্তু মোটেই অবহেলা করা হয়নি সেখানে। তিনি লিখেছেন—"ওঁকে (অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথকে) ছেলেবেলায় একজন পড়িয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে কাছে এসে কথা বল্লেন।…শুনেছি, আমাকে অনেকে মনে করছিলেন ভূপালের বেগম, কারণ তিনিই তখন একমাত্র বের হতেন।"

সত্যেন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একসময় প্রাচীনপন্থী ছিলেন। তিনিও একজন বিশিষ্ট প্রহসন লেখক। মেয়েদের নিয়ে তিনিও হাসাহাসি করেছেন বিস্তর। কিন্তু ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে আসার পর তিনিও দাদার আদর্শে দীক্ষিত হন। তিনিও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

৭৬. বাবু-ছাঁট চুল। যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা এই ছবিটির নীচে মন্তব্য ছিল—'কি সুন্দর আহামরি,/ ইচ্ছে হয় যে বিয়ে করি।' শিল্পীর দৃষ্টিতে এ মেয়েও বিদ্রোহিনী।

লিখেছেন—"স্ত্রী স্বাধীনতার শেষ অবধি আমি এতবড় পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম যে, গঙ্গার ধারে কোনও বাগান বাড়িতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে আমি আমার স্ত্রীকে অশ্বারোহণ পর্যন্ত শিখাইতাম। তাহার পর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া দুইটি আরব ঘোড়ায় পাশাপাশি চড়িয়া বাড়ি হইতে গড়ের মাঠ পর্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতাম। ময়দানে পৌঁছিয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতাম। প্রতিবেশীরা স্তম্ভিত হইয়া গালে হাত দিত।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই স্ত্রী কাদম্বরী দেবীই রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রেরণা, তাঁর প্রিয় "নতুন বৌঠান"। তিনি আত্মঘাতী হয়েছিলেন। অকালে তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে আজও নানা গবেষণা।

প্রগতিশীল মেয়েরা সেদিন শুধু নতুন স্টাইলে পোশাক পরে বা ঘোড়ায় চড়েই 'মেম' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এমন নয়। আরও অনেক কিছুই করেছেন তাঁরা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নানা যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৫৬ সনে বিধবা-বিবাহ আইন। সে বছরই কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন। এক কুলীনের বউ স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করে খোরপোষ আদায় করলেন। গোঁড়ারা কাণ্ড দেখে গালে হাত দিলেন। প্রগতিশীলরা উল্লাসে মাতোয়ারা। আদালত রায় দিয়েছিল—মাসোহারা আদায় না হলে ভূতপূর্ব স্বামীকে ফাটকে যেতে হবে; মেয়েটি বলেছিলেন—তাতে আর আমার আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে! সাবাস মেয়ে বই কি! আর একটি মেয়ে, নাম তাঁর বিধুমুখী, তেরো সতীনের সঙ্গে ঘর করতে আপত্তি জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, দু'জন ব্রাহ্ম যুবকের সাহায্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে ফেরার হয়ে যান। তাঁকেও আর জবরদস্তি করে 'সংসার' নামক সেই কারাগারে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ১৮৬১ সনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের মধ্যে এক সহজ সরল বিবাহ-অনুষ্ঠান প্রবর্তনে উদ্যোগী হলেন। বৈদিক বিয়ে। কেশব সেনের অনুরাগী তরুণ ব্রাহ্মরা প্রচলন করতে চাইলেন পশ্চিমী ধাঁচের অন্য অনুষ্ঠান, বর কনে অঙ্গীকার (Vow) বিনিময় করলেই বিয়ে হয়ে গেল, ব্যস। ১৮৬৬ সনে প্রসন্নকুমার সেন রাজলক্ষ্মী মিত্র নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন শুধু শপথ-বাক্য বিনিময় করে। শেষপর্যন্ত ১৮৭২ সনে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট—বিশেষ বিবাহ আইন। তারপর ১৮৯২ সনে 'সহবাস সম্মতি' আইন (Age of Consent Act)। প্রতি ঘটনা উপলক্ষেই কিছু কিছু নারী সেদিন বিশেষ ভূমিকায়। আর, গোঁড়া সমাজের চোখে বুঝি বা প্রত্যেকেই তাঁরা এক একজন 'মেম'।

এমনই সব নানা কাণ্ড। ধাক্কাধাক্কি করে মেয়েরা এক সময় নিজেদের জন্য খুলে ফেললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার। ১৮৮৪ সনে তাঁরা নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে এনট্রান্স পরীক্ষায় বসার অধিকার পেলেন। ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত ১২ জন মেয়ে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করেছেন কলকাতায়, ৬ জন পাস করেছেন এফ-এ, ৬ জন বি-এ। কিন্তু সবাই ওঁরা প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। এবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অধিকারে এল তাঁদের। ইংরেজী শিক্ষার ফলাফল পর্যালোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু সেদিনকার বাঙালি মেয়েদের একটি কৃতিত্বের কথাই উল্লেখ করছি। ১৮৬৫ সন থেকে ১৯১০ সনের মধ্যে কত লেখিকা তৈরি হয়েছিলেন বাংলাদেশে জানেন? কমপক্ষে ১৯৪ জন! প্রত্যেকে তাঁরা বই প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ একাধিক। তাছাড়াও পুরানো বইয়ের তালিকা খুঁজলে পাওয়া যাবে আরও জনা পঞ্চাশেক 'অনামা' লেখিকাকে। কোনও কোনও লেখিকা বই লিখেছেন তখন এমন কি ইংরাজীতেও। বলাই বাহুল্য, সনাতন সমাজ মেয়েদের এসব ক্রিয়াকলাপ আদৌ পছন্দ করত না। বাংলায় তখন একটি চালু প্রবাদ—"মেয়েরা দেয় জুতো পায়, ভাত ব্যঞ্জন পুড়ে যায়!" একজন বাঙালি লেখক (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বাঙালি মেয়েদের জন্য তৈরি করেছিলেন এক ব্যঙ্গাত্মক পাঠক্রম। তাঁর কথা মেয়েদের জন্য চাই—"সঙ্গীত প্রকরণ, নৃত্য প্রকরণ, প্রণয় প্রকরণ, বিরহ প্রকরণ, কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ, পিতৃমাতৃভ্রাতৃত্যাগ, নাটক উপন্যাস পত্র রচনা, এবং গুরুজন লাঞ্ছনা।" মেয়েরা এসব বিদ্যায় পটু হলে তাদের ক্ষেত্রে যে-সব বিয়ে সিদ্ধ হবে ইন্দ্রনাথের মতে সেগুলো হল—"বিধবা বিবাহ, সধবা বিবাহ, কুমারী বিবাহ, অচির বিবাহ, এবং বিবিধ বিবাহ!"

এসব বলাই বাহুল্য, সনাতনপন্থীদের চোখে মেমগিরির লক্ষণ। গান বাজনা, নাচ, লেখাপড়া, বাড়ির বাইরে বের হওয়া, বই লেখা—ওঁদের মতে সবই বিবিয়ানা। তবে তখনকার বেশিরভাগ সমালোচক মনে করেন সত্যিকারের বিবিয়ানা বিয়ের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। স্বয়ম্বরা মাত্রই তখন গণ্য 'মেম' বলে। দিশি মেম। তিরিশের দশকের বাংলায় গতানুগতিক বিয়ে নয় এমন সব বিয়ে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। নাম—"পরিণয়ে প্রগতি।" তাতে অসবর্ণ বিয়ে, অন্তঃপ্রদেশীয় বিয়ে, আন্তর্জাতিক বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদের পর আবার বিয়ে—সব ধরনের বিয়ের ঘটনা বিবৃত। নায়ক-নায়িকারা কেউ কেউ হয়তো এখনও জীবিত। রয়েছেন তাঁদের সন্তান-সন্ততি কিংবা বংশধরেরা। আজ আর নিশ্চয় তাঁদের দিকে কেউ অন্য দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তাঁরা সম্ভ্রান্ত, মান্য, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের মা বাবা বা ঠাকুর্দা ঠাকুমা'রাও অর্থাৎ ওই বইয়ের নায়ক নায়িকাও আজকের পাঠকের কাছে সম্মানের পাত্র। কেননা, আপনকালে তাঁরা ছিলেন বিদ্রোহী এবং বিদ্রোহিণী, স্রোতে গা ভাসাতে রাজি হননি তাঁরা, দুঃসাহসীর মতো ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্রোতের উলটো দিকে। তাঁদের সাহস সত্যই আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু 'পরিণয়ে প্রগতি'র লেখিকার (?) চোখে তারা ঘৃণার পাত্রী। তাঁরা স্বেচ্ছাচারিণীর দল। মজার কথা এই, এই সব বিদ্রোহিণীও প্রকারান্তরে 'মেম' বলেই চিহ্নিত। বইটিতে সমসাময়িক সংবাদপত্র থেকে একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে—"কাটা খালে কুমির প্রবেশ করিয়াছে। এতদিন ডুবিয়া মানুষ খাইতেছিল, এইবার প্রকাশ্যে নরহত্যা আরম্ভ করিয়াছে। সেই জন্যই আশঙ্কা। এব্যাধি ভীষণ ব্যাধি। এ-ব্যাধির নাম—ফেরঙ্গব্যাধি।"

এবার একবার তাকিয়ে দেখা যাক 'ফেরঙ্গব্যাধি' কবলিত 'স্বেচ্ছাচারিণী' এইসব 'মেম'দের দিকে। বইটিতে গোটা পঁয়তাল্লিশ 'অসামাজিক বিয়ে'র কথা আছে। আজকের পাঠক তার কোনটির কথা শুনেই বিচলিত বোধ করবেন না। এ-ধরনের বিয়ে-সাদী আজকাল হামেশাই হচ্ছে। কেউ আর তা নিয়ে ভাবেন না। কিন্তু তৎকালে এসবই ছিল চাঞ্চল্যকর সংবাদ। কেন না, নিত্য তা ঘটত না। আর সেকারণেই আজ ফিরে তাকানো।

**৭৭. 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদ্দী পিসী/ তার under-এ কলম পিষি।' বাংলা প্রহসনে যেমন রঙ্গ ব্যঙ্গের অন্যতম উপলক্ষ লেখাপড়া শেখা আধুনিকা, ব্যঙ্গ চিত্রকরের কাছেও তবে উপহাসের এক উপলক্ষ তাঁরাই। শিল্পী : যতীন্দ্রকুমার সেন।**

পাত্রীদের প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রায় সবাই তাঁরা সুশিক্ষিত। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সবাই তাঁরা বিয়ে করেছেন ভালবেসে। তৃতীয়—সবাই তাঁরা কুমারী নন। চতুর্থ—তাঁদের কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কুল-গোত্র এসব ছিল তুচ্ছ, একমাত্র বিবেচ্য—হৃদয়। কেউ বিয়ে করেছেন নিকট আত্মীয়কে (কাজিন), কেউ পত্নীত্যাগী কোনও পুরুষকে, কেউ অন্য রাজ্যের যুবাকে, কেউ বা বরণমালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন অন্য দেশের পুরুষের গলায়। তাতে বিবিয়ানার কী আছে, বোঝা দায়। তবে হ্যাঁ, 'প্রেম' নামক বস্তুটিকে যদি আমরা পশ্চিম থেকে ধার-করা ধন বলে স্বীকার করে নিই তবে অন্য কথা। সেক্ষেত্রে আমাদের এই নায়িকারা সবাই স্বদেশী-মেম বটে। নীরদচন্দ্র চৌধুরী (নীরদ সি চৌধুরী) মনে করেন—আরও কিছু কিছু ধ্যানধারণা, যেমন—ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবোধ, দৈহিক সৌন্দর্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর, এ-সবের মতো রোমান্টিক প্রেমের ধারণাও আমরা পেয়েছি পশ্চিম থেকে। সাহিত্যে তার উদ্বোধন বঙ্কিমের রচনায়। তারপর প্রস্ফুটিত হয় রবীন্দ্রনাথের সযত্ন লালনায়। আর বাস্তবে ? তথাকথিত এই দিশি-মেমের দলই কি রোমান্টিক প্রেমের মন্দিরে প্রথম পূজারিণীর দল ?

সোজাসুজি তাকানো যাক তাঁদের মুখের দিকে।

ইনি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বউ। বাবা স্বনামধন্য পুরুষ লালমোহন ঘোষ। মৃণালিনী সুন্দরী সুশিক্ষিতা। বিয়ে হয়েছিল তাঁর পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে, খ্যাতনামা জমিদার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পরেই হঠাৎ মারা গেলেন ইন্দ্রচন্দ্র। শোকজর্জর মৃণালিনী সান্ত্বনা খুঁজতে চাইলেন কবিতায়। দেখতে দেখতে পর পর বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হল তাঁর,—'নির্ঝরিণী', 'প্রতিধ্বনি', 'মনোবীণা'। মৃণালিনী দেবী বলতে গেলে বাংলায় তখন একজন রীতিমত প্রতিষ্ঠিত কবি। তারপর হঠাৎ একদিন নতুন করে ভালোবাসার জোয়ার। বিধবা কুলবধূ ভালবেসে ফেললেন এক তরুণকে। তিনিও বড়ঘরের সন্তান। বাবা তাঁর সমাজনেতা কেশবচন্দ্র সেন। তাঁরই পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন মৃণালিনীর হৃদয়ে নতুন করে জ্বালিয়ে দিলেন প্রেমের প্রদীপ। ব্যাপারটা, বলাই বাহুল্য, সমাজের চোখে অসামাজিক। কেননা, মৃণালিনী দেবী কবি।

হলেও কুলবধূ। দ্বিতীয়ত, নির্মলচন্দ্র ব্রাহ্ম, পাইকপাড়ার সিংহরা হিন্দু। সুতরাং, অসামাজিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হল ওঁদের। এবার তাঁরা যা করলেন, তা শুধু আরও অসামাজিক নয়, রীতিমত দুঃসাহসিক কাণ্ড। রাজবাড়ির দেওয়াল টপকে প্রেমিকের হাত ধরে একদিন উধাও হয়ে গেলেন মৃণালিনী। উধাও হয়ে গেলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে,—সাতসমুদ্রের ওপারে। নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে নির্মলচন্দ্রকে বিয়ে করলেন তিনি। তাঁর পরবর্তী জীবন সুখের, সম্মানের,—শান্তির। এ-ধরনের ঘটনা যে বাংলা-মুলুকে আগে কখনও ঘটেনি এমন নয়। নির্মলচন্দ্রের বেশ কিছুকাল আগে আর এক বাঙালি যুবক বিখ্যাত ডিরোজিও-শিষ্য, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম নায়ক দক্ষিণারঞ্জনও পালাবার চেষ্টা করেছিলেন বর্ধমানের এক বিধবা রানীকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত দু'জনে তাঁরা একও হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়েও সোরগোল হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু মৃণালিনীকে নিয়ে যা হয়েছিল তার বুঝি তুলনা হয় না। প্রেমের জন্য তাঁর কীর্তি এমনকি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল নাকি খাস বিলাতেও। শুনেছি বার্নার্ড শ', এইচ-জি ওয়েলস পর্যন্ত নাকি সেদিন এই সাহসী বাঙালি মেয়ের প্রশংসায় মুখর। মৃণালিনী সেন বাঙালি সমাজে আজও এক বিদ্রোহিণী লেখিকার নাম।

সুবিদিত রানী নিরুপমার উপাখ্যানও। নিরুপমা 'প্রবাসী বাঙালি' পরিবারের মেয়ে। আজকাল আর কেউ অন্য প্রদেশে বাস করলে নিজেকে 'প্রবাসী' বলেন না। তৎকালে শব্দটার খুবই চল ছিল। নিরুপমার বাবা বাস করতেন উত্তরপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে। অসামান্য রূপসী ছিলেন নিরুপমা। রীতিমতো বিদুষীও বটে। তিনিও কবি ছিলেন। সম্ভবত রূপের জন্যই বিয়ে হয়েছিল তাঁর কোচবিহারে, প্রিন্স হিতেন্দ্রনারায়ণ ভিক্টরের সঙ্গে। কিন্তু নিরুপমা অচিরেই আবিষ্কার করলেন ভিক্টরের সঙ্গে আজীবন বাস করা দুঃসাধ্য। এমন পরিস্থিতিতে সাধারণত মেয়েরা তৎকালে যা করতেন, অর্থাৎ নীরবে কেঁদে কেঁদে নিঃশেষে শেষ হয়ে যেতেন, নিরুপমা কিন্তু সেই পরিণতি মেনে নিতে রাজি হলেন না। স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করলেন। ওঁদের বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম মতে, সুতরাং মামলা রুজু করতে কোনও অসুবিধা হল না। মামলায় বিচ্ছেদ মঞ্জুর হয়ে গেল। নিরুপমা তখন জননী। একটি পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁর।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন কবি নিরুপমা। এমন সময় সহসা হৃদয়ের পটে নবীন নায়কের আবির্ভাব। নিরুপমার বয়স নাকি তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। তবু ভালবাসার পুরুষকে জীবনে বরণ করে নিলেন তিনি। শিশিরকুমার সেনগুপ্ত নামে এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল কবি নিরুপমার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ জানালেন নব-দম্পতিকে। সাহসিকতা এবং মেজাজে মর্জিতে মৃণালিনী মেমদের চেয়ে পেছনে ছিলেন কি ?

আরও জনাকয়েক বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করে সেদিন 'মেম'-খ্যাত অর্জন করেছিলেন। উল্লেখিত বইটির লেখিকার মতে তাঁদের অগ্রগণ্য তারকনাথ পালিতের কন্যা লিলিয়ান। তিনি উচ্চশিক্ষিতা, উন্নত হৃদয়া ও বিলাত ফেরত। 'সার তারকনাথ সর্ববিধ সুখৈশ্বর্যের মধ্যে রাখিয়া কন্যাকে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পথে চলিতে দিয়াছিলেন'—লেখিকার খবর এই। লিলিয়ান পালিতের বিয়ে হয়েছিল এক ধনী ব্যারিস্টার যুবকের সঙ্গে। ভালবাসার বিয়ে। তবু শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ। হাইকোর্টে লিলিয়ানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন লর্ড এস পি সিনহা। "পরিণয়ে প্রগতি"র লেখিকার মতে—"বাঙালীর মধ্যে ইহাই বোধকরি ডাইভোর্সের প্রথম মামলা। (আর) এই কারণেই লিলিয়ানের নামটি আজিও স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।"

তবে লিলিয়ানের চেয়েও বেশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন নাকি, রায়পুরের বিখ্যাত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের কন্যা রমলা। বড়ঘরেই বিয়ে হয়েছিল তাঁর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যা। স্বামী নিজেই অভিযোগ

**৭৮. যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা আর এক আধুনিকা। আধুনিক বাঙালি মেয়েদের সম্পর্কে প্রচলিত নানা উদ্ভট ধারণাই চিত্ররূপ এইসব ছবি।**

এনেছিলেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতে। তাঁর বক্তব্য ছিল স্ত্রী ব্যভিচারিণী। মামলা চলাকালেই নাকি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়ে যান রমলা। বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হওয়ার পর ফিরে এসে প্রেমিকের সঙ্গে নতুন বিয়ে করে ঘর বাঁধেন তিনি। রমলা তখন বারো বছর বয়সের একটি পুত্র সন্তানের জননী। যাঁকে তিনি স্বামী হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেই তুলসী গোস্বামীও আপনকালে অনন্যমনা ব্যক্তি। তিনি জমিদার, রাজনৈতিক নেতা, প্রসিদ্ধ বক্তা। তিনিও বিবাহিত ছিলেন। সুতরাং, সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। রমলা সম্পর্কে বলা হয়েছে—তিনি "একাকী বিলাত ভ্রমণ, বিলাতী নাইট ক্লাব ও বলনাচের পার্টিতে যোগদান, অন্য পুরুষের সঙ্গে একাকী বিমান ভ্রমণ, অশ্বারোহণ"—ইত্যাদিতে সুদক্ষ। মোটর চালনায়ও নাকি জুড়ি ছিল না তাঁর। তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল নাকি মোটরগাড়ি। গোস্বামীবাবুর একটি রোলস-রয়েজ গাড়ি ছিল। আদালতে নাকি শোনা যায়—রমলা তাঁকেও আদর করে বলতেন "আমার রোলস-রয়েজ।" বলা বাহুল্য, তখনকার সমাজে যত কুৎসাই রটানো হোক না কেন, রমলা আপনকালের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই সাহসী মহিলা। তাঁরও পরবর্তী জীবন—সমান আভিজাত্যপূর্ণ—সমান সম্মানের।

এঁরা যদি এক ধরনের 'মেম', তবে সেদিনের বাংলায় ঈষৎ অন্য ধরনের 'মেম'ও ছিলেন বেশ কয়েকজন। 'মেম' তাঁরা স্বামী পরিচয়ে,—সাহেবদের গলায় মালা দিয়ে। উনিশ শতকের বাঙালি মেয়ের সঙ্গে সাহেবদের বিয়ের ঘটনা একেবারে অজানা ছিল না। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন মেয়ের,—দৈবকী, মনোমোহিনী এবং মিলি,—তিনজনেরই বিয়ে হয়েছিল সাহেবদের সঙ্গে। একজনের স্বামী মিঃ সেল, দ্বিতীয়ের—মিঃ হুইলার, তৃতীয়ার— মিঃ স্টুয়ার্ট। তবু কোচবিহারের রাজকন্যারা স্বামী হিসাবে যখন বরণ করে নেন বিদেশী পুরুষকে, তখন কেন যে এমন হল্লা, বোঝা দায়। মহারানী সুনীতিদেবীর দুই কন্যা প্রতিভা আর সুধীরা বিয়ে করেছিলেন জন ম্যাঙ্গার আর হেনরী ম্যাঙ্গার নামে দুই ইংরাজ যুবককে। মেয়ে দুটি বলতে গেলে বিলাতেই মানুষ। সেখানেই এক বল-নাচের আসরে নাকি যুবক দুটির সঙ্গে ওদের পরিচয়। সাহেব দু'জন ওদের সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়। তারপর ঘটা করে বিয়ে। বিয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন লাটবাহাদুর স্বয়ং। তার কিছুকাল পরেই বিভ্রাট। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা ওঠে বিলাতের আদালতে। রায় দিতে গিয়ে জজ নাকি মন্তব্য করেছিলেন—"কোনও ডিভোর্সের মামলায় এর আগে কোনও পরিবারের এমন নগ্ন চিত্র দেখিনি।" পরবর্তী খবর—"প্রতিভা আর সুধীরা আর বিবাহ করিলেন না। তদবধি তাঁহারা স্বাধীন জীবনযাপন করিতেছেন। তবে তাঁহারা আভিজাত্য গৌরব হারান নাই, অভিজাত ইংরাজ ও উচ্চতন রাজপুরুষদের মধ্যেই তাঁহাদের মেলামেশা। প্রতিভা ও সুধীরা আজকাল কখনও এদেশে, কখনও বিদেশে বাস করেন। এদেশে গ্রীষ্মকালীন কলিকাতা, দিল্লি ও সিমলায় অনেক

সময় বাস করেন এবং লাট-বড়লাটের বাড়ির ভোজসভাসমূহে যোগদান করেন। অশ্বারোহণ এবং বিমানপোতে আরোহণ যেমন বিদেশিনীদিগের বিশেষ প্রলোভনের, এই ভগ্নীদ্বয়ও সেই প্রলোভন হইতে মুক্ত নহেন।"

আরও কিছু কিছু বাঙালি মেয়ে সেদিন বিদেশীকে বিয়ে করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং বলাই বাহুল্য, সব বিয়ে শেষ পর্যন্ত পাত্রপাত্রীকে আদালতে টেনে নিয়ে যায়নি। কোনও কোনও প্রেম এবং পরিণয়ের পরিণতি যদি মোড় নিয়ে থাকে ট্র্যাজেডির দিকে, তবে কমেডিও অনেক। ফলাফলই শেষ কথা নয়, আসল সংবাদ বোধহয় এটাই যে, তৎকালে আমাদের এই বদ্ধ সমাজে এমন মেয়েও ছিলেন, যাঁরা বাঁধাসড়কে হাঁটতে রাজি হননি—অভিযাত্রীর মতো পা বাড়িয়েছিলেন দুর্গম পথে।

বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালি মেয়ে বিলাত-যাত্রী সেজেছিলেন গত শতকের শেষ দিকে। এ-শতকের প্রথম দশকগুলোতে স্বভাবতই তাঁদের ভিড় কিছু বেশি। শুধু বিলাত-যাত্রা বা বিদেশী বিয়ে করার জন্যও 'মেম' খেতাব পেয়েছেন ওঁরা। কিন্তু তাঁদের সবাইকে বোধহয় হার মানিয়ে দিয়েছেন কলকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের কন্যা তরু (১৮৫৬-১৮৭৭)। তরু আর অরু ওঁরা ছিলেন দুই বোন। পড়াশুনার জন্য বাবার সঙ্গে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন তাঁরা। কিছুকাল ছিলেন ফ্রান্সে। কিছুকাল বিলাতে। তারপর দেশে ফিরে এসে অরু বসলেন ছবি আঁকতে, তরু বসলেন কবিতা লিখতে। ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজীতে কবিতা লিখে আজ তিনি সুপরিচিত। দুই বোনই মারা যান খুবই কম বয়সে। যক্ষ্মা যখন তরুকে কেড়ে নেয়, তখন তাঁর বয়স সবে একুশ। অরু বিদায় নিয়েছেন তাঁর আগেই। এই নাতিদীর্ঘ জীবনেই মেমের পোশাক-পরা ওই বাঙালি মেয়েটি রেখে গেছেন—দুটি কাব্য সংগ্রহ, দুটি উপন্যাস এবং বেশ কিছু পাঠযোগ্য চিঠি। কাব্য সংগ্রহ দুটির একটি ফরাসী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ, অন্যটি মৌলিক ইংরাজী কবিতার সংকলন। দুটি উপন্যাসের একটি লিখেছেন তিনি ফরাসীতে, অন্যটি (অসমাপ্ত) ইংরাজীতে। তবু দত্তের বিদেশী অনুরাগীরাও কিন্তু স্বীকার করেন ইউরোপীয় সংস্কৃতি পুরোপুরি আত্মস্থ করলেও তরু ছিলেন শেষ পর্যন্ত বাঙালি মেয়েটিই।

বোধহয় সেদিনের অধিকাংশ স্বদেশী 'মেম'রাও তা-ই ছিলেন। সম্ভবত আমাদের চারপাশে আজকের যত 'মেম' তাঁরাও ব্যতিক্রম নন। সত্যি বলতে কী, কেটি মিটাররা বোধহয় আজও সংখ্যায় খুবই কম। বেশি সিসিরাই। সিসি কেটির ছোট বোন। তাঁর বিবরণ দিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ :

"সিসি এখনও আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনও পায়নি, কিন্তু ডবল প্রমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগবগ্ করছে—উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ : পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসমবৃতির সীমানা এখনও আলজ্জতার অভিমুখে :...সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনও প্রবল।...ক্রিস্টমাসের প্লাম পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।"

আজকের অধিকাংশ স্বদেশী মেমের সঙ্গেই কি ছবিটি হুবহু মিলে যাচ্ছে না ? সেদিনের দিশি মেমদের সঙ্গেও কিন্তু আশ্চর্য মিল 'সিসি'র। তাঁরা অন্য বাঙালি মেয়েদের চোখে মেম হয়তো, কিন্তু নিজেরা বোধহয় ভাল করেই জানতেন শেষ পরিচয়ে তাঁরা ভারতীয় অবশ্যই।

# কালা বিবি

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পড়ার ঘরের দেওয়ালে একটি ছবি আছে। বিশাল একটি তৈলচিত্র। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় পোশাকে একজন ইউরোপীয় দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতীয় পোশাক মানে মোগলাই পোশাক। ইউরোপীয় না-হলে অনায়াসে তাঁকে বলা যেত লখনৌর কোনও নবাব। কিংবা দিল্লির কোনও আমীর ওমরাহ। তাঁর পাশে, শ্বেতাঙ্গ নবাবের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন একটি দীর্ঘাঙ্গী ভারতীয় মেয়ে। মেয়েটি সুন্দরী। শাহজাদীর মতো তাঁর সাজসজ্জা। গলায়, কানে, হাতে পায়ে, এমনকি মাথায়ও জড়োয়া গয়না। এক হাত যদি তাঁর শ্বেতাঙ্গ পুরুষটির কাঁধে, অন্য হাত তবে বাহুতে। বিদেশী লোকটি কিছুটা বয়স্ক। তাঁর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটি শিশু। স্পষ্টতই বোঝা যায় ওঁদের সন্তান। বাচ্চাটির পোশাকও এদেশের নবাবজাদাদের মতো। তার মাথায় বাহারি তাজ। সে ঈষৎ আড়চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। লোকটির চোখ প্রায় গায়ে হেলে পড়া মেয়েটির দিকে। মেয়েটির আয়ত চোখ স্থাপিত লোকটির চোখে। পেছনে বনস্থলী। ভারতের উচ্ছ্বসিত সবুজ। ছবিতে আরও একজন রয়েছেন। নর, নারী এবং শিশুর আটোসাটো বন্ধন থেকে ঈষৎ দূরে, ছবির ডান পাশে। তিনিও এক রমণী। সুবেশা, সালঙ্কারা। এ-মহিলার কিছুটা বয়স হয়েছে। শরীরে মেদ জমেছে। তাঁর পোশাকেও বয়সের ছায়া। রঙের বদলে ঝোঁক তাঁর শাদার দিকে। বয়সোচিত সম্মানও তিনি পেয়েছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি বসে আছেন একপাশে একটি সুন্দর কেদারায়। তাঁর এক হাত নিজের কোলে, আর এক হাত আলসাভরে ফেলে রাখা একটি তাকিয়ায়। এ-মেয়েটির মুখ কিছুটা গম্ভীর। দৃষ্টি তাঁর উদাসীন। ছবির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা সুখী সংসার থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। চোখ মাটির দিকে। কিংবা বলা যায় কোনও কিছুর দিকেই নয়।

তাকালে সন্দেহ থাকে না ছবিটি পারিবারিক। যাকে বলে—ফ্যামিলি পোর্ট্রেট। স্পষ্টতই বোঝা যায় ছবির মাঝখানে তাঁদের প্রিয় সন্তানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক সম্ভ্রান্ত সুখী দম্পতি। পুরুষ বিদেশী, রমণী এ-দেশীয়—এই যা। ছবির দ্বিতীয় নারী-প্রতিমাটির সঙ্গে নায়ক-নায়িকার সম্পর্ক কী তাও অনুমান করতে অসুবিধা নেই। মনে হয় নবীনাকে খুঁজে পাওয়ার আগে একদিন ওই মেয়েটিই ছিলেন বিদেশী নায়কের বাহুলগ্ন। একদিন ইনিও নিশ্চয় ঠিক এমনি করেই পরদেশীর গা ঘেঁষে দাঁড়াতেন। ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটিয়ে চোখে চোখ রাখতেন। সে সুখ এখন নবাগত সৌভাগ্যবতীর। তিনিই এখন সোহাগি প্রথমাকে সেজন্য চোখের জল মুছতে মুছতে সাহেব-কুঠি ছেড়ে যেতে হয়নি। পরিবারে একটি সম্মানের আসন নির্দিষ্ট হয়েছে তাঁর জন্যও। তাঁর বসার ভঙ্গিটি দেখে মনে হয় এ-সংসারে তিনি এখন বড়-বেগম। কিংবা বড়বিবি।

কে এই বিদেশী যিনি শুধু পোশাকে নয়, গার্হস্থ্য ব্যাপারেও পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেলেন? তিনি যে

৭৯. অষ্টাদশ শতকের কলকাতার নাম-না-জানা কোনও এক কালা-বিবি। শিল্পী: ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। ১৭৮৭।

শুধু একসঙ্গে দুই বিবি নিয়ে ঘর করছেন তাই নয়, তাঁদের নিয়ে নির্দ্বিধায় হাজিরা দিচ্ছেন স্বদেশের এক শিল্পীর সামনে। সেজন্য তাঁর কোনও ক্ষোভ নেই, লজ্জা নেই, হীনমন্যতা নেই। বরং, মনে হয় তিনি যেন রীতিমত গর্বিত নিজের এই সংসার নিয়ে। কে এই দুঃসাহসী অসামাজিক পুরুষ ? মেয়ে দুটিই বা কে ?

আমরা জানি, এদেশে এমন একটা যুগ ছিল যখন ইউরোপীয়দের 'অসবর্ণে' মোটেই আপত্তি ছিল না। সে-যুগ মোটামুটিভাবে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ অবধি। পর্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, ইংরাজ—সাত সমুদ্রের ওপার থেকে আসা সব পশ্চিমী ভাগ্যান্বেষীদেরই শ্লোগান সেদিন—'অসবর্ণে আপত্তি নেই !' নিজেদের পরিচিত সমাজ ছেড়ে আসার সময়ে বলতে গেলে প্রায় প্রত্যেকেরই মনে মনে গুনগুন করে ফিরে সেই সঙ্গীত—এক যাচ্ছে, আর এক আসবে। আসবে নতুন কোনও ভালবাসার জন। ইংরাজিতে তখন জনপ্রিয় পদ্য ছিল একটি। তার বক্তব্য—'উই আর শিওর টু ফাইণ্ড সামথিং ব্লিসফুল অ্যাণ্ড ডিয়ার/অ্যাণ্ড দ্যাট উই আর ফার ফ্রম দি লিপস উই লাভ/উই মেক লাভ টু লিপস দ্যাট আর নিয়ার !' প্রথম দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সরাসরি উৎসাহিত করা হত এ-দেশের মেয়ে বিয়ে করতে। ১৬৮৭ সনে কোম্পানির কর্তারা মাদ্রাজে চিঠি পাঠিয়েছিলেন—স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করতে মদত দাও। দরকার হয় তার জন্য কোম্পানির তহবিল থেকে কিছু খরচ করতেও পিছু পা হবে না। বাচ্চা হলে মায়েদের এক

'প্যাগোডা' বকশিস দিয়ে দিও। বস্তুত, দুশ' আড়াইশ বছর ধরে সেই অবাধ মেলামেশার ফলেই ভারতীয় সমাজে আবির্ভূত হয়েছিল এক নতুন সম্প্রদায়, যাঁদের বলা যায় ইন্দো-ইউরোপীয়ান। তাঁদের একাংশ আজকের অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান। তখন কেউ তাদের 'কুচা বুচা' ('Kutcha Butcha'), 'আধ পাকা', 'আধা সের', 'তিন পোয়া', বা 'বারো আনা' বলেন না। ওদের মেয়েরাও তখন 'চি চি' (Chee-Chee) মেয়ে বলে খ্যাতি পাননি। ওদের পরিচয় তখন—'দোভাষ', 'ইউরেশিয়ান', 'ইস্ট ইন্ডিয়ান'—ইত্যাদি। ইংরাজরা নতুন রক্ত সঞ্চার করার পরে 'ইণ্ডো-ব্রিটন'। ক্রমে 'অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ান।' এ নামটা বলতে গেলে একেবারে হাল আমলের। সেটি ওঁরা পেয়েছেন ১৯১১ সনে। ইংরাজরা যখন এ-দেশের মাটিতে পা দেয় তখনও কিন্তু বিস্তর 'ইউরেশিয়ান' এ-দেশে। এমনকি অষ্টাদশ শতকেও ভারতে যত না পাক্কা সাহেব মেম তার চেয়ে বেশি সংকর সংকরী। তবু আগন্তুকদের সমান ঝোঁক যেন এ-দেশের মেয়েদের দিকে। অষ্টাদশ শতকে কোম্পানির কর্মচারীরা রাতে খাবার টেবিলে বসে পানপাত্র হাতে নিয়ে নাকি হাঁক দিতেন—'আলাস* অ্যান্ড অ্যালাখ এ ডে!'

—হায়, দিনে লাখ টাকা! এল, কিংবা গেল হয়তো। সেই বাণিজ্যিক সাফল্যের স্বপ্নই নাকি রাতারাতি পরিবর্তিত হয় নতুন শ্লোগানে—অ্যাকিলিস অ্যান্ড এ লাখ এ ডে!' অর্থাৎ—নিত্য যদি লাখ টাকা পেতাম, সেই সঙ্গে নিত্য একটি মেয়ে!

কোথায় সেই কন্যা? সেই পদ্যটির কথা মনে পড়ছে। জোব চার্নক নাকি চিৎকার করে উঠেছিলেন—ওই বামুনকে কেটে দু'খণ্ড কর! ওই ফ্যাকাশে বিধবাটি আমার! আর জো, তুমি নাও তার সঙ্গিনী বাদামী রঙের মেয়েটিকে। এসব অবশ্য গল্প কথা। চার্নক কাশিমবাজারে, পাটনায় কিংবা আড়িয়াদহে গঙ্গার ঘাটে জ্বলন্ত চিতার মুখ থেকে সতী-নারী কেড়ে এনে ঘরে তুলেছিলেন এসব খবর আজ আর কেউ বিশেষ আমল দিতে চান না। আড়িয়াদহে শ্মশানঘাটে তবু কে বা কারা শ্বেতপাথরে উৎকীর্ণ করে রেখেছেন এ ধরনের একটি গালগল্প। কেন, কে জানে। স্থানীয় একটি পরিবারের একজন মেয়ের নামও লেখা হয়ে গেছে সেই পাথরে! এই গুজবের আদি ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন। সতী-উদ্ধারের কাহিনীর তিনিই প্রথম প্রচারক। তবে হ্যামিলটনকে বাতিল করে দিলেও এ-কালের গবেষকরা স্বীকার করেন জোব চার্নক এদেশের মেয়ে নিয়েই ঘর করতেন। উইলিয়াম হেজেস জোব চার্নকের সমসাময়িক মানুষ। ১৬৮১ থকে ১৬৮৭ সনে তিনি কোম্পানির কাজকর্মের খবরাখবর নিতে এ এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। হেজেস লিখেছেন তিনি বুলাচাঁদ নামে একজন সম্পন্ন হিন্দুর মুখে শুনেছেন চার্নক ইংরাজের মান-মর্যাদা রাখতে পারছে না। তিনি উনিশ বছর ধরে বুলাচাঁদের স্বজাতি একটি মেয়েকে নিয়ে বাস করছেন। বুলাচাঁদ হেজেসকে বলেন—চার্নককে তাড়াও। নয়তো আমরা নবাবের কাছে নালিশ করব। হেজেস লিখেছেন—চার্নক যখন পাটনায় তখন নাকি ওঁরা তাঁর বিরুদ্ধে নবাবের কাছে নালিশও করেছিলেন। অবশ্য এই মেয়েটির জন্য নয়, চার্নকের সঙ্গিনী তখন আর একটি দিশি মেয়ে। সেই মেয়েটির স্বামী তখনও বেঁচে আছেন। কিংবা সদ্যোমৃত। সে স্বামীর ঘর থেকে বিস্তর টাকাকড়ি এবং সোনা গয়না নিয়ে পালিয়ে এসে চার্নকের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। নবাব তখন চার্নককে ধরার জন্য কয়েকজন সিপাই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চার্নক পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত নগদ টাকা ছাড়া রকমারি উপহার দিয়ে চার্নক নবাবের সিপাইদের নিরস্ত করেন। হেজেস লিখেছেন—কাশিমবাজারেও নাকি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

হেজেস যখন তাঁর ডায়েরিতে এসব কথা লিখছেন জোব চার্নক তখনও বেঁচে আছেন। সুতরাং, ধরে নিতে অসুবিধা নেই সমসাময়িক আরও অনেক ইউরোপীয়ের মতো জোব চার্নকও সংসার পেতেছিলেন এদেশের মেয়ে নিয়ে। তাঁর একাধিক বিবি থাকাও অসম্ভব নয়।

৮০. এই মেয়েটিই সম্ভবত উইলিয়াম হিকির প্রিয় সঙ্গিনী জামদানী। শিল্পী : টমাস হিকি। ১৭৮৭।

জোব চার্নককে ঘিরে খবর আর গুজব হয়তো মিলে মিশে একাকার । ইতিহাসে নির্ভেজাল খবরও রয়েছে অনেক । যথা : লেঃ কর্নেল কার্কপ্যাট্রিক-এর ঘরকন্নার উপাখ্যান । জেমস অ্যাকিলিস কার্কপ্যাট্রিক ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামের দরবারে কোম্পানির রেসিডেন্ট । একালে হলে বলা যেত রাজপ্রতিনিধি কিংবা রাজদূত । ১৭৯৭ থেকে ১৮০৫ সন পর্যন্ত ওই সম্মানের পদে বহাল ছিলেন তিনি । আর, তখনই নাকি হঠাৎ একদিন রচিত হয় এই অবিশ্বাস্য কাহিনী । যথারীতি সেদিনও সরকারি কাজে দরবারে গেছেন কার্কপ্যাট্রিক । যথারীতি কাজ সেরে ফিরে এসেছেন রেসিডেন্সিতে। বারান্দায় বসে সবে গড়গড়ার নলটি মুখে তুলে নিয়েছেন এমন সময় একটি পালকি এসে থামল সামনে । ঝালর দেওয়া সুন্দর দরবারী পালকি । কার্কপ্যাট্রিক নড়েচড়ে বসলেন । ভাবলেন হয়তো দরবার থেকেই কেউ জরুরি কাজে এসেছেন । ধীরে ধীরে পালকির দরজা খুলে গেল । বিস্ময়বিমূঢ় কার্কপ্যাট্রিক যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না । পালকি থেকে নামলেন এক বৃদ্ধা । কার্কপ্যাট্রিক তাঁর স্বদেশী মানুষের কাছে এদেশীয় সংস্কৃতির একজন স্বীকৃত সমঝদার । তিনি ভাল ফার্সি জানতেন । এ-দেশের আদব-কায়দাও তাঁর জানা । তিনি যথাবিহিত সৌজন্য সহাকারে বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলেন । বুড়ি একগাল হেসে জানালেন তিনি একটি অতি সুখকর প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন । বৃদ্ধার মতে, প্রস্তাবটি সুখকর, কারণ নিজাম বাহাদুরের প্রধান উজির মীর আলম সাহেবের নিজের ভাইয়ের একমাত্র কন্যা খয়েরউন্নিসা সাহেবের পাণিপ্রার্থী । আর, কনে নিজেই এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সাহেবের কাছে । কার্কপ্যাট্রিক উড়িয়ে দিলেন তাঁর কথা,—দূর, তা কি কখনও হয় ? সাহেবের কাণ্ডজ্ঞান ছিল । তিনি জানতেন এটা হিন্দুস্তান এবং তাঁর এই তথাকথিত প্রণয়নীটি হারেমের বাসিন্দা । বৃদ্ধা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন । বললেন—নিজামের দরবারেই সাহেবকে দেখেছে খয়েরউন্নিসা । সাহেব নিশ্চয় জানেন—ইচ্ছে করলে জাফরি দিয়ে অন্তঃপুরের মেয়েরা সবই দেখতে পারেন । কার্কপ্যাট্রিক তবু আমল দিলেন না তাঁকে । বললেন—পাগলী ।

দিন যায় ! হঠাৎ আর একদিন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আর এক পালকির আবির্ভাব । কার্কপ্যাট্রিক ভাবলেন আবার বুঝি সেই বুড়ি এল । কিন্তু সেবার আর বৃদ্ধা নয়, পালকি থেকে নামলেন এক অষ্টাদশী পরী । এবার আর প্রস্তাব করতে হল না নায়িকাকে, অতঃপর কার্কপ্যাট্রিক নিজেই প্রস্তাব পেশ করলেন নিজাম বাহাদুরের উজিরের সহোদরের কাছে । তিনি নিজামের বকশি । মেয়ের বাবা বললেন—এমন জামাতা পেলে তাঁর আপত্তি নেই । শর্ত একটাই, কার্কপ্যাট্রিককে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে হবে । সাহেব বললেন—তথাস্তু ।

লেঃ জেনারেল জেমস অ্যাকিলিস কার্কপ্যাট্রিক নাম নিলেন হাসমৎ জঙ্গ । তাঁর কুঠির নাম—রঙ্গমহল । তিনি হিন্দুস্তানের মানুষের মতো দাড়ি-গোঁফ রাখেন, হাতে মেহেদি মাখেন, গুড়ুক গুড়ুক গড়গড়া টানেন । সুখে দিন কাটে তাঁর ।

কার্কপ্যাট্রিক আর খয়েরউন্নিসার দুই সন্তান । একটি ছেলে, একটি মেয়ে । ছেলের নাম উইলিয়াম, মেয়ের নাম ক্যাথারিন । কার্কপ্যাট্রিক ওদের খেলাঘর হিসাবে হায়দ্রাবাদের বিশাল রেসিডেন্সির বাগানে মূল বাড়ির আদলে একটি ছোট্ট বাড়ি গড়েছিলেন । এখনও নাকি রয়েছে সেই বাড়িটি । ১৮০৫ সনে ছেলে আর মেয়েকে তিনি বিলাতে পাঠিয়ে দেন লেখাপড়া শেখানোর জন্য । উইলিয়াম অবশ্য বেশি দিন বাঁচে নি । কিন্তু দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল ক্যাথারিন । ক্যাথারিন অরোরা । কালহিল প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর । তাঁর স্মৃতিকথায় এই মেয়েটিই কিটি কার্কপ্যাট্রিক ।

কার্কপ্যাট্রিকের মতোই রোমান্সের অভিজ্ঞতা কর্নেল গার্ডনারের । কর্নেল উইলিাম লাইনাস গার্ডনার । তবে তিনি ঠিক কোম্পানির কর্মচারী নন,—'ফ্রি ল্যান্সার ।' অর্থাৎ, ভাড়াটে লড়িয়ে । অষ্টাদশ শতকের শেষ

৮১. লাহোরে নিজের বাড়িতে বিবি বাচ্চাদের দিয়ে জেনারেল অ্যালার্ড । পশ্চিমী শিল্পীর অনুকরণে ছবিটি এঁকেছেন অজ্ঞাতনামা কোনও ভারতীয় চিত্রকর । ১৮৩৮ ।

প্রহরে তিনি হোলকারের সেনাপতি। তিনি নিজেই শুনিয়ে গেছেন তাঁর ভালবাসার গল্প : আমি তখন নবীন তরুণ। তবু আমার ওপরই ভার পড়ল কাম্বের নবাবের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি নিয়ে কথা বলার। দিনের পর দিন দরবার চলছে। একদিন দেখি আমার পাশেই একটা চিক নড়ে উঠল। তাকাতেই চোখে পড়ল ভ্রমর কালো দুটি চোখ। পৃথিবীতে এমন সুন্দর চোখ বুঝি আর হয় না। সন্ধিচুক্তি চুলোয় গেল। সেই চোখ আমায় পেয়ে বসল। খবর নিয়ে জানতে পারলাম মেয়েটি নবাবজাদার কন্যা। অপেক্ষায় রইলাম। আবার সেই চিকের আড়াল। আবার সেই কালো চোখ,—অ্যাণ্ড মাই ফেইট ওয়াজ ডিসাইডেড।

পরদেশী তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল কাম্বের নবাব পরিবারের কন্যার। বিয়ের কনেকে নিয়ে বাসা বাঁধলেন খাসগঞ্জে। আগ্রা থেকে ষাট মাইল দূরে। বিস্তর সম্পত্তির মালিক ছিলেন গার্ডনার। চালচলনে তিনি যেন এ-দেশেরই কোনও রাজা বা নবাব। তাঁর মতো 'অসবর্ণ' আরও পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাওয়া ভার। তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লির আবকর শাহের এক ভাইয়ের তালাক দেওয়া স্ত্রী মুলকা বেগমের সঙ্গে। নাতনি সুশান গার্ডনারের বিয়ে হয়েছিল দিল্লির এক বাদশাজাদার সঙ্গে। গার্ডনার মারা যান ১৮৩৬ সনে। থাকারের কলমে তিনি 'মেজর গাহাগান।' সেদিন অবধিও আগ্রা অঞ্চলে বেঁচে ছিলেন গার্ডনারের বংশধররা।

গার্ডনারের মতো আরও কিছু কিছু ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী তাম্রবর্ণা সুন্দরীদের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন। যেমন—জেনারেল দ্য বোগে। অথবা—কর্নেল জেমাস স্কিনার। দ্য বোগে অবশ্য তাঁর মুসলিম বিবিকে খ্রীস্টান করে নিয়েছিলেন। শোনা যায় এক সময় তিনি নাকি ছিলেন রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন দি গ্রেটের প্রণয়ী। এদেশে তাই বিবির নাম রেখেছিলেন ক্যাথারিন। এদিকে স্কিনার আবার ভারতীয়দের কাছে নাম পেয়েছিলেন 'সিকন্দর সাহেব'। তিনি অবশ্য নিজেও ছিলেন আধা-ভারতীয়। তাঁর বাবা যদিও ইংরাজ, মা ছিলেন রাজপুতানী। স্কিনারের নিজের স্ত্রীও এ দেশীয় রমণী। তাঁর নামেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর—'স্কিনার্স হর্স।' ইতিহাসের অনেক পরিচিত নামই খুঁজে পাওয়া যাবে এই তালিকায়। স্যার আয়ার কুট, ক্লাইভের পর যিনি এদেশে ইংরাজ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক,—তিনিও জাতি পরিচয়ে 'মিশ্র'। সাতান্নর মহাবিদ্রোহে ইংরাজের চোখে অন্যতম উজ্জ্বল সেনাপতি জেনারেল স্যার জন হিয়ার্সের বাবা ছিলেন একজন ইংরাজ ক্যাপটেন, মা জাঠ রমণী। ১৮৭৯ সনে কাবুল থেকে কান্দাহার অভিযানের সেনাপতি লর্ড রবার্টস ছিলেন এক রাজপুত মহিলার নাতি। এক কালের ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড লিভারপুলও অনায়াসের ঠাঁই পেতে পারেন এই তালিকায়। তিনি পলাশী-পর্বে খ্যাত ওয়াটস সাহেবের দৌহিত্র। ওয়াটস বিয়ে করেছিলেন এই কলকাতারই একটি মেয়েকে। এক সময় মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন এলিহু ইয়েল। তাঁর অর্থেই আমেরিকার বিখ্যাত ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরও বিবি ছিলেন এদেশের কন্যা। তাঁর সমাধিতে নাকি লেখা আছে—'বর্ন ইন আমেরিকা, ইন ইউরোপ ব্রেড।/ইন আফ্রিকা ট্রাভেলড, ইন এশিয়া ওয়েড।...' তবে ইয়েলের বিবি এশিয়াটিক সোসাইটির সেই ছবিটির মতো কোনও কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী নয়, একজন সংকরী।

এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি কার তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। কেউ বলেছেন ইনি দ্য বোগে। কারও মতে ইনি 'হিন্দু স্টুয়ার্ট'। কেউ বা বলেন—এই সাহেব আসলে জর্জ বিচি। স্টুয়ার্ট জীবনাচারে হিন্দুর মতো ছিলেন বলেই নাম পেয়েছিলেন 'হিন্দু স্টুয়ার্ট'। তিনি নাকি নিয়মিত গঙ্গাস্নান করতেন। পার্ক স্ট্রিটে তাঁর সমাধি অলঙ্কৃত ছিল নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দিয়ে। জর্জ বিচি আবার একজন ভাগ্যান্বেষী শিল্পী। লখনৌয় তিনি দু'জন দিশি বিবি নিয়ে সংসার পেতেছিলেন। কেউ কেউ বলেন দুই নয়, ওঁর বিবি ছিলেন তিনজন। ইচ্ছে করলে ছবির এই নায়ককে কর্নেল পিয়ার্স বলেও ধরে নেওয়া যায়। কেননা, হেস্টিংস-সহচর পিয়ার্সের গৃহিণীও ছিলেন এদেশের মেয়ে। তাঁর নাম ছিল—পান্নাবেগম। আজীবন নিষ্ঠাবান স্বামীর মতো এই পারসিক মেয়েটিকে নিয়ে ঘর করেছেন পিয়ার্স। ওঁদের একটি ছেলে ছিল। বাবা নাম রেখেছিলেন—টনি। মা বললেন—এ নাম আমার মোটে পছন্দ নয়। সুতরাং, টনি যখন বিলাতে পড়তে গেল তখন হ্যারোয় স্কুলের খাতায় তার নাম লেখা হল—মহম্মদ।

ছবির ওই শিশুটিই কি পান্না-বেগমের মহম্মদ? আমরা জানি না। শুধু এটুকুই জানা গেছে এই ছবির শিল্পী ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। জাতি পরিচয়ে তিনি ইতালিয়ান। তবে জন্ম কর্ম সবই ইংল্যাণ্ডে। এদেশে আসেন তিনি ১৭৮৬ সনের আগস্ট মাসে। ফিরে যান প্রায় একদশক পরে ১৭৯৬ সনের জানুয়ারিতে। এশিয়াটিক সোসাইটি'র ছবিটির আনুমানিক তারিখ ধার্য করা হয়েছে ১৭৯৪-৯৫ সন। ছবির নায়ক-নায়িকা যাঁরাই হোন না কেন, রেনাল্ডির এই তৈলচিত্র আসলে ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এই রঙিন ছবিটি একদিক থেকে বিশেষ একটি যুগের ছবি। সেই যুগের যখন সাদা কালো ভেদাভেদ প্রায় লুপ্ত। এ ছবি নিমেষে আমাদের নিয়ে যায় অষ্টাদশ শতকের সেই দিনগুলোতে, বিদেশী আগন্তুকরা যখন মসলিনের পোশাক, কোর্মাকাবাব, অম্বুরি তামাক আর দিশি বিবি নিয়ে দিব্যি সুখী সংসারী।

আগেই বলা হয়েছে ইতিহাসের পাতায় এ-ধরনের মেশামেশির খবরের অভাব নেই। কেউ কেউ খোলাখুলিই লিখে রেখে গেছেন নিজেদের ভালবাসা অথবা দাম্পত্যজীবনের কথা। এবং লিখে গেছেন

৮২. স্যার চার্লস ম্যালেট-এর বিবি অম্বর কাউর। শিল্পী : জেমস ওয়ালেস। ১৭৯২।

রাখঢাক না করেই। যথা : উইলিয়াম হিকি। কলকাতার ইতিহাস পাঠকরা কে না জানেন তাঁর প্রিয় জামদানীর কথা? আইনজীবী হিকি প্রথমবার কলকাতায় আসেন ১৭৭৭ সনে। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী শার্লট। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। তারপর শুরু হয় হিকির অন্য জীবন। হিকি লিখেছেন—প্রথম তাঁকে 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' একটি সুন্দরী মেয়ে পাঠিয়েছিলেন বন্ধু পট। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদে কোম্পানির রেসিডেন্ট। এই মেয়েটির নাম ছিল—কিরণ। প্রায় এক বছর তার সঙ্গে ঘর করেন হিকি। ওদের একটি ছেলেও হয়েছিল। কিন্তু তার কালো চুল এবং কালো রঙ দেখে হিকির মনে সন্দেহ জাগে। শেষ পর্যন্ত জানা যায় কিরণ সাহেবের খিদমদগারের সঙ্গে নষ্ট। হিকি কিরণকে বিদায় দিলেন। পরে অবশ্য তিনি তার জন্য মাসোহারারও ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর হিকির জীবনে এল জামদানী। হয়তো তার দিশি ডাকনাম ছিল জমাদারণী। সাহেব তাকে জামদানী করে নিয়েছিলেন। প্রথমে সে ছিল হিকির আর এক বন্ধু কার্টার সাহেবের প্রেমিকা। তিনি চলে যাওয়ার পর হিকি তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে টানেন। সাহেব লিখেছেন—হিন্দুস্থানী মেয়ে হলেও জামদানী ছিল বেশ সপ্রতিভ। সে ঘোমটা দিত না, সাহেব দেখলে পালিয়েও যেত না। সে স্বচ্ছন্দে সকলের সঙ্গে মিশতে পারত। আমার বন্ধুরাও খুব পছন্দ করত ওকে। কথাটা মিথ্যা নয়। হিকির বন্ধুরা প্যারিস থেকে উপহার পাঠাতেন জামদানীর জন্যে। দেশে ফিরে গিয়েও নিয়মিত খবরাখবর নিতেন তার। একজন লিখছেন—ওকে বলবে আমি যেদিন ফার্সিতে চিঠি লিখতে পারব সেদিন প্রথম চিঠিটি লিখব ওকে, সব বিবিদের সেরা এই বিবিসাহেবাকে। আহা, কবে যে আবার ওর কাছে কারি-খানা খেতে পাব।

জামদানীর জন্য হিকি একটা বাগানবাড়ি কিনেছিলেন চুঁচুড়ায়। সাজানো বাড়ি। ছুটির দিনগুলো হিকি সেখানেই কাটাতেন। ওই বাড়িতেই ১৭৯৬ সনের আগস্ট মাসে তাঁর সন্তানের জন্মের সময় মারা যান এই হিন্দুস্থানী বিবি। হিকি লিখেছেন—স্ত্রী শার্লট চলে যাওয়ার পর এমন আঘাত আর কখনও পাইনি। জামদানীর সন্তানকে লালনপালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন হিকির এক বন্ধুপত্নী মিসেস টার্নার। কিছুদিন পরে সেও চলে গেল। হিকির সখেদ উক্তি—জামদানীর শেষ স্মৃতিটুকুও লুপ্ত হয়ে গেল।

হিকির বন্ধু বব পট এবং কর্নেল কুপারেরও ছিল এদেশীয় বিবি। সব বিবি অবশ্য জামদানী ছিলেন না। দলে সেদিন কিরণও অনেক। সেকালের এক কাব্য কাহিনীর নায়ক 'কই হ্যায়'-এর জীবনেও অন্য এক কিরণ-উপাখ্যান। 'হাজী মোস্তাফা'ও শুনিয়েছেন একই ধরনের আর এক কাহিনী। হাজী মোস্তাফা জাতে ফরাসী। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নতুন নাম নিয়েছিলেন। 'হাজী' হয়েছিলেন হজ করে। ফার্সি ভাষা ভাল জানতেন। গোলাম হোসেনের বই 'সায়র-উল-মুতক্ষরীণ'-এর তিনিই প্রথম অনুবাদক। কলকাতায় বসে সেটি ছাপাবার জন্য অনেক কাণ্ড করেছিলেন তিনি। বইটির ভূমিকায় প্রসঙ্গত তিনি তাঁর গার্হস্থজীবনের কিছু কিছু কাহিনীও শুনিয়েছেন। এক সময় তাঁর নেশা ছিল এদেশের পুঁথি সংগ্রহ। বিস্তর পুঁথি ছিল তাঁর তহবিলে। ছিল এদেশের নানা মূল্যবান শিল্প সংগ্রহ। ১৭৭০ সনে জেড্ডা এবং মক্কায় সব নাকি লুট হয়ে যায়। তারপর তিনি হিন্দুস্থানে ফিরে এসে স্থির করেন আর পুঁথি নয়, গ্রন্থাগারের বদলে এবার গড়ে তুলতে হবে হারেম। একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর হারেমের প্রিয় মেয়েটি তাঁরই এক ভৃত্যের প্রতি আসক্ত। আহত হারেম-অধিপতি স্থির করলেন দু'জনকেই বিদায় করে দেবেন। লোকটিকে নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু মেয়েটিকে তো আর পথে বের করে দেওয়া যায় না। তিনি এক বৃদ্ধাকে লাগালেন তার জন্য একটি বর খুঁজে বের করতে। শেষ পর্যন্ত একজন তরুণকে পাওয়া গেল। হাজী মোস্তাফা তার হাতে মেয়েটিকে সমর্পণ করলেন। কাপড়চোপড়, গয়নাগাটি, এমন কি নগদ তিনশ' টাকাও দিয়ে দিলেন কনেকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল মেয়েটি। স্বামী নাকি সব কেড়ে নিয়েছে।

সে তাকে খেতে দেয় না, ইত্যাদি !'হাজী মোস্তাফা দিনকয় তাকে থাকতে দিলেন, তারপর টাকাকড়ি দেওয়ার বন্দোবস্ত করে আবার পাঠিয়ে দিলেন অন্যত্র । এসব লখনৌর ঘটনা । মেয়েটিকে এবার তিনি চালান দিতে চাইলেন বেনারসে । কিন্তু পথে খুন হয়ে গেল বেচারা । এবং তার শব ফিরে এল আবার হাজী মোস্তাফার দোরগোড়ায় । হাজী মোস্তাফার চোখে জল । এই মেয়েটির বিশ্বস্ততার অভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—যাঁদের বয়স পড়তির দিকে তাঁরা পুথির বদলে সুন্দরী বিবি দিয়ে ঘর ভরাতে চাইলে সমস্যা দেখা দিতে পারে বইকি । কেননা একদিকে রমণীর রূপ আর তরুণের তারুণ্য অন্যদিকে বার্ধক্য এবং বলিরেখা যখন এক ছাদের তলায় সমবেত হয় তখন গৃহস্বামীর নানা অভাবিত অভিজ্ঞতা হতে পারে বটে ।

এ-ধরনের আত্মকথা শুনিয়েছেন আরও কেউ কেউ । তবে লিখিত বিবরণের চেয়ে স্বভাবতই আরও আকর্ষণীয় মনে হয় শিল্পীদের তুলিতে আঁকা বিবরণগুলো । সেগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য বলেই অনেক বেশি স্পষ্ট এবং আরও বেশি পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য । এদেশে ইউরোপীয়দের দৈনন্দিন জীবন লোকশিল্পে ব্যাপকভাবে

৮৩. উনিশ শতকে লন্ডনে আর এক ভারত-উৎসবে একদল ভারতীয় নর্তকী । সাহেবদের কাছে তখনও রীতিমত উপভোগ্য ভারতীয় নাচ । 'ইলাস্ট্রেটেড লন্ডন নিউজ' থেকে ।

বর্ণিত। খোঁজ নিলে দেখা যাবে কলকাতার একটি মাত্র জাদুঘর গুরুসদয় মিউজিয়ামেই এ ধরনের শিল্প-নিদর্শন রয়েছে পঁচাত্তরটি। (এই তথ্য-তালিকা মিউজিয়ামের কিউরেটার আশিসকুমার চক্রবর্তীর সৌজন্যে পাওয়া।) নকশি কাঁথা, জড়ানো এবং চৌকোপট, কাঠের ভাস্কর্য, শাড়ির আঁচল এবং পাড়, মন্দির টেরাকোটা—সর্বত্র ইউরোপীয়ানদের ছড়াছড়ি। শিকারি সাহেব, লড়িয়ে সাহেব, জাহাজী সাহেব, গড়গড়ার নল হাতে সাহেব, অষ্টোত্তর শতরূপে সাহেব। এর মধ্যে বিশেষভাবে দর্শনীয় মন্দির-ভাস্কর্যে ইউরোপীয় জীবন। বলা হয় বাংলায় (বাংলাদেশ সহ) পনের শতকের মন্দির আছে মাত্র একটি, ষোড়শ শতকের কয়েকটি। বাদবাকি সব মন্দিরই অষ্টাদশ অথবা উনিশ শতকের। মন্দির টেরাকোটায় সাহেবদের জীবন-রূপ নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। একটি আলোচনায় দেখেছিলাম ইউরোপীয়দের 'অসামাজিক জীবন'ও নাকি হিন্দু মন্দিরের দেওয়াল থেকে বাদ পড়েনি। এ-ধরনের দৃশ্যাদি রয়েছে হুগলি জেলার দ্বারহাটা গ্রামের রাজরাজেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালে। এটির প্রতিষ্ঠা ১৭২৮ সনে। ১৭৬২ সনে প্রতিষ্ঠিত হুগলি কেষ্টপুর গ্রামের মন্দিরটিতেও নাকি আরও খোলাখুলি এদেশের মেয়েদের সঙ্গে সাহেবদের মেলামেশার দৃশ্য। হুগলির আরও একটি মন্দির,কামারপুকুরের লাহা পরিবারের মন্দিরে রয়েছে সাহেব এবং দিশি বিবির মিলিত আলেখ্য। তালিকা এখানেই শেষ নয়। একটি সাম্প্রতিক আলোচনায় (টেরাকোটা ডেকোরেশনস অব লেট মিডিয়াভ্যাল বেঙ্গল.-জুলেখা হক) বলা হয়েছে অষ্টাদশ শতকে তৈরি আটপুরের

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের দেওয়ালে দেখা যায় সাহেব এদেশীয়দের নাচের আসর উপভোগ করছেন। হালিশহরের এক মন্দিরেওরয়েছে এ-ধরনের দৃশ্য। মন্দির টেরাকোটায় সাহেবের পাশাপাশি মেমসাহেব রয়েছেন বটে, তবে কখনও কখনও গ্রামের শিল্পী খোদাই করে রেখেছেন তথাকথিত অসামাজিকতার ইতিবৃত্ত। তার আরও একটি নমুনা হেতমপুরের চন্দ্রনাথ এবং শিবের একটি মন্দির। একটি দৃশ্যে দেখা যায় মত্ত সাহেব বলপূর্বক কাছে পেতে চাইছে একটি দেশীয় রমণীকে। এ-মন্দিরটি উনিশ শতকের। বোঝা যায় দিন পালটে গেছে। সাহেবদের মধ্যে এখন বিস্তর 'নীলদর্পণ'-এর রোগ সাহেব!

শুধু এদেশের লোকশিল্পীরা নন, এদেশে ইউরোপীয়দের জীবন সব শ্রেণীর শিল্পীরাই এঁকেছেন। যাকে বলা হয় 'কোম্পানি ড্রয়িং' বা ইউরোপীয়দের প্রভাবে আঁকা দেশীয় শিল্পীদের ছবি সেখানেও সাহেব-জীবনের ছড়াছড়ি। তবে সাহেবদের সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন বোধহয় পশ্চিমী শিল্পীরা নিজেরাই। ১৭৭০ থেকে ১৮২০—এই আধ শতকে অন্তত পাঁচ ডজন পেশাদার পশ্চিমী শিল্পী হানা দিয়েছেন এদেশে অবাক-করা দৃশ্যাবলী আর যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা অর্থের সন্ধানে। তার ওপর ছিলেন অগণিত শৌখিন আঁকিয়ে। সম্প্রতি মিলড্রেড আর্চার তাঁদের মধ্য থেকে বিশিষ্ট ক'জনকে বেছে নিয়ে ভারতে আঁকা তাঁদের ছবি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর আলোচ্য বিশেষ করে প্রতিকৃতি শিল্পীরাই। মিসেস আর্চারের এই অতি মূল্যবান বইখানার নাম—'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ব্রিটিশ পোর্ট্রেচার, ১৭৭০-১৮২৫'। অজস্র ছবি, অগণিত শব্দ। সব মিলিয়ে বিশাল বই। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ শ'। এই বইখানার পাতা ওল্টালেই বোঝা যায় এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে টাঙানো ছবিটি কোনও পরমাশ্চর্য বস্তু নয়, অষ্টাদশ শতকের ভারতে এ-ধরনের পারিবারিক প্রতিকৃতি আরও অনেক আঁকা হয়েছিল। রাশি রাশি না-হলেও বেশ কিছু।

এশিয়াটিক সোসাইটির ছবির পুরুষ ও রমণী এখনও আমাদের অচেনা। কিন্তু ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডির আঁকা ঠিক এক ধরনের আর একটি ছবির সন্ধান দিয়েছেন মিসেস আর্চার। এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একজন মধ্যবয়স্ক সাহেব একটা ডিভানে বসে আছেন। স্পষ্টতই তিনি কোম্পানির একজন কর্মচারী। তাঁর গায়ে লাল কোর্তা। সাহেব বাঁ পাশে কিছুটা হেলে একজন ভারতীয় রমণীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি মাটিতে বসে। তাঁর মাথায় ঘোমটা, কোলে একটি শিশু সন্তান। মায়ের দুপাশে আরও দুটি শিশু। দু'জনের কাছেই রয়েছে দু'জন আয়া। একজন দাঁড়িয়ে, অন্যজন বসে। এদিকে সাহেবের উরুতে ভর রেখে তাঁর গায়ে ঢলে পড়েছে আর এক রূপসী। সাহেবের একটি হাত তার হাতে। এই সুন্দরীর পেছনে দাঁড়িয়ে আর এক আয়া। মনে হয় এশিয়াটিক সোসাইটির সেই ছবিটির দ্বিতীয় রমণীর মতো এই মেয়েটিও সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষ। একজন তাঁর পুরানো বিবি, অন্যজন নতুন।

রেনাল্ডির আঁকা এই পারিবারিক চিত্রটিকে নিয়ে কারও মনে কোনও সংশয় নেই। বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এই তৈলচিত্রের নায়ক মেজর উইলিয়াম পামার। ছবির মতো পামারের জীবনও রীতিমত বর্ণাঢ্য। তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৭৬৬ সনে। ১৭৭৪ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে মনোনয়ন করেন নিজের এ-ডি-সি। ১৭৭৬ থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সরকারের মিলিটারি সেক্রেটারি। ১৭৮৪ সনে হেস্টিংসের লখনৌ পরিদর্শনের পর পামার সেখানে নিযুক্ত হন গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট। অচিরেই সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন পামার। কেননা, নতুন পদ লাভ করেছেন তিনি। মেজর পামার সাত নম্বর সিপাই ব্যাটেলিয়ানের সেনাপতি। কলকাতায় বসেই সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন পামার। ১৭৮৭ সনে কোম্পানি তাঁকে নিযুক্ত করে মারাঠা-দরবারে ইংরাজের প্রতিনিধি। পামার তখন পুনের বাসিন্দা। ১৮০১ সনে আবার নতুন পদ। পামার মুঙ্গের কমাণ্ডের জেনারেল। তাঁর জীবনের সিঁড়িতে উত্থান ছাড়া পতনের কোনও সংবাদ নেই। ১৮১৬ সনে কোম্পানির এই·

৮৪. কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে অষ্টাদশ শতকের এক গার্হস্থ্য-চিত্র। দুই পাশে দুই বিবি নিয়ে ভারতীয় পোশাকে বিদেশী। শিল্পী : ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। ১৭৯৪-৯৫।

কর্মী যখন বহরমপুরে মারা যান তখন কলকাতার কেল্লা থেকে তাঁর সম্মানে তোপ দাগা হয়েছিল ছিয়াত্তর বার। ফোর্টউইলিয়ামের পতাকা সেদিন অর্ধনমিত।

পামারের প্রথমা বিবি, ছবিতে যিনি বাচ্চা কোলে মাটিতে বসে আছেন তাঁর নাম ফৈজবক্স। তিনি নাকি দিল্লির বাদশা-পরিবারের কারও মেয়ে। পামার তাঁকে ঘরে তুলে আনেন ১৭৮১ সনে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করেননি বটে, কিন্তু বিবি-পামার বলতে সবাই তঁকেই জানতেন। উইলে পামার তাঁর ঘরবাড়ি, বিষয়-আসয় সবই দিয়ে গেছেন তাঁর প্রিয় 'বিবি ফিজি বক্স সাহেবা'কে। পামার লিখেছেন—এই বিবিই ছিলেন দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমার জীবনসঙ্গিনী। সন্দেহ নেই ফৈজ বক্স খানদানি পরিবারের মেয়ে ছিলেন। কেননা, ১৭৯৬ সনে দিল্লির বাদশা শাহ আলম সরকারিভাবে তাঁকে খেতাব দিয়েছিলেন—'বেগম'। পামার এবং তাঁর এই বিবির ছেলেমেয়ে ছিল ছয়টি। চারটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলেদের সবাইকে খ্রীস্টান মতে দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পামারের এক নাতনিকেই বিয়ে করেছিলেন বিখ্যাত প্রশাসক এবং লেখক—মিডাস টেলার। একসময় তাঁর লেখা ঠগী-কাহিনী খুবই জনপ্রিয় ছিল।

মিডাস টেলারের কন্যা লিখেছেন তাঁর পূর্বপুরুষ পামার অতিশয় বদ লোক ছিলেন,—'এ ব্যাড ওল্ড ম্যান।' ফৈজ বক্স ছাড়াও তিনি লখ্নৌর আর একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে ঘরে এনেছিলেন। সম্ভবত তিনিই ছবির দ্বিতীয়া। পামারের বর্তমান বংশধরদের মতে অবশ্য ছবির দ্বিতীয় সুন্দরী আসলে প্রথম বিবির বোন। কিন্তু অন্যরা তা মানতে রাজী নন। কারণ, ছবিটিতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পামারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ। খানদানি মুসলিম পরিবারের মেয়ে এভাবে ভগ্নীপতির গায়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে কিছুতেই বিদেশী চিত্রকরের সামনে বসবেন না!

রেনাল্ডি আরও কয়েকটি ভারতীয় মেয়ের প্রতিকৃতি এঁকেছেন। আরও অনেক পশ্চিমী দর্শকের মতো মনে হয় এদেশের মেয়েদের রূপ তাঁকেও আকর্ষণ করেছিল। 'এশিয়াটিকাস' নামে এক ছদ্মনামী লেখক এদেশের মেয়েদের সম্পর্কে লিখেছিলেন—এদেশের আমি এমন অনেক মেয়ে দেখেছি যাঁদের শরীরের গড়ন অপূর্ব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন স্বর্গীয় দেবীদের আদলে গড়া। তাদের চোখ এবং মুখের ভাবও অনির্বচনীয়। এসব দেখলে গায়ের রঙের কথা ভুলে যেতে হয়। রঙটুকু বাদ দিলে ওরা কোনমতেই ইউরোপের সেরা সুন্দরীদের চেয়ে হীন নন। বস্তুত ফর্সা বিবর্ণ রক্তহীন ইউরোপীয় মেয়েদের বদলে আমি ইতিমধ্যেই চোখ ঝলসানো এইসব তাম্রবর্ণা সুন্দরীদের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। রেনাল্ডিও মনে হয় তাঁর দলে। তিনি অনেক সাহেব মেম এঁকেছেন। সেসব ছবির তুলনায় অনেক বেশি প্রাণবন্ত যেন তাঁর ছবির ভারতীয় মেয়েরা। প্রত্যেকেই যাকে বলে—পটের বিবি।

১৭৮৮ সনে কলকাতায় বসে রেনাল্ডি একটি মুসলিম মেয়েকে এঁকেছিলেন। একই সুন্দরীর দুই দুইটি প্রতিকৃতি। হাঁটু মুড়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। ভঙ্গিটি বিনম্র, লজ্জাশীলার। দেখে মনে হয় মেয়েটি যেন কী ভাবছেন। কিছুটা আত্মমগ্ন ভাব। একই মেয়েকে অন্য ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি বাহারি গড়াগড়ার নল হাতে নিয়ে। ডানদিকে কারুকার্যখচিত আতরদান। মিলড্রেড আর্চার মনে করেন এই মেয়েটিও কোনও সাহেবের বিবি। মেয়েটি ভারতীয় বটে, কিন্তু, পরদেশীর সংসর্গের ছাপ তাঁর পোশাকে এবং ভঙ্গিতে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা জড়তা নেই তার সোজাসুজি তাকাতে।

রেনাল্ডি ঢাকাতেও উঁকি দিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর তুলিতে ধরা পড়েছেন আর এক বিবি। এ মেয়েটিও সুন্দরী এবং সপ্রতিভ। দেখলে বোঝা যায় যেখানে তিনি বসে আছেন সেটি কোনও সাহেবকুঠির 'বিবিখানা'। এ মেয়েটির হাতেও গড়গড়ার নল। তিনি তাকিয়ে আছেন নিজের হাতের গয়নার দিকে। একপাশে পানদান। তাঁর পোশাক, বসার ভঙ্গি, মুখের ভাব—সব কিছুতেই স্বচ্ছলতার মতো পরিতৃপ্ত

৮৫. লক্ষ্ণৌর শ্বেতাঙ্গ নবাব জন ওম্বওয়েল-এর প্রিয় বিবি। শিল্পী : চার্লস স্মিথ। ১৭৮৬।

জীবনের আভা। এ-বিবিকেও সনাক্ত করতে পারেননি গবেষকরা।

তবে রেনাল্ডির আঁকা আর একটি ছবির নায়িকা কিন্তু সুপরিচিত। ছবিটি অবশ্য অনেকেই দেখেননি। তবে নামটা অনেকেই শুনেছেন। তিনি মার্টিন সাহেবের বিবি বৌলন বা বুলন। মার্টিন মানে 'লা মার্টিনিয়ার' যাঁর দানে, লখনৌর সেই বিখ্যাত মেজর জেনারেল ক্লদ মার্টিন। এই ফরাসী ভাগ্যান্বেষী ১৭৬৩ সনে যোগ দেন ইংরাজ কোম্পানির সেনাবাহিনীতে।লখনৌয় তাঁর কাজ ছিল নবাবের অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধান। লখনৌর নবাবদের সঙ্গে খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল তাঁর। বলতে গেলে মার্টিনও তাঁদের মতো একজন নবাব। তাঁর বিস্তর ভূসম্পত্তি ছিল। ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য ছিল, নীলকুঠি ছিল। লখনৌয় একাধিক প্রাসাদ ছিল তাঁর। একটি প্রাসাদের নাম ফারাদ বাখ্স, অন্যটির—কনস্টানসিয়া। দ্বিতীয় বাড়িতে এখন লখনৌর লা মার্টিনিয়ার। একদিন সেখানে দেশীয় নবাবদের মতো চরম বিলাসিতার মধ্যে বাস করতেন মার্টিন। তাঁর শখ ছিল ছবি আর পুঁথি। অনেক পুঁথি ছিল তাঁর লাইব্রেরিতে। চার হাজার। প্রাসাদে ছিল অনেক ছবি। স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও অনেক বিদেশী শিল্পী তাঁর প্রতিকৃতি এঁকেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফ্রান্সেসকো রেনল্ডি। অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরের মতো পৃষ্টপোষকের সন্ধানে তিনিও হানা দিয়েছিলেন লখনৌয়। বলাই বাহুল্য, সে-অভিযান বিফলে যায়নি। রেনাল্ডি মার্টিনের প্রতিকৃতি তো এঁকেছেনই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তাঁর প্রিয় বুলনের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি। এখনও লখনৌর 'লা মার্টিনিয়ার'-এর দেওয়ালে ঝুলছে সেই তৈলচিত্র।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বুলন একটি মাছধরার ছিপ হাতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। একটি অলঙ্কৃত স্তম্ভে কনুই রেখে ভর দিয়ে দাঁড়ানো একটি রূপসী প্রতিমা। ছিপের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে একটি বালক। মেয়েটির মতো তার পোশাকও ভারতীয়। ছেলেটি হয়তো মার্টিনের নিজের সন্তান নয়। গবেষকদের অনুমান সে অন্য কোনও ইউরোপীয়ানের সন্তান। তার বাবা স্বদেশে ফিরে গেছেন। মার্টিন নাকি এ ধরনের বেশ কিছু ইউরোপীয়ান-সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যথা : বন্ধু কর্নেল পোলিয়ারের মেয়েরা, শ্যালি আর পেগি। বুলন, এই ছবির নায়িকা যিনি, তিনি নাকি একদিন ছিলেন ওদেরই দলে।

নবাবদের মতোই নাকি রীতিমত এক হারেম গড়ে তুলেছিলেন মার্টিন। তাঁর বিবিখানায় বিবি ছিলেন একাধিক। আর ছিল বন্ধুদের পরিত্যক্ত ছেলেমেয়েরা। মিসেস শেরউড এক সময় কিছুটা বিদ্রূপ করেই লিখেছিলেন—অনেক ইউরোপীয় যে হিন্দুস্থানের মায়া কাটাতে পারে না তার কারণ এ দেশের মেয়েরা আর তাদের অগুন্তি জলপাই রঙের সন্তান। এদের জন্যই প্রবাসী ইউরোপীয়ানদের হয় স্বদেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই, কিংবা শক্তি নেই। কথাটা হয়তো পুরোপুরি মিথ্যে নয়। তবে কেউ কেউ ফিরেও যেতেন। কিন্তু কখনও বিবিদের অকুল সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে নয়। তাঁদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকত। কেউ কেউ লেখাপড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের আগেই দেশে পাঠিয়ে দিতেন। কিছু কিছু সাহেব অবশ্য ফিরতেন কাড়ি কাড়ি টাকা আর ঝাড়া হাত পা নিয়ে। সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিতেন মার্টিনের মতো ধনবান এবং উদার বন্ধুরা। সাহেবি অনাথ আশ্রমগুলো তখনও ঠিক সংগঠিত হয়নি।

মার্টিন-পরিবারে এভাবেই ঠাঁই পেয়েছিল বুলন। মার্টিন তাকে আদর করে নাম দিয়েছিলেন—লিজ। শোনা যায় আর একজন ফরাসী ভাগ্যান্বেষীর কাছ থেকে মেয়েটিকে কিনেছিলেন তিনি। তাঁরও নিজের মেয়ে নয়, আশ্রিতা অনাথ কন্যা মাত্র। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল বলুন। অপূর্ব তাঁর চেহারা। মার্টিন তাঁর যোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে লাগলন। কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই প্রাসাদ ছেড়ে যাবে না। সে কেঁদেকেটে বলল—মার্টিনের প্রতি সে এমনই আসক্ত যে তাঁকে না-দেখে কিছুতেই থাকতে পারবে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আরও একজন বিবি। মার্টিন সাহেবের নতুন বিবি বুলন। মার্টিনের প্রাণ তিনি। সাহেব তাঁর উইলে অনেক কথাই লিখে রেখে গেছেন তাঁর এই বিবি সম্পর্কে। লিখেছেন—নয় বছর বয়স থেকে এই মেয়েটি

আমার কাছে। আমি তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। সে ফার্সি লিখতে পড়তে পারে। নিষ্ঠা সহকারে নিজের যাবতীয় ধর্মকৃত্য করে। স্ত্রী হিসাবে সে পূতচরিত্র, ধর্মশীল এবং বিশ্বস্ত। একজন স্বামী যা চান সবই পেয়েছি আমি তাঁর কাছ থেকে। মার্টিন দেহরক্ষা করেন ১৮০০ সনে। তারপরও দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তাঁর সাহেবের স্মৃতি নিয়ে লখ্‌নৌর প্রাসাদে রাজত্ব করে গেছেন বুলন।

শুধু মার্টিন নন, অষ্টাদশ শতকের লখ্‌নৌয় এমন আরও কয়েকজন ইউরোপীয় ছিলেন গায়ের রঙ বাদ দিলে যাঁরা বলতে গেলে পুরোপুরি ভারতীয়। যেমন অ্যান্টনি পোলিয়ার। পোলিয়ার ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের ফরাসী। ১৭৭১ সনে নবাব সুজাউদ্দৌলা তাঁকে ইঞ্জিনীয়ার এবং স্থপতি হিসাবে নিয়োগ করেন। শিল্পী টিলি কেটল্ তাঁর দেখা পেয়েছিলেন ফৈজাবাদে। পোলিয়ার সেখানে কোনও ভারতীয় নবাব যেন। তিনি খানদানি মুসলিমদের মতো পোশাক পরেন, হাতে গড়গড়ার নল নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বাঈজীর নাচ উপভোগ করেন। তাঁকে সেভাবেই চিত্রিত করেছেন কেটল্। ফৈজাবাদ থেকে পোলিয়ার পরে চলে আসেন লখ্‌নৌ। শহরের অদূরে তাঁর নামেই পোলিয়ারগঞ্জ। সেখানে তাঁর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদে বিরাট এক লাইব্রেরি ছিল। অতুলনীয় নাকি তাঁর সংস্কৃত এবং ফার্সি পুঁথি সংগ্রহ। পেশাদার ইঞ্জিনিয়ার পোলিয়ার প্রথম শ্রেণীর একজন ভাষাবিদ ছিলেন। ভাষাবিদ ইউরোপীয়ানদের সম্পর্কে এক শ্রেণীর ইউরোপীয়ানদের মধ্যে একটি চলতি রসিকতা ছিল ওঁরা ভাষা শিখেছেন 'স্লিপিং ডিকশিনারি'র সাহায্যে। ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা নেই। পোলিয়ারকে নিয়ে সে ধরনের রসিকতা বোধহয় অসঙ্গত। কারণ, তিনি ছিলেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম উৎসাহী সদস্য। পোলিয়ার যখন দেশে ফিরে যান তখন উইলিয়াম জোন্স মন্তব্য করেছিলেন—যাঁরা এদেশ থেকে চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে এমন জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ মানুষ দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে বলাই বাহুল্য, পোলিয়ারেরও ছিল 'স্লিপিং ডিকশিনারি : বিছানায় পাঠ নেওয়ার জন্য জীবন্ত অভিধান। বিবির বন্দোবস্ত করে বাচ্চাদের বন্ধু মার্টিনের হাতে তুলে দিয়ে পোলিয়ার ফরাসী দেশে ফিরে যান ১৭৮৯ সনে। সেখানে তিনি আবার বিয়ে করেন এবার অবশ্য স্বদেশের মেয়ে। কিন্তু নতুন জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দু'বছরের মধ্যে অ্যাভিংটনে ডাকাতের হাতে মারা যান একদা লখ্‌নৌর শ্বেতাঙ্গ নবাব অ্যান্টনি পোলিয়ার।

লখ্‌নৌর মার্টিন এবং পোলিয়ারের আরও দু'জন ইউরোপীয় সঙ্গী ছিলেন। একজন তাঁদের জন উম্বওয়েল, অন্যজন কর্নেল জন মরডান্ট। উম্বওয়েল ছিলেন কোম্পানির পে-মাস্টার। মরডান্ট নবাবের দেহরক্ষী বাহিনীর সেনাপতি। দু'জনেরই বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বদেশে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান (১৭৭৭-৭৯) স্যার জর্জ উম্বওয়েল ছিলেন লখ্‌নৌর উম্বওয়েলের নিকট আত্মীয়। মরডান্ট আবার পিটারবরোর আর্লের এক প্রণয়িনীর পুত্র। তবে লখ্‌নৌয় ওঁরা নিজেরাই এক একজন—'আর্ল'। অবশ্য তার ভারতীয় সংস্করণ। কিংবা বলা যায় লক্ষ্ণৌ-সংস্করণ। বিবি, বাঈজী, মোরগের লড়াই, সব কিছুতেই সমান উৎসাহ ওঁদের। লড়াইয়ের জন্য মরডান্ট নাকি মুরগি আমদানি করতেন সাত সমুদ্রের ওপার থেকে। অষ্টাদশ শতকের সেই সাহেবি-লখ্‌নৌর কিছু ছবি এঁকে রেখে গেছেন শিল্পী জোফানি। তাঁর বিখ্যাত 'মোরগের লড়াই' ছবিটিতে মার্টিন, পোলিয়ার, উম্বওয়েল, মরডান্ট সবাই একসঙ্গে হাজির। তাছাড়া নবাব ছাড়াও বিস্তর ভারতীয় এবং ইউরোপীয় ভদ্রজন।

লখ্‌নৌর আবহাওয়া তখন কেমন সেটা বোঝা যায় শিল্পী টিলি কেটলের কাহিনী শুনলে। তিনি লখ্‌নৌয় এসেছিলেন কাজের সন্ধানে। ছবি আঁকতে। কিন্তু এইসব প্রায়-ভারতীয় সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনিও বলতে গেলে সিকি-ভারতীয় হয়ে গেলে। টিলি কেটলও লখ্‌নৌয় ভারতীয় বিবি নিয়ে ঘর

বাঁধলেন। অবশ্য পাখির বাসা। বেশিদিন তিনি লখনৌয় ছিলেন না। তারই মধ্যে বেশ কিছু ছবি আঁকা হয়ে গেল। বাড়তি লাভ দুই কন্যারত্ন। একজনের নাম আনি, অন্যজনের এলিজাবেথ। ১৭৭৩ এবং '৭৪ সনে কলকাতার গির্জায় ওদের দীক্ষা হয়। কেট্‌ল অবশ্য দেশে ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করেছিলেন। বিখ্যাত স্থপতি জেমস পেইনের কন্যা মেরি ছিলেন সামাজিকভাবে বিবাহিত পত্নী। তার মানে এই নয় যে, হিন্দুস্থানে বিবি-সংসর্গের খবরটা গোপন ছিল। সেটা সহনশীলতার কাল। আর এক বিখ্যাত শিল্পী জর্জ চিনারির স্ত্রী কলকাতায় স্বামীর সঙ্গে যোগ দিতে এসে দেখেন ইতিমধ্যে তিনি দুটি সন্তানের পিতা। মেমসাহেব কিন্তু তা দেখে খুব চমকিত হননি। দুনিয়া তখন অন্যরকম।

শুধু কলকাতা আর লখনৌ কেন, দেশময় খোলাখুলি অসংখ্য বিবিঘর। ফ্যানি পার্কস লিখে গেছেন জেনারেল জাঁ ফ্রাসোয়া অ্যালার্ডের কথা (Jean Francoss Alland)। এই ফরাসী ভাগ্যান্বেষীর ঠিকানা ছিল লাহোর। ইনি পেশাদার সৈনিক। একসময় ছিলেন নেপোলিয়ানের বাহিনীতে। নেপোলিয়ানের পর মিশর কান্দাহার হয়ে ১৮২২ সনে অ্যালার্ড এসে পৌঁছালেন লাহোরে, রণজিৎ সিংয়ের দরবারে। রণজিৎ সিং তাঁর হাতে নিজের দুটি রেজিমেন্ট তুলে দিলেন আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য। সাহেবের মাইনে ধার্য হল দৈনিক দশটি মোহর। আফগানদের সঙ্গে লড়াইয়ে অ্যালার্ডের জওয়ানরা উন্নত রণকৌশলের পরিচয় দিল। ফলে সাহেব আরও দায়িত্ব পেলেন। তাঁর হাতে এল তিন হাজার লড়িয়ে, দু'হাজার গোলন্দাজ। দায়িত্ব যেমন বাড়ছে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাহেবের ধনদৌলত। তিনি বিলাসীর মতো থাকেন। শহরের একপাশে আনারকলিতে তাঁর বিশাল বাড়ি। একটি কাশ্মীরী মেয়ে তাঁর বিবি। বিশিষ্ট ইউরোপীয় ভ্রমণকারী যিনিই লাহোরে আসেন অ্যালার্ডের সংসারে তাঁদের নিমন্ত্রণ। অ্যালার্ড প্রত্যেককে সমাদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করেন। ছেলেপুলে নিয়ে সুখের সংসার তাঁর। গর্বিত সৈনিকের বুকে পাশাপাশি ঝোলে ফরাসী দেশের মেডেল এবং রণজিৎ সিংয়ের দেওয়া 'ব্রাইট স্টার অব ইণ্ডিয়া'। তাঁর মুখ ভর্তি দাড়ি। ফ্যানি লিখেছেন খাওয়ার সময় তিনি দাড়িগোঁফ কানের পাশ দিয়ে পেছনে গুছিয়ে রাখেন। ১৮৩৩ সনে সাহেবের একটি মেয়ে মারা যায়। যুদ্ধ যাঁকে কখনও আহত করতে পারেনি, সেই সৈনিক এই আঘাতে নাকি ভেঙে চুরমার। তার ওপর কলকাতায় তাঁর সঞ্চিত অর্থও মার গেছে। রণজিৎ সিংয়ের কাছে তিনি অনুমতি চাইলেন একবার ফ্রান্স ঘুরে আসবার। রণজিৎ আপত্তি করলেন না। কাশ্মীরী বিবি এবং সন্তানদের নিয়ে তিনি কলকাতা হয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। আঠারো মাস পরে কিন্তু তিনি ফিরে এলেন একা। স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের তিনি গুছিয়ে দেশে রেখে এসেছেন। দেশে তার কমপক্ষে পঁচিশ হাজার টাকার এস্টেট! ১৮৩৯ সনে এ দেশের মাটিতেই মারা যান অ্যালার্ড। তিনি এবং তাঁর পরিবারের যে ছবি আমরা দেখি সেটি এদেশেরই শিল্পীর আঁকা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে জেনারেল একটি চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন। মেঝেয় কার্পেটের ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী। রকমারি খেলনা নিয়ে খেলা করছে চারটি ছেলেমেয়ে। আর একটি একজন পরিচারিকার কোলে। ওদিকে জেনারেলের পাশে টেবিলে পেয়ালায় চা ঢালছে আর একজন পরিচারিকা। একজন কর্মচারী কাগজকলম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাহেবকে দিয়ে কিছু একটা সই করাবার জন্য। ছবিটি ১৮৩৮ সনে লাহোরে আঁকা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এটি আসলে কোনও পশ্চিমী শিল্পীর আঁকা একটি তৈলচিত্রের কপি। তা হোক, সন্দেহ নেই, ছবিটি সুখী পরিবারের। এবং সে-পরিবার ছোট নয়।

এবার স্যার চার্লস ম্যালেটের উপাখ্যান। ইনি ছিলেন পুনেতে কেম্পানির রেসিডেন্ট। রেসিডেন্ট বললে সব বলা হয় না। তিনি যেন ছোটখাটো কোনও বাদশা। তাঁর বিরাট প্রাসাদ বিরাট বাগান। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে অন্তত পক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশটি ভাল জাতের ঘোড়া। তাছাড়া গোটা কুড়ি উট। এবং নানা জাতের
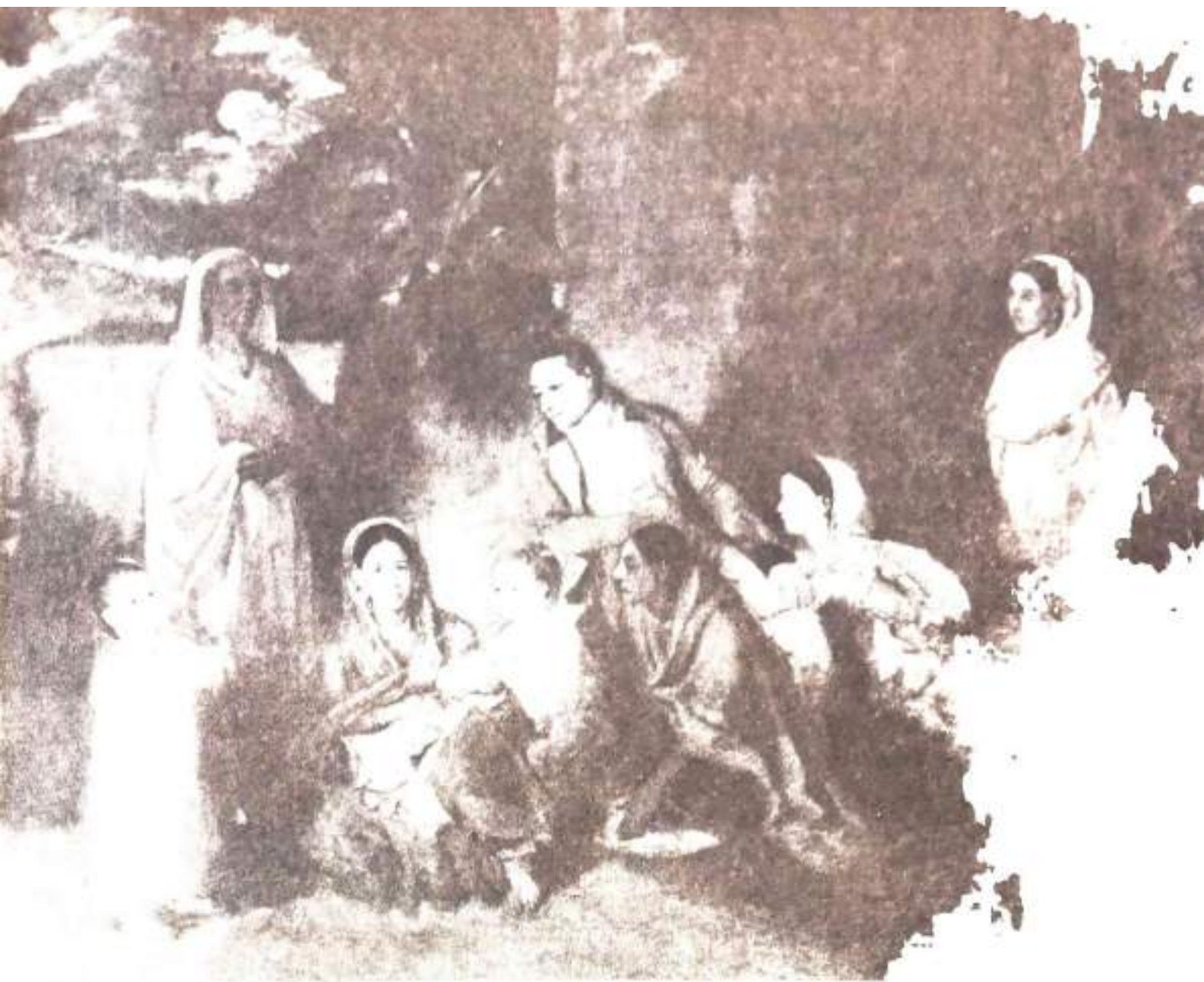
পশুপাখি নিয়ে সুন্দর একটি চিড়িয়াখানা। ১৭৯২ সনে শিল্পী জেমস ওয়েলস পুনে বেড়াতে গিয়ে ম্যালেট সাহেবের বিলাসিতার বহর দেখে হতবাক। ম্যালেটের বিবি ছিলেন এক রাজপুতানী। বিবি অম্বর কাউর। তাঁর একটি সুন্দর প্রতিকৃতি এঁকে রেখে গেছেন শিল্পী ওয়েলস। ছবিটি এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে।

অম্বর কাউর এবং ম্যালেটের তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল। তাদের সকলেরই দীক্ষা হয়েছিল বোম্বাইয়ের এক গির্জায়। একসঙ্গে, ১৭৯৭ সনে। ম্যালেট পরের বছরই দেশে চলে যান। জাহাজে সুসনা নামে একটি ইংরাজ মেয়ের সঙ্গে তাঁর ভাব-ভালবাসা হয়। দেশে ফিরে ম্যালেট তাঁকে বিয়ে করেন। অম্বর কাউরকে অবশ্য তিনি পুনেতেই রেখে গিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েরাও তাঁর কাছেই ছিল। সুসনার সঙ্গে বিয়ের পর তারা দেশে গেল নতুন মায়ের কাছে। সুসনাই প্রতিপালন করেছিলেন ওদের। অম্বর কাউর নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন ম্যালেট পরিবারের সঙ্গে। তাঁর বড় মেয়ে এলিজার বিয়ে হয়েছিল সলসব্যারির ডীনের সঙ্গে। ছেলে চার্লস বড় হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতে আসে। অম্বর কাউর তখনও বেঁচে। চার্লস পুনেতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। সে নাকি অনেক উপহার নিয়ে এসেছিল মায়ের জন্য!

৮৬. সপরিবারে হেস্টিংস-বান্ধব পামার সাহেব। তাঁরও বোধহয় ছিল দুই বিবি। শিল্পী : ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। ১৭৮৬

প্রসঙ্গত আর একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, স্যার ডেভিড অক্টরলনির উপাখ্যানটিও শোনার মতো। হ্যাঁ, মনুমেন্টওয়ালা অক্টরলনি। তাঁর সম্মানেই কলকাতার অন্যতম দর্শনীয় অক্টরলনি মনুমেন্ট। তিনিও অষ্টাদশ শতকের মানুষ। জন্ম ১৭৫৮ সনে, বোস্টনে। ওঁর পরিবার পরিজনরা পরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন কানাডায়। অক্টরলনি যখন ভারতের মাটিতে পা দেন তখন তাঁর বয়স সবে উনিশ বছর। টুকিটাকি কাজের পর বড় চাকুরি জোটে তাঁর ১৮০৩ সনে। ডেভিড অক্টরলনি সে-বছর নিযুক্ত হলেন দিল্লির দরবারে প্রথম ইংরাজ রেসিডেন্ট। কিন্তু তাঁর মতামত স্পষ্ট। তিনি একরোখা। জটিলতা কুটিলতা পছন্দ করেন না। অনেক ব্যাপারেই কোম্পানির কর্তাদের সঙ্গে তাঁর মত মেলে না। চার বছর পরে কর্তৃপক্ষ তাই তাঁকে সরিয়ে দিয়ে নতুন রেসিডেন্ট পাঠালেন দিল্লিত। তার মানে এই নয় যে, অক্টরলনি ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেলেন। তাঁর সাহস, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার মূল্য অস্বীকার করতে পারলেন না ওপরওয়ালারা। তাঁরা ওঁকে উত্তর ভারতেই রেখে দিলেন গভর্নর জেনারেলের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে। অক্টরলনির প্রধান দায়িত্ব—শিখ-সমস্যা। ১৮১৪ সনে শুরু হল গোরখাদের সঙ্গে কোম্পানির লড়াই। অক্টরলনি প্রথমে এই অভিযানের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবু ডাক যখন এসেছে, অসম সাহসিকতার সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত লড়ে গেলেন। সেই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'নাইট' করা হয়। কলকাতার মনুমেন্ট সে-গৌরবেরই স্মারক।

এরপর অক্টরলনিকে পাঠানো হল পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্য। তিনি কৃতী লড়িয়ে। ১৮১৮ সনে বয়স যখন তাঁর ষাট, তখন স্থিতি এল তাঁর জীবনে। দিল্লির দরবারের সঙ্গে দিব্যি খাতির জমিয়ে নিলেন অক্টরলনি। শালিমার বাগান এলাকায় অন্যতম শৌখিন বাসিন্দা তিনি। স্বদেশীয়দের চেয়ে তিনি বেশি পছন্দ করেন এদেশের মানুষ। অন্যান্য আধা-ভারতীয় সাহেবদের মতো অক্টরলনিও এদেশের পোশাক পরেন, খাবার খান, নাচ উপভোগ করেন। মুঘলদের মতো তাঁরও রয়েছে হারেম। শোনা যায়, অক্টরলনির হাতি ছিল তেরোটি। বিবির সংখ্যাও তেরো। এই তেরো বিবি নাকি তেরো হাতি চড়ে বের হতেন হাওয়া খেতে!

হাতির পিঠে অক্টরলনির তেরো বিবিকে ক'জন নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন আমরা জানি না, তবে দিল্লির এক স্থানীয় শিল্পীর সৌজন্যে এদেশের মেয়ে পরিবৃত হুকোর নল হাতে স্যার ডেভিড অক্টরলনির একটি ছবি বলে খবরটা বোধহয় গুজব নয়। তেরো না হলেও দশ-বারোটি মেয়ে আছে এই ছবিটিতে। তবে এরা ঠিক বিবি নয়, নর্তকী এই যা।

তালিকা আর শেষ হতে চায় না। একজনের কথা বলতে না-বলতে মনে পড়ে যায় অন্যজনের নাম। এলোপাথাড়ি অনেকের কথাই ভিড় করে আসে। যেমন—জেমস রুথভেন এলফিনস্টোন। কৃতী প্রশাসক। জেবুন্নিসা নামে একটি মেয়ে ছিলেন তাঁর বিবি। আর একটি নাম ছিল তাঁর—বুন্নুবিবি। এলফিনস্টোন শিল্পী চিনারিকে দিয়ে তাঁর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকিয়েছিলেন। ১৮২৪ সনে উইল করার সময় সেসব ছবি রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি নিজের জামাইকে। বেন্টিঙ্কের আমলে দিল্লিতে নিযুক্ত কমিশনার উইলিয়াম ফ্রাসারের বৈধ বিবিই ছিল নাকি ছয়-সাত জন। সাহেব নয় তো, যেন উনিশ শতকের কুলীন বাঙালি ব্রাহ্মণ। তবে এই সাহেব অনেক বেশি উদার। তাঁর ছেলেমেয়েদের তিনি মায়ের ধর্মমত অনুযায়ী গড়ে তুলতেন। কেউ হিন্দু ভাবে, কেউ মুসলিমের মতো। চার্লস মেটকাফ অতিশয় শিক্ষিত এবং সজ্জন। প্রশাসক হিসাবেও খুবই প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর। তিনি চলাফেরা করতেন হাতিতে চড়ে। কারণ, তাতে লেখাপড়া করতে অসুবিধা হয় না। তিনিও বিয়ে করেছিলেন একটি শিখ অথবা কাশ্মীরী মেয়েকে। তিনটি ছেলে ছিল ওঁদের। মেডাস টেলারের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৮৪০ সনেও শোনা যায় শোরপুরে দিব্যি বিবিখানা সাজিয়ে বাস করছেন তিনি।

এসব বিবিদের কেউ কেউ আজও বেঁচে আছেন। জানা-অজানা বংশধরদের মধ্যে নয়, বেঁচে আছেন নিজেরাই, আপন আপন রূপ আর যৌবন নিয়ে। এখনও সমান উজ্জ্বল, সমান লাবণ্যময় তাঁদের চোখমুখ। এই কৃতিত্ব, বলাই বাহুল্য, অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় শিল্পীদের। তুলি আর রঙে বলতে গেলে তাঁরা চিরযৌবনা করে রেখে গেছেন ভারতীয় সমাজের কিছু মেয়েকে। অন্যভাবে যাঁরা একদিন প্রায় পরিচয়হীন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও অগণিত মানুষের কাছে দর্শনীয়। ১৭৮৬ সনে লখনৌয় শিল্পী চার্লস-স্মিথের আঁকা জন উম্বওয়েলের বিবির দিকে তাকালে মনে হয় কোনও সম্রান্ত ভারতীয়দের ঘরের বউ। তাঁর পোশাকআসাক গহনাপত্র সব কিছুতে সুরুচির চিহ্ন। টমাস হিকির আঁকা উইলিয়াম হিকির প্রাণভোমরা জামদানী, যাঁর সম্পর্কে পাতার পর পাতা লিখে গেছেন হিকি, দুশ' বছর পরে এখনও তিনি কিন্তু চোখের নাগালে। ১৭৮৭ সনে কলকাতায় আঁকা এ-ছবি এখন ঝুলছে ডাবলিনে আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যাশনাল গ্যালারির দেওয়ালে। তবে এশিয়াটিক সোসাইটির ছবিটির মতোই এ-ছবি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে। জোর দিয়ে কেউ বলতে পারছেন না, এই মেয়েটিই জামদানী। গবেষকরা অবশ্য মনে করেন ওই ফিটফাট আদুরে-আদুরে চেহারার শান্তশিষ্ট মেয়েটি জামদানী হলে বিস্ময়ের কিছু নেই। বরং, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ, কলকাতায় উইলিয়ামের বাড়িতেই ছিল টমাসের আড্ডা। টমাস উইলিয়ামকে এঁকেছেন। জামদানী বাদ পড়ার সম্ভাবনা অতিশয় ক্ষীণ। আজকের দর্শক অতএব মোটামুটিভাবে এই ছবির নায়িকাকেই গ্রহণ করেছেন হিকির জামদানী বলে। অনুমান করি হিকির ডায়েরি-পাঠকরা এরপর মুদ্রিত জামদানীর সঙ্গে মিলিয়ে পড়বেন চিত্রিত জামদানীকে। হিকির এক বন্ধু কেন ওকে আদর করে 'ফ্যাটি' বলে ডাকত তা ভাববার চেষ্টা করবেন।

সত্যি, অবিশ্বাস্য সেইসব দিনের কথা। চূড়ান্ত হল্লার মধ্যে বাস করেছেন হিকি। নাচ, গান, আড্ডা। পানাহার। ভোজের আসর নয়তো, যেন মহোৎসব। সামাল দেবার দায় এই জামদানীর। সামান্য এক হিন্দুনারী,হিন্দুস্থানী-রমণী কলকাতার নাগরিকের গৃহকর্ত্রী। হিকি লিখে গেছেন আমার বন্ধুরা কেউ পীড়াপীড়ি করেও জামদানীকে মদ্যপানে উৎসাহিত করতে পারেনি। হিকির বন্ধু কর্নেল কুপারের বিবি নাকি ছিলেন আরও কড়া। কুপার রাতদিন মদ্যপান করতেন। এমনকি সকালেও। হিন্দুস্থানী মেয়েটি তাঁকে মাত্রা কমাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হন। হিকি লিখেছেন—মেয়েটি সব বোতল তালা দিয়ে রাখতেন। আলমারি খুলে দিতেন একমাত্র রাত্তিরে ডিনারের আগে। তাঁর আন্তরিকতার জোরেই নাকি কুপার তাঁর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পান। অনেক সাহেব বিবিদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের অনেক অভ্যাসই নাকি পাল্টে ফেলেছিলেন। এককালে এদেশের কমাণ্ডার ইন চীফ নুজেন্ট সাহেবের স্ত্রী কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব। তিনি লিখেছেন—অবাক কাণ্ড, এখানে এমন ইউরোপীয়ানও দেখছি যাঁরা বীফ খান না। কেউ কেউ শূকরের মাংস ছোঁয়েন না। সবই নাকি বিবিদের জন্য।

একদিন কিন্তু ফুরিয়ে গেল সেই যুগ। অবশ্য তোপধ্বনি করে হঠাৎ নয়, ধীরে ধীরে। কালো বিবিদের যুগ মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতক। উনিশ শতকের প্রথম দিকেও কোনও কোনও বিদেশী হয়তো বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন সেই ঐতিহ্য। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল সহজ স্বাভাবিক অপরাধবোধহীন মানবিক সম্পর্কের দিন ফুরিয়ে এসেছে। হিন্দুস্থানের হাওয়ায় যেন কীপলিংয়ের বাণী ; 'অ্যা ম্যান স্যুড, হোয়াটেভার হ্যাপেনস, কীপ টু হিজ ওন কাস্ট, রেস অ্যাণ্ড ব্রীড। লেট দি হোয়াইট গো টু দি হোয়াইট অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক টু দি ব্ল্যাক।' অর্থাৎ, যার যথা ঘর। যে যেখানে দাঁড়িয়ে।

অথচ অষ্টাদশ শতকে সাহেব পাড়ায় বলতে গেলে ঘরে ঘরে হিন্দুস্থানী বিবি। ক্যাপ্টেন টমাস

উইলিয়ামসন ১৮১০ সনে লিখেছেন এ-রীতি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাঁর মতে একে চরিত্রহীনতা বা লাম্পট্য বলা ঠিক নয়। একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলেই বোঝা যায় এ ছাড়া উপায় নেই। বাংলা-মুলুকে ইউরোপীয় পুরুষের তুলনায় মেয়ে কি যথেষ্ট ? তিনি লিখেছেন এই তল্লাটে আড়াইশ' ইউরোপীয় মহিলা আছে কিনা সন্দেহ, অথচ সামরিক বাহিনীর লোকেদের ধরলে সম্ভ্রান্ত ইংরাজের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। তাছাড়া ইউরোপীয় মেয়েদের স্ত্রী হিসাবে পোষা কজনের পক্ষে সম্ভব ? তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং, অনেকে এদেশীয় মেয়েদের সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য হন। কোম্পানির হুকুম ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করা চলবে না। ওঁরা তাই বিয়ে না-করেই একসঙ্গে বাস করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে না-হলেও দু'পক্ষই মনে করেন তাঁরা বিবাহিত। তাঁদের সম্পর্ক প্রভু এবং রক্ষিতার নয়, ভালবাসা ও সম্মানের সম্পর্ক। সমাজের চোখেও ওঁরা স্বামী-স্ত্রী। উইলিয়ামসন লিখেছেন কুড়ি বছর এমন কি তার চেয়ে বেশি দিন ধরে ভারতীয় বিবি নিয়ে ঘর সংসার করছেন এমন ইউরোপীয়ানের অভাব নেই।
কথাটা যে মিথ্যে নয় সাহেব-বিবির এইসব কাহিনীগুলোই তার প্রমাণ। সাহেবরা কীভাবে তাঁদের সংগ্রহ করতেন, সকলের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেটা স্পষ্ট নয়। জাতপাতের নানা বিধিনিষেধ ছিল বটে, কিন্তু অনুমান করতে অসুবিধা নেই, এদেশে সেদিন পরদেশীর হাতছানিতে লুব্ধ হওয়ার মতো মেয়ের অভাব ছিল না। রাজনৈতিক বিচারে অষ্টাদশ শতক অস্থিরতার কাল। দেশময় যুদ্ধবিগ্রহ। উত্থান-পতন। অনেক পরিবারেই নিরাপত্তার প্রশ্ন সেদিন জরুরি। কেউ কেউ নিশ্চয় এক ধরনের আত্মীয়তা স্থাপনের বাসনায়ও বিদেশীদের কন্যাদান করেছেন। মুঘল আমলে রাজপুতরা যেমন ! তাছাড়া ভারত গরিবের দেশ। খেয়ে পরে বেঁচে থাকাটাও অনেকের কাছে স্বপ্ন। নবাব বাদশাদের হারেমে অতএব সুন্দরীর অভব ঘটেনি কোনদিন।
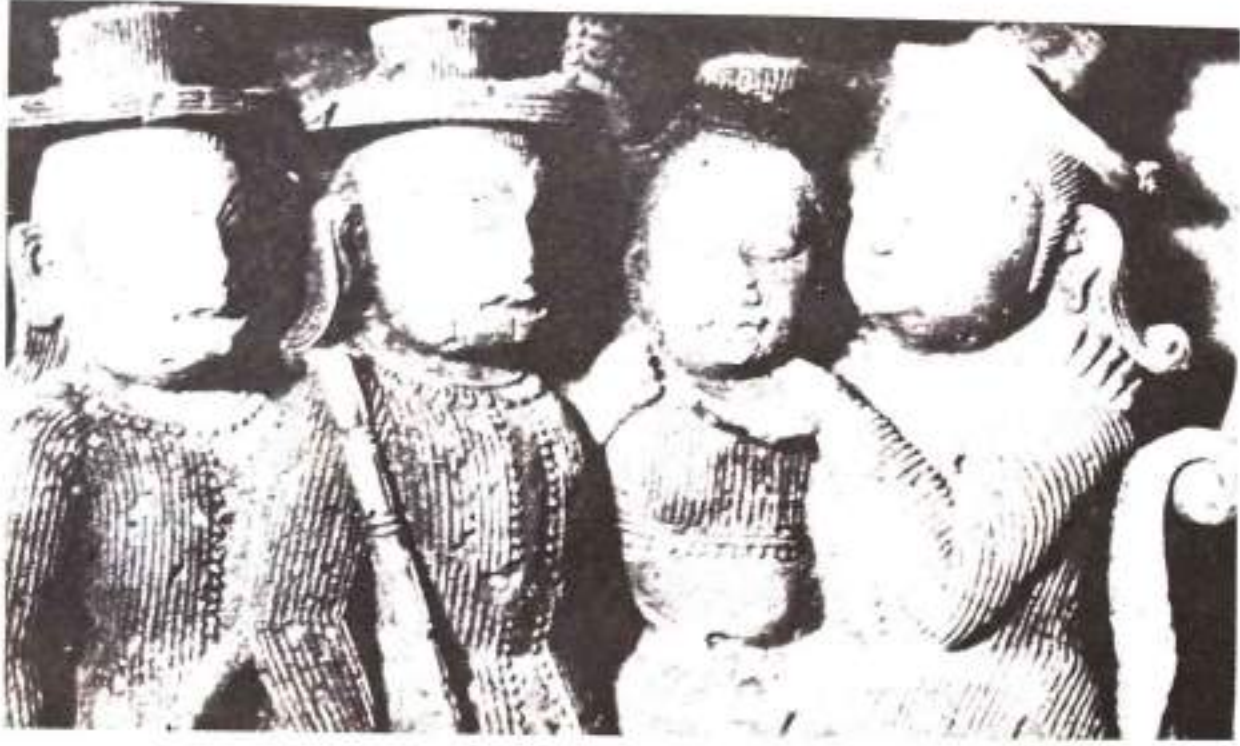
পশ্চিমের বিজয়ীদের বিবিখানাও সে সব কারণেই শূন্য থাকেনি। একজন লিখেছেন—এই বিবিদের প্রতি দশ জনের মধ্যে নয় জনই ছিলেন মুসলমান। হিন্দুরা পুরোপুরি 'যবনের ছোঁয়া' এড়িয়ে চলতে পেরেছেন এমন মনে করার কোনও হেতু নেই। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই, অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকের এই সব বিবিরা যে পথেই সাহেব কুঠিতে এসে পৌঁছে থাকুন না কেন, খুব কমই বোধহয় তলোয়ারের আস্ফালন দেখে আত্মসমর্পিত। বঙ্কিমচন্দ্রের লরেন্স ফস্টার কিংবা দীনবন্ধুর রোগ সাহেব সেদিন মঞ্চে অনুপস্থিত। এদের আর্বিভাব পরবর্তীকালে।

খবরটা প্রথম বের হয় মাদ্রাজের একটি কাগজে। সংবাদের মর্ম : একজন ব্রিটিশ সৈনিক দুটি স্থানীয় মেয়েকে ধাওয়া করে। তারা প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে একটি কুঁড়ে ঘরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে দেয়। হামপান্না নামে গাঁয়ের একটি ছেলে তাই দেখে লাঠি নিয়ে ছুটে আসে। সে সৈন্যদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আর্নেস্ট অ্যাসফোর্ড নামে একজন ল্যান্স-কর্পোরাল তাকে গুলি করে মেরে ফেলে। কাগজটির জিজ্ঞাসা—যদি হিন্দু চাষীরা এভাবে কোনও ইংরাজ মহিলার পিছু পিছু তাড়া করত এবং তাকে রক্ষা করবার জন্য কোনও ইংরাজ মারা যেত তবে কী হত ? সরকার কি তখন চুপ করে থাকতেন ? লেখালেখির ফলে সরকার অবশ্য শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকতে পারেননি। সৈন্যদের বিচার হয়েছিল। কিন্তু সাজা হয়নি। উল্টো-পাল্টা সাক্ষীর দোহাই পেড়ে জুরিরা সৈন্যটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁরা বললেন—অ্যাসফোর্ড আত্মরক্ষার্থে গুলি করতে বাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তার বয়সও খুব কম, মাত্র উনিশ বছর। আসলে দিন পাল্টে গেছে। ভারতে তখন অষ্টাদশ নয়, উনিশ শতক চলছে। এ-খবর ১৮৯৩ সনের।

শিয়ালকোটের ঘটনা। গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড কার্জন। ৯ নম্বর ল্যান্সাররা সবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছে। সেদিনই তাদের হাতে খুন হয়ে গেল একজন ভারতীয় পাচক। ব্রিটিশ সৈন্যরা পিটাতে পিটাতে মেরে ফেলেছে তাকে। বেচারার অপরাধ গোরা সৈন্যদের আদেশ পালন করতে

৮৭. বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণে গোরা-লীলা। বাঙালি রমণী নিয়ে রঙ্গ করছেন আমুদে সাহেব। আঠারো শতক।

৮৮. এদেশের মেয়েদের নিয়ে আমোদ প্রমোদে মত্ত বিদেশী। বাংলার মন্দির অলঙ্করণ। আঠারো শতক।

সম্মত হয়নি। ওরা তাকে বলেছিল একটি কিংবা একাধিক ভারতীয় মেয়ে জোগাড় করে আনতে। পাচকটি তাতে রাজী নয়। সুতরাং এই শাস্তি। কর্তৃপক্ষ প্রথম চেষ্টা করেছিলেন ঘটনাটা চাপা দিতে। কিন্তু পারেন নি। খবরটা গভর্নর জেনারেলের কানে পৌঁছায় তবু খুনীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি। তবে কার্জন পাইকারিভাবে তাদের শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে স্বভাবতই সেনাবাহিনী মনে মনে অসন্তুষ্ট। তাদের অসন্তোষ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছেছিল কার্জনের কাছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গেল পরবর্তী ঘটনায়। ঘটা করে তিনি সেবার এক রেজিমেণ্টাল দরবারের আয়োজন করেছিলেন। সেই আসরে 'অপরাধী' ওই লান্সার বাহিনীকে দেখা মাত্র উপস্থিত ইউরোপীয়ানদের সে কী উল্লাস। তাঁরা সেদিন অভিনন্দন জানিয়েছিল ওদের। ভারতে তখন সত্যই উনিশ শতক।

আগেই বলেছি দিশি বিবিদের কাল তখন গত। তার পিছনে অনেক কারণের একটি, সাহেবের ঘরে দিশি বিবি থাকার অর্থ ভারতীয়দের সঙ্গে দূরত্ব কমে যাওয়া। নতুন পরিবেশে নতুন পরিস্থিতিতে এ-ধরনের আত্মীয়তা মোটেই কাম্য নয়। ফলে উনিশ শতকে কেউ বিবি রাখলে তাঁকে নিয়ে সরকার রীতিমত বিচলিত। কখনও বা রুষ্ট। দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন ওয়াল্টারস। তিনি থাকতেন আজমীরের বেওয়ার নামে একটা জায়গায়। একই বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকতেন স্থানীয় সিভিল সার্জন ডাঃ নেল। নেল সাহেবের এক বিবি ছিল। তিনি ওয়াল্টারসেরও দেখাশোনা করতেন। দেখাশোনা মানে জামা সেলাই করা বা টুকিটাকি কাজ করে দেওয়া। নেল বাইরে গেলে মেয়েটির দেখাশোনার ভার থাকত ওয়াল্টারসের ওপর। ১৮৬৮ সনের কথা। এই বিবিকে নিয়ে দুই সাহেবের মধ্যে মারামারি। কারণ আর কিছু নয়, নেল সাহেবের ধারণা ওয়াল্টারস তাঁর বিবিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। যথাসময়ে ওপরতলায় খবর গেল। কর্তৃপক্ষ সব শুনে অতিশয়

কই, একজন সামান্য ভারতীয় রমণী নিয়ে দু'জন রাজকর্মচারীর এমন আচরণ ? এদেশের লোকের কাছে সরকার মুখ দেখাবেন কেমন করে ? ডঃ নেল এবং ওয়াল্টারস—দু'জনেরই চাকরি গেল । ওয়াল্টারস তাঁর সামরিক পদবীটিও হারালেন । উনিশ শতকের কাহিনী অন্যরকম বই কি ।

লখনৌর খবর । সৈন্যদের কাছাকাছি বারবণিতাদের ঘরে উঁকি দিয়েছেন এদেশে ব্রিটিশ চরিত্ররক্ষক বাহিনীর এক মহিলা । একটি মেয়ের কাছে পাওয়া গেল একজন ব্রিটিশ নন-কমিশনড-অফিসারের একটি চিঠি । তিনি লিখেছেন—তার ইচ্ছা ওকে নিয়ে এদেশেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয় । দু'জনে মিলে সংসার পাতে । কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট বাদ সাধলেন । এই চিঠির কথা শুনে ছেলেটিকে লম্বা ছুটি দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন দেশে । ইচ্ছা থাকলেও ইংরাজের তখন উপায় নেই কোনও ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক গড়ে তোলার । পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে-ধরনের চিন্তা স্বদেশ এবং স্বজাতির অপমানের সামিল । আঠারো শতকের ইংরাজের সঙ্গে অনেক ফারাক উনিশ শতকের ইংরাজের । ওরা যেন তখন অন্য প্রজাতি ।

এই রূপান্তরের পিছনে কারণ অনেক । অষ্টাদশ শতকে এদেশে ইংরাজরা ছিলেন মূলত শ্রেষ্ঠী ।—'মানি ইন বোথ পকেটস্ ।' এই ছিল তাঁদের ডিনার টেবিলে স্লোগান । ওয়ারেন হেস্টিংস তখন সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে রাজা নবকৃষ্ণ কিংবা রেনারাম পণ্ডিতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন, ক্লাইভ দুর্গাপুজো দেখতে হানা দিতে পারেন শোভাবাজার কিংবা চিৎপুরে । পরিস্থিতিতে প্রথম কিছুটা পরিবর্তন ঘটে লর্ড কর্নওয়ালিশের আমলে (১৭৮৬-১৭৯৩) । তারপর আরও পরিবর্তন লর্ড ওয়েলেসলির কালে (১৭৯৮-১৮০৫) । ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরাজদের দূরত্ব তারপর থেকে ক্রমে বাড়তেই থাকে । কেননা, ইংরাজ ক্রমে পরিণত বিজয়ী জাতিতে । তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রসারিত হচ্ছে । দেশ নিজেদের অধিকারে আসছে । সুতরাং, বণিকভাবের বদলে তাদের মধ্যে তখন শাসকের দাম্ভিকতা । স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে অতএব তখন মেলামেশার প্রশ্নই ওঠে না । শাসক-শাসিতের এই ব্যবধান আরও প্রবল হয়ে ওঠে ১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের পরে । দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব সাত সমুদ্রের চেহারা নেয় লর্ড কার্জনের আমলে (১৮৯৯-১৯০৫) । সকলেই জানেন, সাম্রাজ্যের তখন মধ্যাহ্ন ।

ইতিমধ্যে অবশ্য আরও কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে । প্রশাসনিক প্রয়োজনেই এদেশে ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা বেড়েছে । নানা পেশার লোকেরা আসছেন । ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে সৈন্যরা । উনিশ শতকের মাঝামাঝি এদেশে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার । ভারতীয় সিপাই অবশ্য তার তিনগুণ । মহাবিদ্রোহের পরে গোরা সৈন্যের সংখ্যা ষাট হাজারে পৌঁছায় । ভারতীয় তখন দ্বিগুণ । এদিকে সুয়েজ বেয়ে দলে দলে আসতে শুরু করেছেন গোরা বিবির দল । সুয়েজে প্রথম স্টিমের জাহাজ চলে ১৮৩০ সনে । পি অ্যান্ড ও'র জাহাজ অবশ্য আনাগোনা শুরু করে আরও পরে, ১৮৭০ থেকে । মেমসাহেবরা শুধু যে বিবিখানার সম্ভাবনাকেই বানচাল করে দিলেন তাই নয়, তাঁরা নিজেদের জন্য গড়ে তুললেন নিজস্ব সমাজ । প্রত্যেক সিভিল স্টেশনে তাঁদের বিশুদ্ধ সাদা সমাজ । আনাগোনা, খানাপিনা, মেলামেশা, প্রণয় অথবা বিচ্ছেদ সবই নিজেদের মধ্যে । নিজেদের ক্লাব, নিজেদের পার্ক, নিজেদের দোকান । সব মিলিয়ে যেন গুটিপোকার উপনিবেশ । শহরগুলির ভাগাভাগি আরও স্পষ্ট হয়ে গেল । সর্বত্র হোয়াইট টাউন আর ব্ল্যাকটাউন । সংকরদের জন্য মাঝখানে দেওয়ালের মতো ধূসর এলাকা । হোয়াইট টাউনের বাসিন্দারা দৈবাৎ উঁকি দেন কালোদের শহরে । সে সব কৃষ্ণনগর তাঁদের কাছে নিষিদ্ধ এলাকা । সৈন্যদের জন্য তেমনই রয়েছে ক্যান্টনমেন্ট । রেজিমেন্টাল বাজার । সেন্ট্রাল বাজার । ১৮১৩ সন থেকে পাদ্রীদেরও নিয়মিত আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে । শাসকদের নৈতিক অধঃপতন রোধ করার পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরা ।

৮৯. নাচের আসরে ডেভিড অক্টোরলনি । তাঁর নাকি ছিল তেরো বিবি । ছবিটি এঁকেছেন নাম-না-জানা কোনও এদেশীয় চিত্রকর । ১৮৩০ ।

মেমসাহেব এখন আর তাম্রবর্ণ সতীনের কথা ভাবতে পারেন না। 'ইন্ডিয়ান পাঞ্চ'-এ এখন ব্যঙ্গচিত্র বের হয় মেম নিজের সাহেবকে বলছেন—এ কেমন কথা আয়া বলছে তার মেয়ে নাকি অবিকল আমার মতো দেখতে।—ডিড ইউ এভার হিয়ার সাচ্ ইম্পুডেন্স ?' সাহেব নির্বোধের মতো দাড়ি চুলকাতে থাকে। এ-রসিকতা ১৮৬০ সনের। সাহেব কিন্তু আয়া কিংবা তার মেয়েকে নিয়ে কোনও শিল্পী বা আলোকচিত্রীর কাছে ছুটে যান নি। তিনি এখন জানেন না এ প্রশ্নের কী উত্তর ! ঠিক তেমনই মধ্যরাত্রে বোম্বাইয়ের পথে চিৎকার করে ফিরছেন তখন যাজক কিংবা তাঁদের অনুচররা। একটা কাগজ ব্যঙ্গ করে তাঁদের আখ্যা দিয়েছিল 'পিউরিটিওয়ালা'। এই 'মিডনাইট মিশন' বা মধ্যরাত্রির ত্রাণ অভিযানের লক্ষ্য ইউরোপীয় প্রমোদ কন্যারা। শ্বেতাঙ্গ যাজকরা চাননা শ্বেতাঙ্গ বারবিলাসিনীরা এভাবে ভারতীয়দের চোখের সামনে প্রমোদ বিতরণ করুক। দলে কিছু কমবয়সী মেমসাহেবও ছিলেন। স্বভাবতই আবছা অন্ধকারে কেউ কেউ তাঁদের ধরে নিয়েছিলেন বারবিলাসিনী বলে। পাদ্রীদের ভাষায়—'মিস্‌ফরচুনেটস !' যেন ওঁরাও হতভাগিনীদেরই দলে। কোনও কোনও পাদ্রী অবশ্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন এই অভিযানের জন্য। তিক্ত বিরক্ত পেশাদার মেয়েরা নাকি শীতের রাত্তিরে বালতি ভর্তি জল ঢেলে দিত তাঁদের মাথায় ! তবু চুপচাপ বসে থাকার উপায় নেই। কেননা, ইংরাজ তখন রাজার জাত ! তারা বিজয়ী, ভারতীয়রা পরাজিত। ওদের সামনে মাথা হেঁট করতে দেওয়া যায় না।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপীয়দের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে ছিলেন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। সেটা 'ওরিয়েন্টালিস্ট' বা প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদদের কাল। উনিশ শতকে মেকলে রায় দিলেন—ভারত এবং আরবের সাহিত্যের জন্য ইউরোপের যেকোনও ভাল লাইব্রেরির একখানা তাকই যথেষ্ট। এই অহমিকার পেছনে ছিল রেনেসাঁস পরবর্তী ইউরোপের আত্মপ্রত্যয়, নতুন নতুন ভৌগোলিক আবিষ্কার, দিকে দিকে সফল অভিযান ; বেন্থাম-মিলের নতুন দর্শন, সর্বোপরি শিল্প-বিপ্লব। ভারতের অতীত নয়, ইংরাজের গর্বের বস্তু তখন নিজেদের বর্তমান। সহসা যেন তারা জেনেছে দেহবর্ণ থেকে শুরু করে, সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আচার ব্যবহার, ধর্ম—সব দিক থেকেই তারা ভারতীয়দের থেকে শুধু স্বতন্ত্র নয়,—শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তখন। কখনও কখনও অত্যন্ত স্থূলভাবে। কখনও বা চেহারা তার আরও নগ্ন—হিংস্র। রামমোহন সাহেবের সামনে পালকি চড়ে অপমানিত হয়েছিলেন, অসংখ্য ভারতীয় প্রতিদিন অপমানিত হয়েছেন রেলে চড়তে গিয়ে। সাহেবের সামনে ভারতীয় তখন জুতো পরার অধিকার থেকেও বঞ্চিত। সাম্রাজ্যবাদীর কাছে সামান্য চটিজুতারও মাহাত্ম্য অনেক। এমনকি লিবারেলরা, যাঁরা আদর্শগত কারণে এদেশের মানুষের কল্যাণকামী, তাঁরাও কখনও কখনও শ্বেত জাতির গরিমায় ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন ঔদার্যের মুখোশ।

এই জাতিতত্ত্ব, বলাই বাহুল্য, সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অতিশয় জরুরি ছিল। ভারতীয়রাও জানতেন—এদেশে রাজত্ব করার স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি দেখানো ছাড়া ইংরাজের উপায় নেই। জাতিবিদ্বেষ আসলে সাম্রাজ্যের ভিত। বঙ্কিমচন্দ্র একে আখ্যা দিয়েছিলেন —জাতি-বৈর। ১৮৭৩ সনে তিনি লিখেছিলেন—ইংরাজ এবং ভারতীয় 'এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতি-বৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরাজরা ও দেশীয় লোক এই জাতি-বৈরের জন্য দুঃখিত। তাঁহারা জাতি-বৈরকে অশুভকরী মনে করিয়া, ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যেসকল সম্বাদপত্রে এই জাতি-বৈরের পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতেই আবার ইহার নিরাকরণার্থ নানাবিধ কৃটার্থ, অলঙ্কারবিশিষ্ট প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ দ্বিজাতীয় সমাজ, সভা, সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যবিক্রেতাদের আনন্দবৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ-রোগর উপশম হইল না।' উপশম
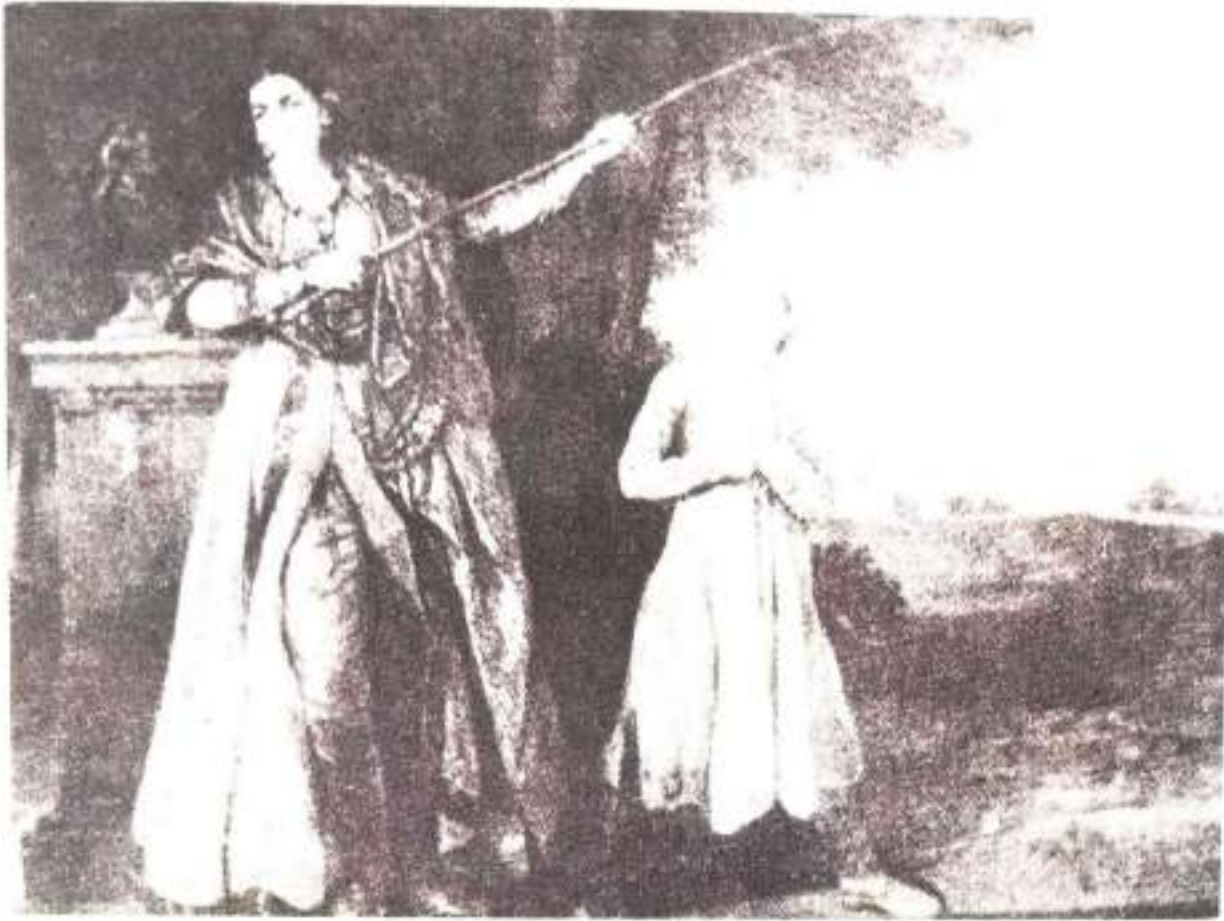
হয়নি, কারণ ব্যাধি ছিল মজ্জায়। কান পাতলে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই শোনা যেত ইংরাজের মনের কথা। কোম্পানি এদেশে ইউরোপীয়ানদের বসবাসের বিপক্ষে কেন, তা বিশদ করতে গিয়ে বোর্ড অব কনট্রোলের প্রেসিডেন্ট ডানডাস বলেছিলেন—তা হলে ইংরাজের প্রতি ভারতীয়দের যে শ্রদ্ধাভক্তি আছে তা লোপ পাবে, আমাদের ভারতীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। ওদেশে বেশি সংখ্যায় ইউরোপীয়ানরা গিয়ে হাজির হলে ভারতীয়রা আর বিশ্বাস করতে চাইবে না যে আমাদের চরিত্র তাদের চেয়ে উচ্চমানের। ভারতে ইউরোপীয়ানদের আগমন অবশ্য রোধ করা যায়নি। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনেই তাদের ছাড়পত্র দিতে হয়েছিল পরবর্তীকালে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিল তাদের দূরত্ব রেখে চলা চাই। তার ওপরই নির্ভর করছে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলনীতি—বৈষম্য। যদিও ব্রিটেনের মন্ত্র তখন আইনের চোখে সবাই সবাই সমান, তবু ভারতে দেখা গেল কেউ কেউ বেশি সমান। বৈষম্য, শুদ্ধ জাতি বিদ্বেষবশত বৈষম্য। উনিশ শতকে এদেশে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস বলতে গেলে জাতিবিদ্বেষ আর বৈষম্যের ইতিহাস। 'নিগার', 'ব্ল্যাক ব্রুটস্' 'কপার কমপ্লেক্সড পেগানস'—অনেক সাহেবের মুখে এসব গালি তখন বুলি।

বৈষম্য এবং জাতিবিদ্বেষ সেদিন সবচেয়ে বেশি প্রকট বোধহয় প্রশাসন আর বিচারবিভাগে। 'স্টীল ফ্রেম' বা ইস্পাতের কাঠামো হিসাবে বর্ণিত আই সি এস বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কথাই ধরা যাক।

৯০. লক্ষ্ণৌর বিদেশী-নবাব মার্টিন সাহেবের বিবি বোলন। শিল্পী : ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। ১৭৯৪-৯৫।

দীর্ঘকাল এই চাকুরি ছিল ভারতীয়দের নাগালের বাইরে। ব্রিটেনের কয়টি স্কুল আর দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর নিয়মিতভাবে সরবরাহ করে গেছে তাঁদের। অক্সফোর্ডের একটি কলেজের কর্তা নাকি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আই সি এস মনোনীত হবে বলে—যাক বাঁচা গেল, তিনি নাকি বলেছিলেন, অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েটদের আর ভাবতে হবে না এই জীবন নিয়ে তারা কী করবে! প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় ১৮৫৫ সনে। দেখা গেল সকল পরীক্ষার্থীদের শতকরা ষাট জনই অক্সফোর্ডের ছেলে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৭ সনের মধ্যে প্রায় ষোলশ' আই সি এস নিযুক্ত হয়েছেন। সবাই ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। আই সি এস 'স্টীল ফ্রেম' মাত্র নয়, বলা চলে স্টেনলেস স্টীলের ফ্রেম! ১৮৩৩ সনের চার্টার অনুযায়ী ভারতীয়রাও উচ্চপদের দাবি জানাবার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সবাই জানেন, প্রথম ভারতীয় আই সি এসের আবির্ভাব ১৮৭০ সনে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সে বছর ৯১৬ জনের একজন! তাঁর সঙ্গে যখন আরও দুজন বাঙালি যোগ দেন তখন কলকাতায় সে কী উল্লাস! ভারতীয়দের জন্য দুয়ার খোলা থাকলেও বুঝতে অসুবিধা নেই, ভেতরে ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বয়স, ভাষা, পাঠক্রম—সব কিছুই যেন তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য। ফলে ১৯১৫ সনেও দেখা যায় ভারতে এদেশীয় আই সি এসের সংখ্যা মাত্র ৬৩ জন, মোট সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের বেশি নয়। ১৯৩০ সনেও এই 'স্বর্গীয় চাকুরিতে' ভারতীয়দের সংখ্যা ৩৬৭ জন মাত্র। অথচ প্রতিশ্রুতি ছিল শতকরা ৪৮ ভাগ চাকুরি নাকি তাঁদের জন্যই বরাদ্দ করা আছে। একটা হিসাবে দেখা যায় ১৮৪২ সনে এদেশে ৮২৫ জন ইংরাজ আমলা প্রতি ১ জন মাত্র ভারতীয়। ভারতীয়রা একমাত্র সেই সব পদগুলোই পেতেন যেগুলো সাহেবদের পছন্দ নয়। বেতনেও ছিল অবিশ্বাস্যরকম বৈষম্য। অনুপাত কখনও কখনও ১ আর ২৫। ২৫ কখনও বা ২৯।

বিচার ব্যবস্থার বৈষম্য নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: রেসইজম, স্ট্রাগল ফর ইকুয়ালিটি অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালইজম,—নিমাইসাধন বসু) প্রথমত ১৮২৫ সনের জুরি আইন। সে-আইনে জুরি হওয়ার অধিকার একমাত্র খ্রীস্টানদের! ভারতীয়রা তাই নিয়ে হল্লা শুরু করেন। সবিস্ময়ে ইংরাজ দেখতে পেল ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় ইংরাজদের ন্যায়বিচারের তত্ত্বকেই ব্যবহার করছে শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩২ সনে বৈষম্যমূলক ধারাগুলো বাতিল হয়। তারপর ১৮৩৬ সনের ১১ আইন। এ-আইনের লক্ষ্য ছিল মফঃস্বলের ইউরোপীয়ানদের আদালতের আওতায় আনা। তবে ফৌজদারি নয়, দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে। ইউরোপীয়ানদের ফৌজদারি মামলার বিচারের অধিকারের কথা বলা হয় ১৮৪৯ সনের এক 'বিল'-এ। ১৮৮৩ সনে বিখ্যাত ইলবার্ট বিল। এদেশের ইউরোপীয়ার গরিষ্ঠ অংশ তাই শুনে ক্ষেপে গেলেন। এইসব 'বিল' তাদের চোখে কালাকানুন, ব্ল্যাক অ্যাক্ট! ইলবার্ট বিল-এ বলা হয়েছিল তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরের বাইরে ভারতীয় বিচারপতিরা ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করতে পারবেন। কিন্তু স্থানীয় ইংরাজদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। জোড়াতালি দিয়ে বলা হল—জুরিদের অন্তত অর্ধেক ইউরোপীয়ান হতে হবে, নয়তো আমেরিকান।

এভাবেই চলেছে বৈষম্য। এবং তার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তেই ক্রমে জন্ম নিয়েছে ভারতীয় জাতীয়তা। সম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস, ঐক্য, স্বাধীনতার স্পৃহা। ভারতীয় বিচারক ইংরাজ মহিলারও বিচার করতে পারেন এই সম্ভাবনার কথা ভেবে শিউরে উঠেছিলেন একজন মেম সাহেব। কেননা, তিনি মনে করেন ভারতীয়দের সামাজিক ধ্যানধারণা সভ্যতার সীমানার বাইরে। সেই উপলক্ষেই হেমচন্দ্রের বিখ্যাত কবিতা—'নেভার,—নেভার।' —"'নেভার' সে অপমান, হতমান বিবিজান/নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের 'জানানা'। দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না ॥'

৯১. এই মুসলমান অলস-কন্যাটি ছিলেন ঢাকায় কোনও সাহেবের বিবি। শিল্পী: ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি। ১৭৮৯।

—কলকাতায় কি সত্যই কোনও বার-মেডের দরকার আছে ? প্রশ্ন তুলেছিলেন লর্ড কার্জন। ১৯০০ সনের কথা। রেঙ্গুনে আত্মহত্যা করেছেন একটি ইংরাজ মেয়ে। নাম তাঁর মিস রবিনসন। তাই নিয়ে কলকাতায়ও প্রভূত উত্তেজনা। বিচলিত কার্জন সওয়াল জুড়লেন—হতে পারে এদেশে কিছু কিছু বার-মেড বিয়ে করে সংসারী হয়। কেউ হয়তো রক্ষিতার জীবন মেনে নেয়। কারও কারও জীবন হয়তো বরবাদও হয়ে যায়। সুতরাং, কী দরকার এদের আমদানি করে ? কার্জন কিন্তু আসলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত ভাবিত নন, যতখানি ভাবনা তাঁর ইংরাজের গৌরব রক্ষার জন্য। তিনি খোলাখুলি বলেছেন—এদেশে ইংরাজ মেয়েদের তিনি এমন পেশায় দেখতে চাননা যার ফলে ভারতীয়রা ইংরাজদের সম্পর্কে অন্যরকম ভাবার সুযোগ পায়। বিশেষত, হোটেল রেস্তোরাঁয় বার-মেডরা তো শুধু ইংরেজদেরই মদ পরিবেশন করে না, ভারতীয়রাও সেখানে হানা দিতে পারে।—'ইট ইজ প্লেনলি নট ডিজায়ারএবল দ্যাট ইংলিশ উইমেন শুড সার্ভ ড্রিংক টু দি মেন অব মিক্সড রেসেস হু ড্রিফট ইন টু বারস অব ক্যালকাটা অর রেঙ্গুন।' তাছাড়া তিনি নাকি শুনেছেন এইসব বার-কন্যারা তরুণ ভারতীয়দের আপ্যায়ন করা পছন্দও করে না।

—ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য ভারতীয় বারবনিতারা কি আলাদাভাবে সংরক্ষিত ! সরকারের তরফে এক কমিশন জানতে চেয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর কর্তাদের কাছে। তাঁরা জানালেন—না, সে-ধরনের কোনও বৈষম্য নেই। কিন্তু সৈন্যরা একের পর এক বলে গেল—আছে। মিলিটারি পুলিশ আমাদের এলাকায়

কোনও ভারতীয় সিপাইকে দেখলে তাড়িয়ে দেয়। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়দের সম্পর্কে অন্য কথা!

উনিশ শতকে ইংরাজ রাজত্বে সাধারণ সাহেবদের যৌন জীবন পর্যন্ত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রিত। তার জন্য কত কাণ্ডই না করা হয়েছে সেদিন। (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : রেস, সেক্স অ্যাণ্ড ক্লাস-আণ্ডার দি রাজ—কেনেথ বালহ্যাচেট।) একালের একজন গবেষকের মতে সাম্রাজ্যবাদের পেছনে এক তাড়না ছিল জৈব তাগিদ! তৎকালের ইংলণ্ডে সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে জৈব চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। অনেকের জীবনেই ছিল অতৃপ্তি। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার পেছনে সেই নৈরাশ্যও নাকি ছিল ক্রিয়াশীল। বিদেশে সুযোগ বেশি, বৈচিত্র্যও বেশি। অন্যদিকে সমাজের শাসন অনুপস্থিত। অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতের পক্ষে এমনিতেই সামাজিক সংস্কারের বন্ধন কিছুটা আলগা। বিদেশে স্বভাবতই তারা আরও যদৃচ্ছ। কীপলিংও ইঙ্গিতে বলেছেন—সুয়েজের পুবে অবাধ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি। সুতরাং, খুব উচ্চস্তরের ইংরাজদের বাদ দিলে সাধারণ টমি যে কিছুটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে সে সম্ভাবনা বরাবরই ছিল। এমন কি উনিশ শতকেও। সুতরাং, প্রতি ক্যান্টনমেন্টে ছিল—'লালবাজার'। লালবাজার বলতে সাহেবরা তখন বোঝে 'রেডলাইট এরিয়া'। এ বাজার চলনশীল। কোনও বাহিনী যখন মার্চ করে তখন তার পিছু পিছু চলে 'লালবাজার'। তাছাড়া উপায় নেই। কেননা, কর্তৃপক্ষ বলেন—সব শ্রেণীর মানুষের পক্ষে রিপুকে শাসনে রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং, এ-ধরনের বন্দোবস্ত না-থাকলে সাধারণ সৈনিকের শরীর মন তাজা রাখা শক্ত। তাছাড়া বাহিনীতে নানা ধরনের বিকৃতিও দেখা দেওয়া সম্ভব।

দেখা গেল এই বন্দোবস্তের ফলে অন্য বিপদও থাকতে পারে। সৈন্যরা বিপজ্জনক ব্যাধি কবলিত হতে পারে। সুতরাং, শুরু হল অন্য উদ্যোগ। 'লক হসপিটাল', 'কনটাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট'—ইত্যাদি। 'লক হসপিট্যাল' মানে 'লালবাজার' থেকে সন্দেহজনক মেয়েদের তুলে এনে আটকে রেখে তাদের চিকিৎসা করা। বিলাতে এ-ধরনের আইন ছিল। ১৮৬৮ সনে সে-আইন চালু হল এদেশেও। পতিতাবৃত্তির উচ্ছেদ নয়, ভারতীয় মেয়েদের জন্য এই দরদের হেতু একটাই—ব্রিটিশ সৈন্যদের স্বাস্থ্য!

ক্যান্টনমেন্টের লাগোয়া লালবাজারগুলোর পৃষ্ঠপোষক ছিল সামরিক বিভাগ। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সৈন্যদের ক্যান্টিন ফাণ্ড থেকে মাসে পাঁচ টাকা বেতন দিয়ে কোনও মেয়েকে নিযুক্ত করা হত। দরদামও বাঁধা; সার্জেন্ট এক টাকা, কর্পোরাল আট আনা, গোলন্দাজ ছয় আনা, প্রাইভেট চার আনা। পুলিশ মাঝে মাঝে হানা দিত সেখানে। অসুস্থ মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে আসত হাসপাতালে। ব্রিটিশ সৈন্যরা যেহেতু রেজিমেন্টাল বাজারের মেয়েদের ওপরই নির্ভর করত না সেজন্য শহরের লাল আলোর চৌহদ্দিতে হামলা চলত কখনও কখনও। তাই নিয়ে স্বভাবতই ভারতীয়রা উত্তেজিত। ১৮৬৮ সনে কলকাতায় এই আইন চালু হওয়ার পর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। বেশ কিছু প্রহসনও লেখা হয়েছিল এই ব্যাপার নিয়ে। একটির নাম—'বাহবা চৌদ্দ আইন!'

ব্রিটিশ সৈন্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার চিন্তায় কর্তৃপক্ষ অনেক কাণ্ডই করেছেন ভারতীয় বারবণিতাদের নিয়ে। কখনও আইনের প্রয়োগ, কড়াকড়ি, কখনও শিথিল। কখনও 'লক হাসপাতালের' দুয়ার খোলা, কখনও বন্ধ। সংক্রামিতের পরিসংখ্যান নিয়ে কত না খেলা। আজকের পশ্চিমী গবেষকের কাছে সেসবও কিন্তু মূলত বৈষম্যমূলক সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই রকমফের। ছোঁয়াছুঁয়ি এড়ানো যাচ্ছে না বলেই না এইসব বন্দোবস্ত। পারলে সরকার যে এদেশের মেয়েদের ব্রিটিশ সৈন্যদের থেকে দূরে রাখতেন তার প্রমাণ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের একটি ঘটনা। ১৮৯৭ সনের কথা। ঘোষণা করা হল কোনও ভারতীয় মেয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে ঘাস কাটতে যেতে পারবে না। ঘেসুড়েরা দরখাস্ত পাঠাল কর্তৃপক্ষের কাছে—এ বিধান চালু হলে আমরা মরে যাব। তাহলে আর আমাদের পক্ষে কলকাতায় বউ ছেলেপুলে নিয়ে বাস করা সম্ভব হবে না। আমরা

**৯২. অষ্টাদশ শতকের লক্ষ্ণৌয় সফল অভিযাত্রী বিদেশীদের একজন ছিলেন এই জন ওম্বওয়েল। ছবিটি কোনও ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা। ১৭৮৫।**

স্বামী স্ত্রী মিলে ঘাস কাটি । তাতেই আমাদের পেট চলে । আমাদের মেয়েরা সবাই বিবাহিত এবং সচ্চরিত্র । ইত্যাদি । গ্যারিসন কোয়ার্টার মাস্টার আর্জি পড়ে বললেন—ঠিক আছে, বউরা খালের এপারে আসতে পারবে না । আর, সন্ধ্যার আগেই তাদের কেল্লা ছেড়ে যেতে হবে ।

শুচিতা রক্ষার জন্য ইংরাজের ব্যাকুলতা স্পষ্ট । সমাজ শুচিবাইগ্রস্ত সেদিন ওঁরা অ্যাঙ্গলো ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কেও । অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের দুর্ভাগ্যের দিনের সূচনা অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই । কোম্পানির কর্তারা তখন চিন্তিত ওঁদের সংখ্যা দেখে । এদেশে পাক্কা সাহেবদের চেয়ে সংখ্যায় ওঁরাই বেশি । ক্যারিবিয়ানে ফরাসী এবং স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে যদি স্থানীয় মিশ্র জাতি কালোদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে, তবে এখানেই বা তা পারবে না কেন ? সুতরাং, ১৭৮৬ থেকে ১৭৯৫ সনের মধ্যে উচ্চস্তরের সরকারি চাকুরির দরজা বন্ধ হয়ে গেল তাঁদের জন্য । যদিও ইংরাজের রাজ্য বিস্তারে একদিন সহায়ক ছিলেন তাঁরা, তবু ফৌজে যোগদান তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ । কোম্পানির কর্তারা অবশ্য বাধ্য হয়ে মাঝে মধ্যে নিজেদের হুকুমনামা গিলে খেয়েছেন । যেমন মহীশূর যুদ্ধ কিংবা সাতান্নর মহাবিদ্রোহের সময় । তবু সাহেবরা মনে মন জানতেন সাম্রাজ্যের শরিক হওয়ার স্বপ্ন ওঁদের কোনদিনও সফল হওয়ার নয় । ১৮৬৩ সনে কোম্পানির নতুন চার্টার অনুমোদনের আগে কলকাতা থেকে নিজেদের তরফে সওয়াল করার জন্য লণ্ডনে হাজির হয়েছিলেন জন রিকেটস । বিলাতে তখন সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ যে ছিলেন না এমন নয় । কিন্তু কার্যত খালি হাতেই ফিরতে হয়েছিল তাঁকে । কেননা, পাক্কা সাহেবরা যুক্তি দেখালেন—অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানকে খাতির দেখালে ভারতীয়দের চোখে ইংরাজরা খাটো হয়ে যাবে । কারণ, তাঁরা বর্ণ-সংকর । উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমান—দুই শ্রেণীই ওঁদের ঘৃণা করে । অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানরা উত্তর দিয়েছিলেন—পাক্কা সাহেবরাও কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছ । নতুন চার্টারে অবশ্য জাতি বর্ণ ধর্মের ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়নি । বলা হয়েছিল সরকারি চাকুরির ব্যাপারে সবাই সমান । ১৮৫৩ সনেও কিন্তু অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের জীবনে সে-প্রতিশ্রুতির কোনও তাৎপর্য নেই । তাঁদের অভিযোগ—অভিজ্ঞতা, যোগ্যতা কোনও কিছুরই মূল্য দিচ্ছেন না নিয়োগকর্তারা । সাতান্নর বিদ্রোহে আনুগত্যের চরম পরীক্ষা দেওয়ার পরও বিশেষ হেরফের ঘটেনি তাঁদের অবস্থায় । এমন কি ১৯৩১ সনেও স্যার হেনরি গিডনিকে অভিযোগ করতে শোনা গেছে রেলের একজন অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান যেখানে মাসে বেতন পান ৩২ টাকা, একজন ইংরাজ গার্ডের বেতন তখন ১২৫ টাকা । তাঁর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু দ্বিতীয় চাকুরি । সৈন্যবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি গার্ড ।

উনিশ শতকে অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায় । একজন অ্যাঙ্গলো-ইন্ডিয়ান চিকিৎসকের কথা শুনিয়েছেন বালহ্যাচেট । তিনি অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন গিলিস । গিলিস মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন । উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিলাতে গিয়েছিলেন । সেখানেও তিনি তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দেন । কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েই তাঁকে সরকারি চাকরি দেন । সেটা ১৮৫৫ সনের ঘটনা । বিলাতের এম ডি এবং এম আর সি এস জোসিয়া ড্যাসউড গিলিস নিযুক্ত হন অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন । তিনি মাদ্রাজ নেটিভ ইনফ্যানট্রির পঞ্চম রেজিমেন্টের ডাক্তার । গিলিস স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন । সুতরাং, কখনও কখনও ক্যান্টনমেন্টের বাইরেও সাহেব কুঠিতে ডাক পড়ত তাঁর । গিলিস অনেক রোগীকেই ভাল করেন । বিপদ ঘটল মিসেস স্টোনহাউস নামে এক সামরিক অফিসারের স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়ে । মা হতে গিয়ে মিসেস স্টোনহাউস মারা গেলেন । তাই নিয়ে চারদিকে সোরগোল । ডাঃ গিলিস, নাকি ঠিকমত তাঁর চিকিৎসা করেন নি, মহিলা রোগীর প্রতি তিনি অভব্য আচরণ করেছেন, তাঁর গায়ে চাদর রাখতে দেননি, শরীরে হাত দিয়েছেন—ইত্যাদি । হাসপাতালের ইনসপেক্টর জেনারেল ডাঃ ডানকান ম্যাকফারসনের ওপর ভার পড়ল তদন্ত করার । তিনি তদন্ত করে

৯৩. তাকিয়ায় হেলান দিয়ে নাচ দেখছেন কর্নেল পোলিয়ার । টিলি কেট্‌ল-এর মূল ছবি অনুসরণে ছবিটি এঁকেছেন ভারতীয় চিত্রকর । ১৭৭২ ।

রিপোর্ট দিলেন, হ্যাঁ, অভিযোগটা অসত্য নয়। ডাঃ গিলিস সত্যই সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত জানেন না। গিলিস তাঁর প্রতিটি আচরণের কৈফিয়ৎ দিলেন। সেগুলো চিকিৎসাবিদ্যা অনুমোদিত। কিন্তু পাক্কা সাহেবরা বিজ্ঞান চর্চা করতে আগ্রহী নন, তাঁরা দেখাতে চান অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানের কাছেও গোরা বিবিদের ইজ্জত নিরাপদ নয়। তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও শোনা গেল যে, তিনি নাকি পকেটে রুমাল রাখেন না। সাহেবরা গিলিসের চরিত্র হননের জন্য এমনই ব্যস্ত যে, যাঁর যা প্রাণ চায় তাই বলে গেলেন এই অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ডাক্তারের বিরুদ্ধে। তাঁর রোগীরা অবশ্য অনেকেই ডাক্তারের সমর্থনে দাঁড়ালেন। এমন কি অনেক গোরা বিবিও। তাঁরা সাক্ষী দিলেন

ডাঃ গিলিসের মতে চিকিৎসক হয় না, তিনি ধন্বন্তরী বিশেষ। ওপরওয়ালারা তবু জল ঘোলা করতে লাগলেন। তাঁদের রিপোর্টগুলোর ওপর চোখ বোলালে মনে হয়, বিশেষ একজন চিকিৎসক-নন, তাঁদের লক্ষ্য বিশেষ একটি সমাজ। গোটা অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের মুখে চুনকালি মাখাতে চান তাঁরা। একজন বলেছেন—মনে হয় কর্মজীবনে নিজের উন্নতি দেখে গিলিসের মাথা ঠিক নেই। থলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল স্বয়ং প্রধান সেনাপতির বক্তব্যে। তিনি বললেন কোনও ইস্ট-ইণ্ডিয়ানের ওপর ইউরোপীয়ান মহিলা বা ইউরোপীয় পরিবারের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়া সঙ্গত নয়। ব্যাপারটা গভর্নর জেনারেল অবধি পৌঁছেছিল। গিলিস অবশ্য শেষ পর্যন্ত অব্যাহতি পেয়েছিলেন। এমনকি তাঁর পদোন্নতিও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে নিয়ে বিতর্ক উপলক্ষে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেল। এক—অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রতি সাধারণভাবে ইংরাজদের মনোভঙ্গি। দুই—গোরা বিবিদের ইজ্জত রক্ষার জন্য তাঁদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততা। একালের ইংরাজ ঐতিহাসিকের মন্তব্য—এই আচরণের পেছনে শুধু জাতিবিদ্বেষ নয়, রয়েছে ঈর্ষাকাতরতাও। গোরারা তাঁদের বিবিদের সব শ্রেণীর ভারতীয়দের নাগালের বাইরে রাখতে চান। এমন কি চিকিৎসকদেরও।

এই ঈর্ষাকাতরতার আর এক দৃষ্টান্ত মিস পিগট নামে একজন অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানের কাহিনী। ম্যারি পিগট একজন মিশনারী। তিনি ছিলেন কলকাতায় চার্চ অব স্কটল্যাণ্ডের অনাথ আশ্রম এবং জেনানা মিশনের পরিচালিকা। সে কাজে তিনি বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। শহরের মিশনারি ছাড়াও কিছু ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এসব গত শতকের আটের দশকের কথা। এমন সময় শহরে জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব নিয়ে বিলেত থেকে এলেন পাক্কা পাদ্রী রেভারেণ্ড উইলিয়াম হাস্তি। ওই বিদ্যাপীঠটিরও পরিচালক চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড। পাদ্রী হলেও হাস্তি অন্য ধরনের মানুষ। তিনি গর্বিত এবং উদ্ধত। অচিরেই কলকাতার রকমারি বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন তিনি। তার মধ্যে একটি বাবু কালীচরণ ব্যানার্জিকে দিয়ে। কালীচরণ ব্যানার্জি একজন ভারতীয় খ্রীস্টান। তিনি মিস পিগট পরিচালিত অনাথ আশ্রমটিতে পড়াতেন। কালীচরণ খ্রীস্টানদের একটি কাগজে ধর্মমত সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছিলেন। রেঃ হাস্তি তা-ই দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ। তিনি ব্যানার্জিকে বললেন—মিস পিগটের অনাথ আশ্রমের ব্যাপারে নাক না গলাতে। মিস পিগটের ওপর হুকুম হল ব্যানার্জিকে কোনও রকম খাতির না দেখাতে। মিস পিগট তাতে রাজী হলেন না। জেনারেল অ্যাসেম্বলির একজন প্রধান শিক্ষক তখন প্রফেসর উইলসন। সেবার কলেজের তরফ থেকে বারাকপুরের লাটবাগানে চড়ুইভাতির আয়োজন হয়েছে। উইলসন এবং হাস্তি দু'জনেই তাতে যোগ দিলেন। মিস পিগটও হাজির। হাস্তি আড়চোখে তাকিয়ে নাকি দেখতে পান প্রফেসর উইলসন আর মিস্ পিগট ঘনিষ্ঠভাবে বসে আছেন। একজন পিঠ রেখেছেন আর একজনের পিঠে। রেঃ হাস্তি আরও শুনলেন মিস পিগট নাকি সমান ঘনিষ্ঠ কালীচরণ ব্যানার্জির সঙ্গেও। অনাথ আশ্রমের জানালায় দেখা গেছে কালীচরণ মিস পিগটের কোমর ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। হাস্তি সব লিখে পাঠালেন বিলাতে চার্চের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। মিস পিগট নিজেই চলে গেলেন এডিনবরায়। চার্চের কর্তারা বললেন—তোমার পক্ষে কলকাতায় বসেই অভিযোগ খণ্ডন করা শ্রেয় নয় কি?

ফিরে এসে মিস পিগট রেঃ হাস্তিকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। ১৮৮৩ সনে সে এক চাঞ্চল্যকর মামলা। সেটা ইলবার্ট বিলের বছর। ঝড় বইছে। সুতরাং, ইংরাজ বিচারক যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা পাত্রীকে হয়রান করার। দু'ঘণ্টায় নাকি ৩৩৩টি প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে। অধিকাংশই অবান্তর, কিছু কিছু বিদ্রূপাত্মক। মিস পিগটের অভিযোগ ছিল মানহানির। যদিও রেঃ

**৯৪. কনের হাট। বরের তথা ভাগ্যের সন্ধানে কন্যাদায়গ্রস্ত ইংরেজ একসময় মেয়েদের পাঠিয়ে দিতেন ভারতে। তাই নিয়ে সমসাময়িক একটি ব্যঙ্গচিত্র।**

হাস্‌তি তাঁর অপপ্রচারের সমর্থনে কোনও প্রমাণই দাখিল করতে পারেননি তবু ইংরাজ বিচারপতি মিস পিগটকে ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করলেন মাত্র এক আনা। মিস পিগট হাইকোর্টে আপীল করলেন। অনেকেই এগিয়ে এলেন অর্থ সাহায্য নিয়ে। বিচারে রেঃ হাস্‌তি এবার অপরাধী সাব্যস্ত হলেন। মোকদ্দমার খরচ ছাড়াও তিন হাজার টাকা নগদ ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেওয়া হল তাঁকে। সে টাকা না দিয়েই পাদ্রীসাহেব দেশে চলে গেলেন। কারণ, চার্চ কর্তৃপক্ষ তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ। তাঁরা এরকম বদ মেজাজের মানুষের হাতে কোনও দায়িত্ব রাখতে চান না। রেঃ হাস্‌তি দেশে গিয়ে সওয়াল করলেন। কিন্তু চার্চের পরিচালকরা অধিকাংশই তাঁর বিরুদ্ধে। শেষপর্যন্ত কলকাতার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য তাঁরা এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। কিছুটা ভরসা পেয়ে রেঃ হাস্‌তি আবার ফিরে এলেন। ততদিনে মিস পিগটের প্রাপ্য দাঁড়িয়েছে সুদে আসলে বারো হাজার টাকা। সুতরাং পাদ্রী কয়েদ হলেন। মাসখানেক জেলে কাটিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করলেন। এই রেঃ উইলিয়াম হাস্‌তিই পরবর্তীকাল গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক।

রেঃ হাস্‌তি বনাম মিস্ পিগটের এই বিরোধেও কিন্তু জাতিবিদ্বেষের কথা গোপন নেই। রেঃ হাস্‌তি যেন কোনও ধর্মযাজক নন, সাধারণ ইংরাজের মতোই একজন গর্বিত শ্বেতাঙ্গ। মিস পিগটকে অপমান করতে তাঁর দ্বিধা নেই, কারণ তিনি মিশনারি হলেও অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান। আবার কিছুটা ঈর্ষার উপলক্ষ আছে। কারণ মিস পিগটের সঙ্গে বিশেষ একজন ভারতীয়দের বন্ধুত্ব হবে কেন? হাজার হোক, মেয়েটি তো ষোলআনা ভারতীয় নয়, তাঁর চামড়ার রঙ শাদা। মফস্বলের একজন ইংরাজ বিচারক এই মামলা উপলক্ষে

কাগজে লিখেছিলেন—জেনানা মিশন বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ, কম বয়সি ইংরাজ মেয়েদের পক্ষে হিন্দুদের বাড়িগুলো নিরাপদ নয়।

ভারতীয়দের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস নেই অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদেরও। গোরারা তখন অবিশ্বাস্যরকম গোঁড়া। অথচ অষ্টাদশ শতকে এই অ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ানরা তাঁদের কত না আপনজন। কলকাতা হাইকোর্টের নথিপত্র হাতড়ালে এখনও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে সোফিয়া ইয়ানডলির সেই উইলটি। ১৭৭৮ সনে লেখা এই উইলটিতে সোফিয়া তাঁর জমিজমা বাড়ি ঘর সব দিয়ে গিয়েছেন মেয়ে অ্যানকে। তিনি একথাও গোপন করেননি যে, এই সম্পত্তি তিনি পেয়েছেন হ্যারি ভেরেলস্ট-এর কাছ থেকে। তিনিই কন্যার পিতা। ভেরেলস্ট, সবাই জানেন, এককালে (১৭৬৭-৬৯) ছিলেন বাংলার গভর্নর।

—আমি দেখেছি বুদ্ধিমতী লর্ডগৃহিণীরা পর্যন্ত বিকানীর এবং ভারতের অন্যান্য চিফদের নিয়ে কী মাতামাতি করেন। আর, একটু নিচের দিকে তাকালে তা কথাই নেই। হামটন কোর্টে ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে ইংরাজ মেয়েদের সরাতে অফিসাররা প্রায় গলদঘর্ম। কথাগুলো লর্ড কার্জনের। সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নে তিনি শ্বেতাঙ্গের মাত্রাহীন মহিমার অক্লান্ত প্রহরী। তিনি গোরাদের তাম্রবর্ণের মহিলাদের হাত থেকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। নিম্নস্তরের গোরা সৈন্যদের কথা আলাদা। তাদের ক্ষেত্রে তিনি উপায়ান্তরহীন। 'লালবাজার' রাখতেই হবে। কিন্তু উঁচু শ্রেণীর গোরাদের তিনি পুরোপুরি শাদা রাখতে চান। গোরা-বিবিরাও যেন থাকেন শ্বেত পদ্মের মতো শাদা। নির্মল, পবিত্র। উনিশ শতকে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত সাহেবরা বার বার

৯৫. উনিশ শতকের চিৎপুরের কাঠ খোদাইয়ে রাজা-প্রজা সংবাদ। তখন আর কালা-বিবির কাল নেই। সাহেব আর ভারতীয়দের মধ্যে মেলামেশা শুরু হলেও সাদা আর কালোর মধ্যে গড়ে উঠেছে বিভেদের প্রাচীর।

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তথাকথিত উদারপন্থীদের—কই, ভারতীয়রা তো সাহেব কুঠিতে নিমন্ত্রণ পেলে বউ নিয়ে আসে না ! স্ত্রী মানে প্রহরী । তিনি যখন অনুপস্থিত, তখন বিবিদের সম্পর্কে সতর্ক থাকাই সঙ্গত । লর্ড কার্জন অতি সতর্ক ভারতীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে । সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেকের সময় ভারতীয় রাজন্যবর্গ লণ্ডনে নিমন্ত্রণ পাবেন এই সম্ভাবনার কথা ভেবে রীতিমত বিচলিত তিনি । চিন্তা করছেন কার্জন, এবং কাগজে কলমে—নাবার রাজা—'এ ভেরি ফাইন অ্যাণ্ড নোবল লুকিং ম্যান ।' জয়পুরের মহারাজাও পোশাক পরলে অসাধারণ । সুতরাং, ভাববার বিষয় বই কি ! কার্জন লিখছেন এমন কি ভারতীয় সিপাই দেখলেও লণ্ডনের মেয়েরা ক্ষেপে যায়, ভাবে বুঝিবা যোদ্ধারাও প্রিন্স । অথচ আর যাই হোক, রাজাদের তো আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না । এক নিজামের রাজত্বই ৮৩ হাজার বর্গমাইল জুড়ে । নানা মাপের প্রায় সাতশ' রাজা এবং নেটিভ চিফ । দেশের তিন ভাগের এক ভাগ জমি আর চার ভাগের এক ভাগ মানুষ তাঁদের অধীনে । অর্থ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, উচ্চবর্ণ, বংশ গৌরব—কী নেই ভারতীয় রাজাদের ? ইংরাজ সরকারও রীতিমত সম্মান দেখান তাঁদের । নয় থেকে একুশ তোপধ্বনির বরাদ্দ করা হয়েছে তাঁদের জন্য । এগারো বা তার বেশি তোপ যাঁর প্রাপ্য তাঁকে সম্বোধন করতে হয় 'হিজ হাইনেস' বলে । ওঁরা বিলাসী । চালচলনে কেউ কেউ ইউরোপীয়ানের মতো । সুতরাং, গোরা বিবিরা যদি ওঁদের দিকে ঝোঁকেন তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । বিশেষত, কোনও কোনও ভারতীয় নরপতি অতিশয় ফূর্তিবাজ । সুতরাং পুড়ুকোট্টাইয়ের রাজা যখন রানীর জুবিলি উপলক্ষে বিলাত যাত্রার সংকল্প ঘোষণা করলেন—তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল না । মাদ্রাজ সরকার এবং ভারত সরকার গোপনে এই প্রসঙ্গে যেসব চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেছিলেন তার একটিতে বলা হয়েছিল—'উই স্পেসিয়ালি ফিয়ার হিজ ম্যারিয়িং এ ইউরোপীয়ান ওম্যান ।' কাপুরথালার রাজা ইউরোপে খুব খাতির পাচ্ছেন শুনে কার্জন অতিশয় ক্ষুব্ধ । বাকিংহাম প্যালেসে ওঁকে নিয়ে মাতামাতির কী আছে কে জানে ! কার্জন লিখছেন—কাপুরথালার রাজা তো 'থার্ড ক্লাস চিফ' । আসলে কার্জনের ক্রোধ অন্য কারণে । তাঁর মনে পড়ছে আর একবার রক্সবার্গের ডাচেসের মেয়ে এই কাপুরথালার চিফকে নিয়ে বাকিংকাম প্যালেসে কি আদিখ্যেতাই না করেছিলেন ! চর্তুদিকে সতর্ক দৃষ্টি তাঁর, কোন রাজা কী করছেন ।

৯৬. গোরা-বিবিরা তখন শুধু গোরাদের ঘরেই নয়, ঠাঁই করে নিয়েছেন বাবুদের কাচের আলমারিতে । এই সব পোর্সেলিন-সুন্দরীরা একদিকে যেমন কিশোরী বধূর খেলার সঙ্গী, তেমনই হয়তো উনিশ শতকের বাঙালিবাবুর স্বপ্ন-সঙ্গিনী ।

কলকাতা, সিমলা, লণ্ডন, যেখানেই রাজাদের আনাগোনা সেখানেই কার্জনের অতন্দ্র প্রহরা।

তবুও অঘটন ঘটে। বলতে গেলে কার্জনের চোখের সামনেই একটি ইউরোপীয় মেয়েকে বিয়ে করে ফেললেন ঝিন্দের রাজা। মেয়েটি জাতে ইংরাজ না হলেও গোরা বিবি তো বটেই। তাঁর আগে লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে সরকারি নিষেধ অমান্য করে পাতিয়ালার মহারাজা বিয়ে করেছিলেন ফ্লোরি ব্রিয়ানকে। ইতিহাস পাঠক জানেন, অনেক ভারতীয় নরপতির ঘরেই সেদিন গোরা বিবি। অথবা শ্বেতাঙ্গ সহচরী। তবে সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনা বোধহয় স্বয়ং কার্জনের বিবিকে নিয়েই।

সেবারও গরমের সময় সিমলায় ভাইসরয়ের কাছাকাছি রাজা মহারাজাদের ভিড়। যথারীতি নাচগান, খানাপিনা। তারই মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজা রাজিন্দর সিং, কাপুরথালার মহারাজা জগৎজিত সিং আর ঢোলপুরের মহারাজা এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসলেন। তাঁরা ভাইসরয় গিন্নীকে আমন্ত্রণ করে এক ভোজসভার আগে তাঁকে শাড়ি পরিয়ে ভারতীয় গয়না দিয়ে সাজিয়ে, মাথায় টিয়ারা বসিয়ে ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেললেন। কার্জন সে খবর শুনে লাল। তিনি হুকুম দিলেন ভারতীয় রাজারা এরপর আর সিমলায় আসতে পারবেন না। মহারাজা রাজিন্দর সিং তার জবাব দিয়েছিলেন কালকা থেকে সিমলার পথে চাইল নামে একটা জায়গায় নিজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বানিয়ে। সাত হাজার ফুট উঁচুতে ক্রিকেটের মাঠও তৈরি হয়ে গেল সেখানে। চাইল যেন দ্বিতীয় সিমলা। শোনা যায় সেখানেও সিমলার মতোই সাহেব বিবিদের ভিড়!

সব নিয়মেই ব্যতিক্রম থাকে। কোনও মহাবীরের বর্মই বোধহয় পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র নয়।

এদেশের শ্বেত প্রভুরাও অতএব মাঝে মধ্যে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। জাতি গৌরব সব সময় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। শুধু ভারতীয় রাজারা নন, নিয়মভঙ্গ করে অসামাজিক আচরণ করেছেন কখনও কখনও ইংরাজরা নিজেরাই। মনে পড়ছে রিচার্ড আইমেস নামে নীলকুঠির এক কর্মচারীর কথা। কুঠিটি ছিল নদীয়া জেলার শিকারপুরে। সেখানেই ১৮৩০ সনে খুন হন আইমেস। খুনী কাছাকাছি আর একটি নীলকুঠির কর্মী জনৈক জর্জ ইয়ং। বীভৎস হত্যাকাণ্ড। আইমেসকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে খুন করে একটা ঘোড়ার পেটে ভরে সেলাই করে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধু এর জন্য ইয়ং একটি ঘোড়াও খুন করেছিল। অবশ্য সেটি নাকি ছিল অকেজো ঘোড়া। আশি বছর পরে এই হত্যাকাণ্ডের উৎস নিয়ে গবেষণা চলেছে কলকাতার উঁচুমানের কাগজে। শেষ পর্যন্ত গবেষকের রায়—হয়তো এর মূলে ছিল বিবি নিয়ে রেষারেষি। আইমেস সাহেবের বিবি ছিল দু'জন। দু'জনই দিশি মেয়ে। একজনের নাম ছিল—গোরা বিবি। অন্যজনের— কালা বিবি!

সুতরাং, একথা বোধহয় জোর করে বলা যায় না এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে টাঙানো ওই ছবিটি, কিংবা দেশ বিদেশে এখানে ওখানে খুঁজে পাওয়া ছবিগুলোতেই শুধু লেখা হয়ে আছে বিবিদের উপাখ্যান। পার্কসার্কাসের স্কটিশ কবরখানায় হয়তো এখনও রয়েছে শার্লট নামে তিন বছরের একটি মেয়ের সেই সমাধিটি। মেয়েটি মারা যায় ১৮৩৮ সনে। পাথরের ওপর ছেনি দিয়ে খোদাই করা শার্লটের পরিচয়: 'মোস্ট লাভলি অ্যাণ্ড বিলাভেড চাইল্ড অব চার্লস রীড অ্যাণ্ড বিবিজান।'

# পরিণয়ে প্রগতি
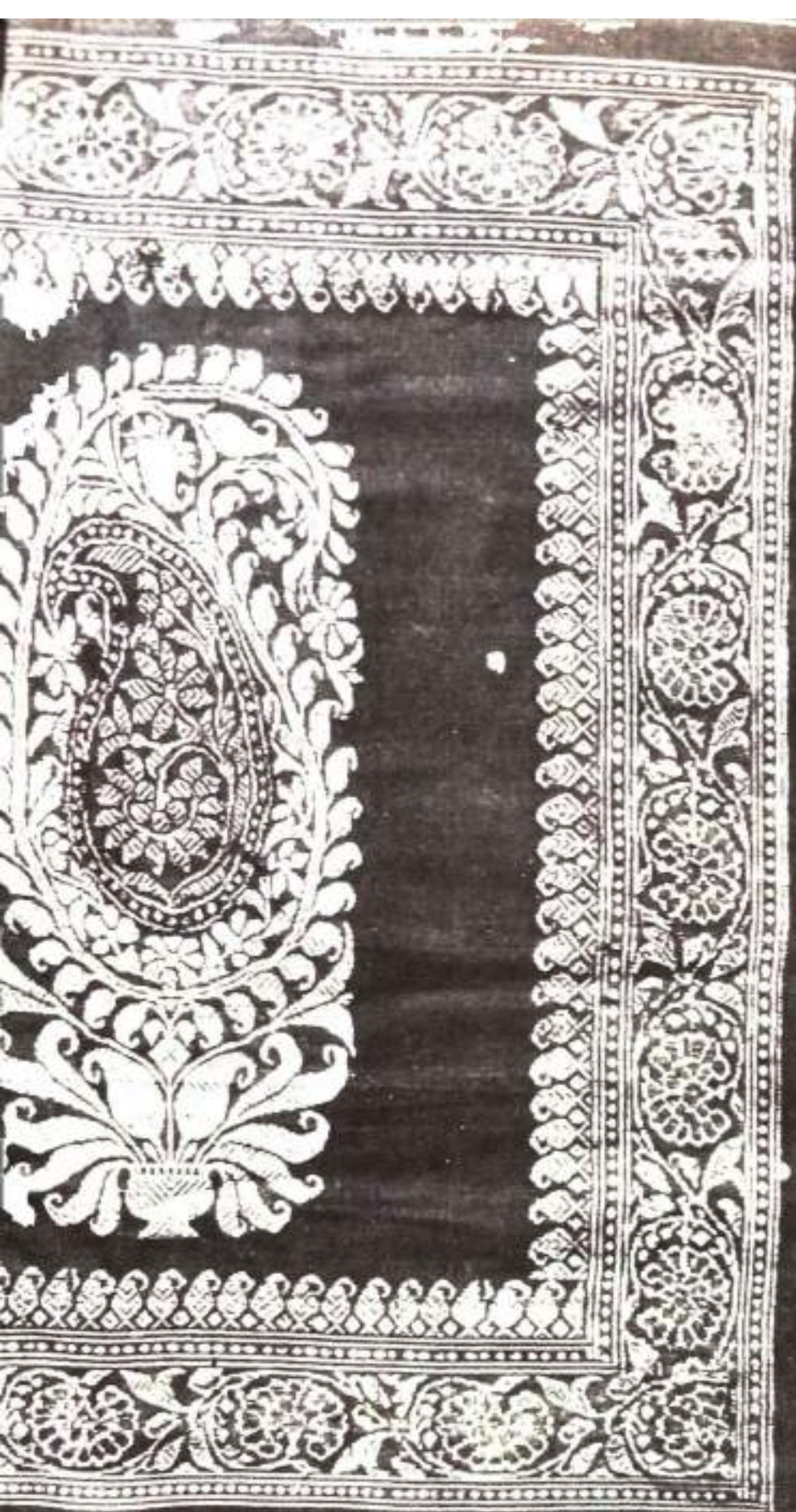
ব ইটা হাতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। গম্ভীর সমালোচকের ভঙ্গিতে বললে—ভাল বাঁধাই, ভাল ছাপা। কাগজের রঙ দেখে মনে হয় না খুব পুরানো বই, পাতায় সবে হেমন্তের ছোঁয়া লেগেছে। নামপত্র বা তার আশেপাশে কোথাও সন তারিখের কোনও নিশানা নেই। তবু ধরে নেওয়া যেতে পারে এ বইয়ের বয়স তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। হিসাবটা খুবই কাঁচা হল বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বইটি আধুনিক বই, আপাতত সেটুকু ধরে নিলেই যথেষ্ট। আর চমকে উঠেছিলাম আমি সে কারণেই।

কাপড়ে মোড়া মলাটে এমবস-করা নাম—'পরিণয়ে প্রগতি'। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো কোনও উপন্যাস। সেকালে এ-ধরনের নাম অনেক গার্হস্থ্য-উপন্যাসে দেখা যেত। একালেও যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়। বিয়ের উপহার হিসাবে বিবাহ সংক্রান্ত নামই সম্ভাবনাময়। কিন্তু চোখ আটকে গেল সূচীপত্রে। তাতে সারি সারি নাম। প্রতি সারিতে একজন পুরুষ আর একজন মহিলা। মাঝখানে একটি করে যোগ চিহ্ন। সাকুল্যে প্রায় পঞ্চাশ জোড়া পাত্রপাত্রী। সন্দেহ নেই বইটি বিবাহঘটিত। তার চেয়েও তাজ্জব ব্যাপার পাত্রপাত্রীরা অনেকেই আমাদের চেনা জানা। অনেকে স্বনামধন্য। কেউ কেউ জনচক্ষে শ্রদ্ধেয়। বোঝা গেল, বইটি এঁদের বিয়ে নিয়েই। অর্থাৎ, কে কার গলায় মালা দিয়েছেন—প্রতিপাদ্য সেটাই।

আমরা জানি, সেই সেকালে আমাদের এই সমাজ অনেক আজব বিয়ে দেখেছে। কখনও সকৌতুকে, কখনও সক্রোধে। যথা : কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলমণির সঙ্গে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের বিয়ে। কিংবা কৃষ্ণমোহনের তিন কন্যা দৈবকী, মনোমোহিনী আর মিলির সঙ্গে মিঃ সেল, মিঃ হুইলার এবং মিঃ স্টুয়ার্টয়ের বিয়ে। এ-ধরনের আরও কিছু কিছু অভাবিত বিয়ে হয়েছে তৎকালে। বাঙালি ছেলে 'ধবলাঙ্গী ধূম্রকেশী বিড়াল নয়না' ইংরাজললনাকে হৃদয় দিয়েছেন, বাঙালি কন্যা বধূবেশে গিয়েছেন হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব। কোনও কোনও বিয়ে উপলক্ষে বয়ে গেছে উত্তেজনার ঝড়ও। ১৮৭৮ সনে ব্রাহ্মসমাজে ফাটলের হেতু—কেশব সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজার বিয়ে। আবার সুনীতিদেবীর পুত্র যখন বিয়ে করেন বরোদার রাজকুমারীকে, তখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বাঙালি আর মহারাষ্ট্রের সেই মিলনকে। সেদিন, বলা নিষ্প্রয়োজন, আমাদের এই হাচি-টিকটিকি-শাসিত সমাজে সনাতনীর গলির বাইরে পা বাড়ালেই পাড়ায় পাড়ায় খবর বড় জবর। তাই বলে কি একালেও?

যতদূর জানি, একালে অন্যের বিয়ে নিয়ে কেউ আর বড় একটা মাথা ঘামান না। কৌতূহল কিঞ্চিৎ হয়তো এখনও অবশিষ্ট আছে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের বিয়ে ঘিরে। কিন্তু বুদ্ধিমান মাত্রই জানেন, সেটুকু

**৯৭. বাংলার বাহারি বালুচরি শাড়ি। শাড়ি-পরার নতুন ঢঙ চালু হয় উনিশ শতকে।**

বাঁচিয়ে রাখতেও বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, নানা কৌশলে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হয়। কাকে কোথায় কার সঙ্গে দেখা গেছে, কে মনে মনে কার কথা ভাবছেন, বিবাহ বাসরে কে অনুপস্থিত ছিলেন—ইত্যাদি হরেক রটনায় রচিত হয় সেই মায়া জাল। অজ্ঞাতসারেই পাঠক পাঠিকা জড়িয়ে পড়েন তাতে,—অতঃপর উঁকি না দিয়ে থাকতে পারা দায়। এটুকু কৌতূহল স্বাভাবিক—মানবিক। অনেকটা যেতে যেতে পথে বরের গাড়ি সামনে পড়লে সকৌতুকে উঁকি দেওয়ার মতো নির্দোষ ব্যাপার। সেটা এক কথা, আর অন্যের বিয়ে নিয়ে প্রায় সওয়া দুশ পাতা জুড়ে স্মল পাইকার পুঁথি ছাপানো অন্য কথা। বিশেষত একালে, এবং একজন মহিলার পক্ষে! বইটির লেখিকা—শ্রীমতী শৈলসুতা দেবী! ধরে নেওয়া যায়, তিনি ছদ্মবেশী কোনও পুরুষ। পরচর্চায় শুধু মেয়েদেরই রুচি, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়ত প্রতি ছত্রে যে পুরুষ-কণ্ঠস্বর শুনি সেটি পুরুষের। শুধু তাই নয়, থেকে থেকেই চোখে ভেসে ওঠে তাঁর পাকানো গোঁফ অথবা টিকি। বইটি অতএব পড়তেই হল।

নায়ক নায়িকাদের নামধাম অবান্তর। লেখিকা অথবা লেখকও অবশ্য বলেছেন কোনও কোনও ক্ষেত্রে নাম পালটে দেওয়া হল। (যথা: 'সমাজে প্রভাবতীর পুত্র কন্যাগণের মাথা হেঁট হইতে পারে মনে করিয়া আমরা স্বামী স্ত্রীর নাম একটু রূপান্তরিত করিতে বাধ্য হইতেছি।' কিংবা 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে আমরা লাহিড়ী পত্নীর আসল নামটি গোপন করিয়া কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিলাম'।) অনুমান করা যায়, সেটি করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি বা তাঁরা কোর্ট-কাছারির ভয়ে। আজকের পাঠকের কাছে রুচির প্রশ্নটাই মুখ্য। তবু যে এ-ধরনের একটি বই নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি তার পিছনে কিছু কারণ আছে। প্রথমত, আমরা এই সেদিনও কোথায় ছিলাম এ-বই তার একটি প্রমাণ। আমরা কতদূর নামতে পারতাম প্রমাণ তারও। দ্বিতীয়ত, নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে, নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করতে গিয়ে শিক্ষিত, বয়স্ক হিন্দু নারী পুরুষকে কী প্রচণ্ড লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, এ বই সেই যন্ত্রণার কাহিনীও বটে। তৃতীয়ত, জাতিধর্ম রক্ষার নামে এই বইয়ের পাতায় পাতায় কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও স্পষ্টাস্পষ্টিই আক্রমণ করা হয়েছে আধুনিক শিক্ষাকে। সুতরাং, বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে দিলে লোকসান।

যাকে বলে বড় ঘরের বড় ব্যাপার, সে-ধরনের কিছু কাহিনী বাদ দিলে এ বইয়ে যে সব বিয়ে বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে: অসবর্ণ বিয়ে, বিধবা বিয়ে, নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে, বাঙালি মেয়ের সঙ্গে অবাঙালির বিয়ে, সাহেবের সঙ্গে বাঙালি মেয়ের বিয়ে, হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে, ব্রাহ্ম-হিন্দু বিয়ে—ইত্যাদি। কয়েকটি ডিভোর্স মামলার কথাও সংক্ষেপে বলা হয়েছে। তবে সব মামলার ঐতিহাসিকতা বিচার নয়, লেখক অথবা লেখিকার লক্ষ্য কাদা ছিটানোর দিকে! বলা নিষ্প্রয়োজন, তিনি বা তাঁর কালের কিছু কিছু দর্শকের কাছে যেসব বিয়ে চাঞ্চল্যকর বলে মনে হয়েছে, যে মালাদানের খবর শুনে বলতে হয়েছে 'হে ধরণী দ্বিধা হও'—একালের চোখে তা আদৌ কোনও দ্রষ্টব্যই নয়। অথচ লক্ষণীয় ব্যাপার, এই বিয়ে নামক ব্যক্তিগত ব্যাপারটাও তখন পাড়ায় পাড়ায় তো বটেই, খবরের কাগজেও রীতিমতো বিতর্কের বিষয়। একটি বিয়ের বিবরণ দিয়ে বলা হচ্ছে: লিবার্টি, বঙ্গবাণী ও আনন্দবাজার পত্রিকা এই বিবাহের সমর্থক ছিলেন: কিন্তু অমৃতবাজার, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, নায়ক···প্রভৃতি অন্যান্য সকল পত্রিকাই বিবাহের প্রতিকূলে ছিলেন। আর একটি বিয়ে উপলক্ষে প্রতিবাদ জানাতে এক মহিলা প্রতিনিধিদল পাত্রীর মা'র কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। দৃঢ়চেতা সে মহিলা নাকি বলেছিলেন—আমরা কোনও ধর্ম মানি না। তার উত্তরে 'খাল কাটিয়া কুম্ভীর' শিরোনামে কাগজে একটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক বলেন—'এই অশুচি উক্তি ভারতের সুদীর্ঘ দিনের ইতিহাসের কোনও পৃষ্ঠায় কখনও লিখিত হইয়াছিল কি! **না! না!! না!!** (বলী হরফে)। ইহা শতাব্দীরব আত্মহত্যার পরিণাম। যেদিন প্রাচী হইতে আমরা পশ্চিমে মুখ ফিরাইলাম,

**৯৮. পণ দিতে প্রাণান্ত। আজকের মতো সেদিনও কনের বাপের মাথায় হাত। উনিশ শতকের একটি ব্যঙ্গচিত্র।**

**য়ুরোপের একান্ত ভোগপ্রবণ ঢং-এ ধাঁচে** (আবার মোটা হরফ) দীক্ষিত হইলাম সেদিন হইতেই কুন্তীর আসিবার এই খাল কাটিয়াছি !...

প্রতিবাদীরা যে সব সময় কলমের উপর নির্ভর করে বসে থাকতেন তা নয়, অনেক সময় লাঠি হাতে পাত্রপাত্রীদের সন্ধান করে ফিরতেন। একটি বিয়ে নিয়ে মেয়ের গ্রামে প্রতিবাদের ঝড়। "পিতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনিও কন্যাসহ ময়মনসিংহে চলিয়া গেলেন !...কতক যুবক ময়মনসিংহ পর্যন্ত ধাওয়া করিল। কিন্তু সেখানে গিয়া সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না।" আর একবার "অতিকষ্টে ইহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া... কন্যাকে নৌকাযোগে বরিশাল নিয়া আসিলেন।" সেখানেও বাধা। "এ বাধা উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়া থাকিয়া ভূতের বাড়ী বলিয়া পরিচিত একটি বাড়ীতে অতি সংগোপনে একজন মাত্র পুরোহিত ডাকিয়া...পাণিগ্রহণ করিলেন।"

সেটাও সহজসাধ্য ছিল না। ধর্মীয় বাধানিষেধ অতিক্রম করার জন্য কেউ নাখোদা মসজিদে ছুটতেন, কেউ ছুটতেন পাদ্রীদের কাছে। আর্য সমাজ তখন অনেকের আশ্রয়। বৌদ্ধ পন্থায়ও নাকি বিয়ে করতে হয়েছে অনন্যোপায় হিন্দু মেয়েকে। অথচ লেখক অথবা লেখিকা কিন্তু তবু শান্ত হতে রাজি নন। একজন অধ্যাপকের বিয়ে সম্পর্কে তিনি লিখছেন—"বিবাহাভিনয়কে আইনের গণ্ডীতে টানিয়া আনিয়া তিনি যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক অধ্যাপকের অনুকরণযোগ্য।" অন্যত্র আর একজন সম্পর্কে লিখেছেন—"লোকমুখে শোনা যায়, তিনি বিবাহ করিয়াছেন। কোন আইনে, তার কোনও হদিশ নাই। তবে ভারতীয় আইনসভার সদস্য, আইনের অন্যতম বিধানকর্তা তিনি, নিশ্চয়ই বেআইনি কাজ কিছু করেন নাই !" আদালত থেকে মুসলিমবেশে হিন্দু মেয়ে বেরিয়ে আসছেন দেখে তাঁর মন্তব্য : "যাইবার সময় বিবিসাহেবার লালপেড়ে শাড়িতে যেন বেশ একটু দোল খেলিল...এই দোলটুকু যেন বিবিজানের পরিত্যক্ত হিন্দুস্বামীর
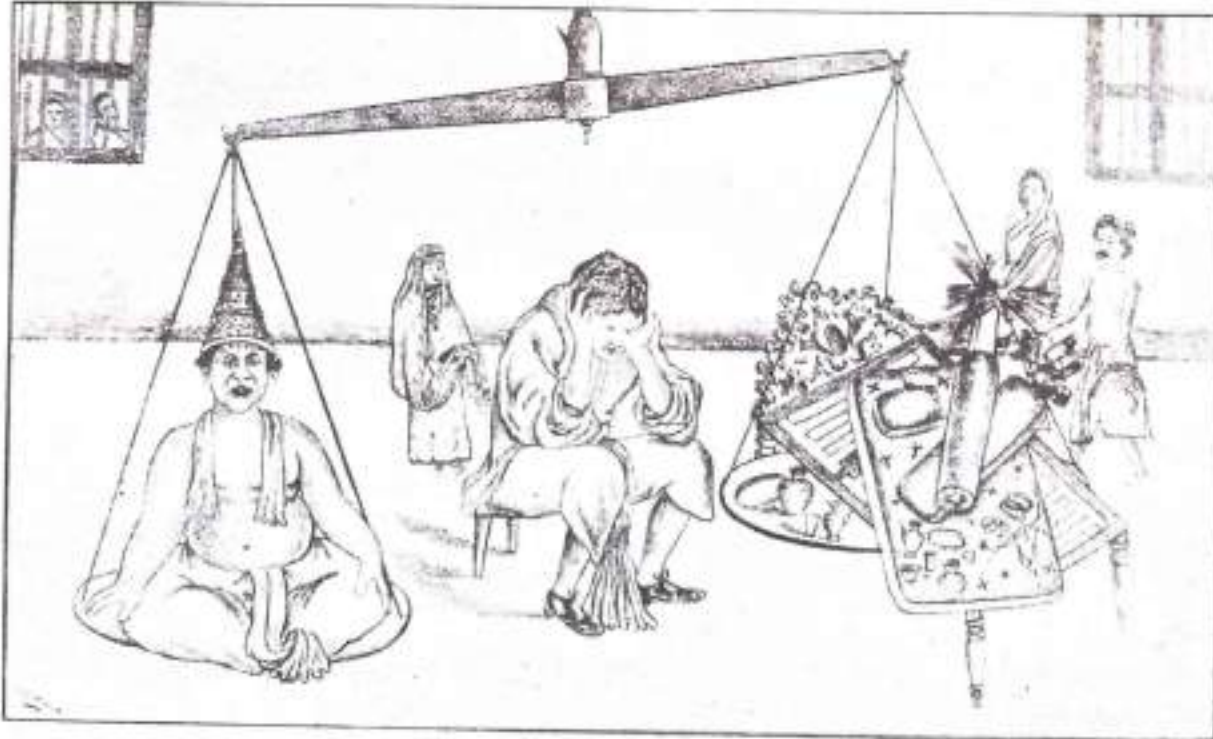
কন্যাদায়ের ব্যবস্থা, পুত্রপণ।
বর তৌজুর সোনা,রূপা,তৈজসপত্র নগদ টাকা,ঘুড়ি,কন্যাকর্তা যথা সাধ্য দিয়াও খুশাইতে না পারায় ছেঁড়া জুতা কাঁটা বাহির করিয়াছেন।

প্রতি বিদ্রূপ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গ্রাজুয়েটের মহিমা প্রকাশ করিয়া গেল।

এ-জাতীয় ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ জুটেছে অনেকের ভাগ্যেই। একজন অধ্যাপক ও একজন শিক্ষিকার অতি সাধারণ বিয়ে উপলক্ষে তাঁর কথা—"আদর্শ প্রেম ছাত্রছাত্রীরা শিখিবে ভাল!" আরও লজ্জার কথা, লেখক অথবা লেখিকা যথাসম্ভব রঙ ছড়াইয়া পূর্বরাগ, অনুরাগ এবং বিয়ের আসর সাজিয়েই নিরস্ত হননি, তিনি আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। এক ভদ্রমহিলা নাকি বলেছিলেন, 'আমি ধর্মত্যাগ না করেই খ্রীস্টানকে বিয়ে করেছি।' তাতে লেখক বলছেন—"দিল্লীর মোগল বাদশাহের অন্তঃপুরের ন্যায় এই পরিবারের দুইটি স্বতন্ত্র ধর্ম অক্ষুণ্ণভাবেই নিজ নিজ প্রভাব রক্ষা করিয়া চলিতেছে...কিন্তু তেরো বছরের ছেলে বলে—বড় হইয়া আমি হিন্দু হইব।" বিধবা বিয়ের পর সব রুচিবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে শয়নঘরে উঁকি দিয়েছেন তিনি,—"স্বামী পার্শ্বে শয়ন করিতে যাইয়া যেন অর্ধাহারক্লিষ্ট কর্মক্লান্ত পল্লীবিধবার শূন্য শয্যা দর্শনে বিদীর্ণবক্ষে দারুণ হাহাকারের মর্মন্তুদ চিত্র আর তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত না করে।" আর একজন মহিলার দ্বিতীয়বার বিয়ে উপলক্ষে তাঁর মন্তব্য: "আমরা অল্পদিন পূর্বেও তাঁহাকে দেখিয়াছি। ঈশ্বর না করুন, যদি এমন দুর্দিন আসে যে, দ্বিতীয় স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে কিংবা দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গ পরিহার করা অপরিহার্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৃতীয় আশ্রয় সংগ্রহও তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। চল্লিশ পার হইয়াও তাঁহার দেহে বহিঃসৌন্দর্য আজ পর্যন্ত রহিয়াছে।'

তবে লুব্ধ এই লেখক (এবার আর সংশয় না রাখাই ভাল) আরও নির্মম যেন শিক্ষিত আধুনিক মেয়েদের প্রসঙ্গে: 'একাকী বিলাত ভ্রমণ, বিলাতি নাইট ক্লাব ও বল নাচের পার্টিতে যোগদান, অন্য পুরুষের সঙ্গে বিমান-ভ্রমণ ও জয়রাইডিং প্রভৃতিতে অভ্যস্ত না হইলেও তিনি (অর্থাৎ, অন্য একজন সাধারণ গৃহস্থবধূ) মার্জিত রুচিসম্পন্না।...হাঁটু অবধি ওঠা স্কার্ট পরিয়া বিশজন পুরুষের সহিত ডিনার পার্টিতে পেগ গ্রহণে হার মানিলেও, এই আধুনিকা নাকি অন্যজনের পদতলে বসিবার যোগ্যা নহেন।' এমনি আরও নানা বক্রোক্তি।

বইটির নামপত্রে কোনও পাঠক অথবা পাঠিকা পাঠশেষে লিখে রেখেছেন—বোঝা গেল না লেখিকার উদ্দেশ্য কী? তিনি অতিশয় সরলপ্রাণ নিশ্চয়। এ পাঠকের সন্দেহ নেই—এই বই নারী সমাজ, বিশেষত শিক্ষিত নারী সমাজের উপর হীন আক্রমণ। লেখক লিখেছিলেন—পুণ্যিপুকুর ব্রত নিষ্ঠাকে কুসংস্কার বলিয়া লরেটো বেথুনে যখন কন্যা পাঠাইয়াছি, তখনই কি এই কুমীরকে ডাকিয়া আনি নাই? পরিণয়ে প্রগতির লেখক কিন্তু এ-ব্যাপারে আরও উচ্চকণ্ঠ। তিনি লিখেছেন: 'বাঙালী আজ গৃহহীন অন্নহীন বেকার।...অন্নহীন উদরে, বলহীন দুর্বল দেহে বিদ্যাহীন অসার মস্তিষ্ক আজ মরিয়া হইয়া শুধু প্রেমচর্চা করিতেছে। তাহার সেই পরমোৎসাহপূর্ণ প্রেমচর্চায় যদি কোনও ক্ষুদ্রতম বাধাও উপস্থিত হয় তবে সে তাহার তারুণ্যের দোহাই দিয়া যুগ প্রগতির দোহাই দিয়া কম্বু কণ্ঠে প্রচার করে—তরুণের বাণীকে আজ উপেক্ষা করা চলিবে না।' তাঁর জিজ্ঞাসা—'কিসের তারুণ্য?...জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্বের দরবারে আসন লাভের আশায় নিরাশ হইয়া বাঙালী আজ পরিণয় প্রগতিকে আপনার জাতীয় উন্নতির প্রধান অবলম্বন করিয়া লইয়াছে।...দেবতা আজ তাহার নিকট ক্রীড়াপুত্তলিকা।...বিদ্যা মন্দির সহ-শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইয়া তরুণ-তরুণীর অবাধ সংমিশ্রণে প্রশ্রয় দান করতঃ অবিদ্যামন্দিরে রূপান্তরিত হইতেছে।...' ইত্যাদি।

মান্যবর এই জ্যাঠা মশাইটিকে আমরা চিনি। সুনীতি দুর্নীতির প্রশ্ন নিয়ে নানা সময়ে তিনি এসেছেন, চলে গেছেন। তাঁর জন্যে কার না করুণা হয়। বিশেষ করে শ্রীমতী শৈলসুতা দেবীর জন্য আমার হচ্ছে, কেননা তিনি পরিশ্রম করেছেন বিস্তর, অনেক কাদা ঘেঁটেছেন, চতুর্দিকে অনেক কালি ছিটিয়েছেন, কিন্তু বিনিময়ে যা

কিছু পাওয়ার পেলাম আমরা। আরও মেয়ে-স্কুল, উদার বিবাহ-আইন এবং অনাবশ্যক পরচর্যার কিঞ্চিৎ কম অবকাশ।

বর্ণাশ্রম, মেল বন্ধন, ঘটককারিকা, পারিবারিক শাসন, সামাজিক দণ্ডভয়—সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে যে সব নারী পুরুষ সেদিন ভালবাসা নামক এক নতুন অনুভূতিকে আবিষ্কার করেছিলেন, ভালবেসে ঘর বেঁধেছিলেন, কিংবা ভালবাসাহীন দাম্পত্যজীবনের মিথ্যাকে স্বীকার করে নিয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করেছিলেন তাঁরা, বলাইবাহুল্য, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের উপলক্ষ ছিলেন না, বরং প্রশংসাই ছিল তাঁদের প্রাপ্য। কেন না, তাঁরা নতুন কালের নতুন মানুষ। তাঁরা নারী পুরুষের সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারণ করতে উদ্যোগী। সেখানে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভাল-লাগা না-লাগার অধিকার স্বীকৃত। 'পরিণয়ে প্রগতি'র পাতায় যে সব কাহিনী বর্ণিত সেগুলো সবই এই শতকের। প্রধানত এই শতকের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকের। অর্থাৎ, গান্ধী-আন্দোলনের সেই উজ্জ্বল দিনগুলোর, যখন পুরুষদের পাশাপাশি জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছেন মেয়েরাও। কারও কারও ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গীনির সঙ্গে প্রথম দেখা সেই উত্তাল প্রেক্ষাপটেই। 'পরিণয়ে প্রগতি'র লেখক জানেন না, কী যুগান্তকারী কাণ্ডই না গান্ধীজি ঘটিয়েছিলেন সেদিন এদেশের মেয়েদের জীবনে। সেদিন স্পষ্টতই তাঁর ডাকে পূর্ণিমার জোয়ার। কিন্তু বাঙালি মেয়ের পক্ষে সে-ই প্রথম বাইরে পা বাড়ানো নয়। অন্তঃপুরের চৌকাঠ ডিঙানো শুরু হয়েছিল তারও অনেক আগে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনগুলোতে। ঘরে-বাইরের দ্বন্দ্ব অবশ্য শুরু হয়ে গেছে তারও অনেক আগে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই। 'পরিণয়ে প্রগতি', অতএব কিছু মানুষের চোখে বিদ্রূপের উপলক্ষ হলেও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারী জাগরণের দীর্ঘ কাহিনী। সে-জাগরণ অবশ্যই খণ্ডিত। কেন না, উনিশ শতকের তথাকথিত নবজাগরণেরর মতোই তা সর্বব্যাপ্ত ছিল না, বাঙালি নারীসমাজের একটি ভগ্নাংশকেই তা স্পর্শ করেছিল। মুষ্টিমেয় কিছু শহুরে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের বাইরে যে বৃহৎ নারীসমাজ তা ছিল কার্যত আন্দোলনের বাইরে। তাদের ভূমিকা বড়জোর দর্শকের। সে-জাগরণের সীমাবদ্ধতাও স্বীকার্য। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাবুদের মতোই তাঁদের বিবিরাও পশ্চিমী ভাবধারার

**৯৯. পরিণয়ে প্রগতি। ছাঁদনাতলায় আগে আগে হাঁটছে আধুনিক কনে, পেছনে বর! হাওয়া বদলের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন ব্যঙ্গ-চিত্রকর।**

মহিলাদের
Respecting
2nd Class
Inter Class
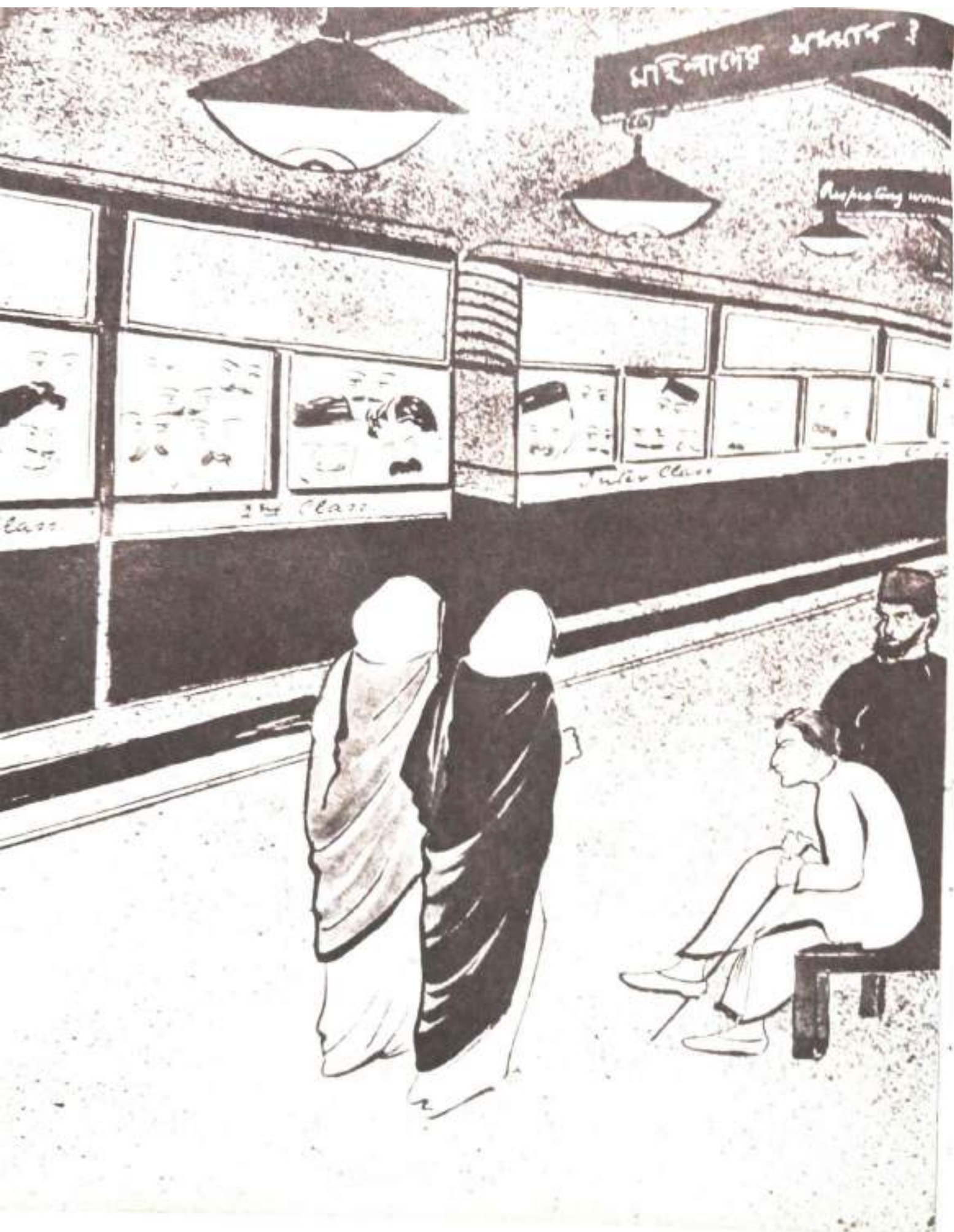
বহিরঙ্গ নিয়েই মোটামুটি খুশি ছিলেন । তাঁদের অন্তর্লোক পুরোপুরি কুসংস্কার কাটিয়ে উঠেছিল এমন বলা শক্ত । সুতরাং, আচার আচরণে মাঝে মাঝে প্রকট হয়ে উঠত বৈপরীত্য । তাছাড়া মেয়েরা সেদিন সামনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন পুরুষের হাত ধরেই । এভাবে কতদূর তাঁরা যেতে পারবেন, সেটা তাঁদের স্পষ্ট ছিল না । এই পুরুষ-নির্ভরতাকে আদৌ তাঁরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন কিনা জানা ছিল না সেটাও । স্বাধীনতার সঙ্গে আর্থিক স্বাবলম্বনেরও যে সম্পর্ক রয়েছে প্রগতিশীল মহিলাদের মধ্যে মাত্র দু'একজনই তা ধরতে পেরেছিলেন । তবু লক্ষ্য যত সীমাবদ্ধই হোক, 'পরিণয়ে প্রগতি'র পটভূমিতে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য যে দীর্ঘ লড়াইয়ের কাহিনী তা শোনার মতো ।

এ কাহিনী শেকল ছেঁড়ার । পর্দা ভাঙ্গার । উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও বাঙালি মেয়েরা, বিশেষত, উচ্চবর্ণের মেয়েরা বলতে গেলে পুরোপুরি পর্দানসীন । অন্তঃপুর ঘিরে যদি পরিবারের অতন্দ্র প্রহরা, পরিবার ঘিরে তবে সমাজের কঠোর শাসন । বাল্যবিবাহ, বর্ণাশ্রম, মেলবন্ধন—সমাজের সব আয়োজনই সেদিন পর্দার পক্ষে । ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা সঞ্চারিত করে আশৈশব মেয়েদের মনে সতীত্বের এমন এক কল্পনা গড়ে তোলা হত যা অতি-ভঙ্গুর । কিশোরী পর্যন্ত অহরহ পীড়িত লজ্জা এবং পাপবোধে । পতনের ভয়ে সে সর্বক্ষণ জড়সড় । এই পর্দা অবশ্য মানসিক । অতএব অদৃশ্য । তবু দুর্ভেদ্য-প্রায় । পুরুষ তবু যেন নিশ্চিন্ত নন । তাঁর উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা মেয়েদের শারীরিকভাবে বন্দী করে তবেই শেষ পর্যন্ত শান্তি খুঁজে পায় । এই মানসিকতা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন মেরেডিথ বর্থউইক তাঁর 'দি চেইনজইং রোল অব উইমেন ইন বেঙ্গল (১৮৪৯-১৯০৫)' বইটিতে । যুক্তির অভাব ছিল না । অথবা অপযুক্তির । বক্তব্য : নারীর যৌবন পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে । শেকল ছেঁড়া নারীর কামনা-বাসনা উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে । ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কামার্ত পুরুষ । নারী অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলে তাদের হাতে লাঞ্ছিত হতে পারে । এভাবেই নানা অপযুক্তি বুনে তৈরি হয়েছিল সেদিন মেয়েদের ঘিরে ভারি পর্দা ।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে বিবিধ সংস্কার-আন্দোলনে যেমন, তেমনই পর্দা-বিরোধী আন্দোলনেও অগ্রগণ্য ভূমিকা ব্রাহ্ম সংস্কারকদের । তবে অস্বীকার করার উপায় নেই পরোক্ষে বিদেশী ঔপনিবেশিক সরকারের কেতা-কানুনও ছিল তাঁদের সহায়ক । সরকারের পক্ষে পর্দা মেনে চলা সম্ভব ছিল না । যেহেতু আইনের চোখে সবাই সমান, সুতরাং অপরাধী নারী হলেও সরকার তাকে গ্রেপ্তার বা তার বিচারের দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না । বাধ্য হয়ে নারী অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হয় । ব্যাংক-পরিচালকরাও আমানতকারী মহিলাদের কখনও কখনও তাঁদের কর্মচারীদের সামনে সই দিতে বাধ্য করেন । তাতেও পর্দা রক্ষা দায় । তাছাড়া রয়েছে—রেলগাড়ি । তৎকালে প্রচলিত প্রবাদ—জাত মারল তিন সেনে,/ কেশব সেনে, ইস্টিশনে, উইলসনে । পর্দা ভাঙ্গার কাজেও বুঝি বা সমান তৎপর সেদিন রেল । প্রথম দিকে রেল পরিচালকরা মেয়েদের জন্য কোনও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখতে সক্ষম হননি । ১৮৭০ সনের আগে দরজায় ভদ্রমহিলার ছবি সাঁটা কোনও আলাদা কামরা ছিল না । মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্রামশালাও অনেক পরের সংযোজন । ফলে পর্দানসীন ভদ্রমহিলাদের রেল ভ্রমণ উপলক্ষে তৎকালে খবরের কাগজের পাতায় মুহুর্মুহু নানা সংকট, রকমারি বিভ্রাট । আর তাই নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক ।

তারই মধ্যে গুটি গুটি ভদ্রমহিলারা একজন দু'জন করে এগিয়ে চলেছেন রেল স্টেশনের দিকে । বুঝতে অসুবিধে নেই, পর্দা ছিঁড়তে শুরু করেছে । শুধু রেলগাড়িতে নয়, ভদ্রঘরের বাঙালি মেয়েদের তখন অন্যত্রও দেখা যাচ্ছে । মেয়েদের স্কুলে যাতায়াত শুরু হয়েছে বেশ কিছুকাল । যে-মেয়েরা স্কুলে পড়ে তাদের পক্ষে কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়, পালকি বা ঘোড়ারগাড়িতে যতই না ঘেরাটোপের ব্যবস্থা করা হয় । ক্রমে নতুন চিন্তা । স্কুলের পড়ুয়াদের সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার জন্য তাদের মাঝে মধ্যে বাইরে বের হওয়া

**১০০. মেয়েদের আর এক মুক্তিদাতা সেদিন রেলগাড়ি । প্ল্যাটফর্মে কুণ্ঠিত দুই মহিলাযাত্রী । তাঁদের বিদ্ধ করছে পুরুষের কৌতূহলী লুব্ধ দৃষ্টি । গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র ।**

১০১ ভদ্রঘরের মেয়েরা তখন সবে পা বাড়াতে শুরু করেছেন ঘরের বাইরে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর সিঁড়িতে বসে দুঃসাহসী তিনজন। আলোকচিত্রটি এই শতকের প্রথম দিকে তোলা।

প্রয়োজন নয় কি ? এ-ব্যাপারেও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৭১ সনে নেটিভ লেডি নর্মাল স্কুল এবং অন্যান্য স্কুলের মেয়েদের এশিয়াটিক সোসাইটির জাদুঘর দেখানোর ব্যবস্থা হয়। ক'বছর পরে, ১৮৭৬ সনে জনা বারো ভদ্রমহিলার একটি দল গিয়েছিলেন আর্ট গ্যালারি দেখতে। তখন অবশ্য পুরুষদের জন্য গ্যালারি বন্ধ রাখা হয়েছিল। শহরে ভদ্রমহিলাদের এই আগ্রহকে উৎসাহিত করতেই হয়তো ১৮৭৯ সনে চারুশিল্পের প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সপ্তাহের একটি দিন নির্দিষ্ট রেখেছিলেন মহিলাদের জন্য। চার আনা করে টিকিট। তবু দর্শকের অভাব হয়নি। কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ১৮৮৪ সনে। সেখানেও পর্দানসীন মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মেয়েরা যখন দেখলেন পুরুষের সঙ্গে প্রদর্শনীতে ঢুকতে কোনও নিষেধ নেই, তখন অনেকেই নাকি সেই অধিকারই কাজে লাগিয়েছিলেন। এই স্বাধীনতা মাঝে মাঝে সমস্যাও সৃষ্টি করত। যেমন সেবার শিবপুরের বাগানে যা হল। সেটা ১৮৯২ সনের কথা। একদল ব্রাহ্ম বাগানে গিয়েছিলেন 'প্রার্থনা' করতে। দলে ছিলেন একশ' পঁচিশ জন পুরুষ, ত্রিশজন মহিলা এবং পঁচিশটি ছোট ছেলেমেয়ে। বাগানের প্রবেশ পথে দরোয়ানরা নাকি মত্ত অবস্থায় দলের ক'জন পুরুষকে লাঞ্ছিত করে। তা-ই নিয়ে চারদিকে আবার কোলাহল। তবু মেয়েদের বাইরে বের হওয়া কিন্তু বন্ধ হল না। বলা হয়, উনিশ শতকে বাংলার থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন চিকের আড়ালে বসা মহিলা দর্শকেরাই। তাঁদের সঙ্গে এই সব মেয়েদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল বই কি ! ওঁরা নিছক দর্শক নন, এক অর্থে ওঁরা অভিযাত্রী। সে কারণেই আরও দর্শনীয়।

যাঁরা নিষেধের পর নিষেধ দিয়ে মেয়েদের চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন দুর্ভেদ্য পর্দা, লক্ষ্যণীয় তাঁরাই ক্রমে উদ্যোগী হন বন্দীমুক্তির আন্দোলনে। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই বিস্ময়কর নয়। ঔপনিবেশিক বাংলায় একদিকে যেমন মধ্যবিত্তের প্রসার ঘটেছে, অন্য দিকে তেমনই ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে প্রসারিত হয়েছে তাঁদের মনও। সে মনে নতুন ধ্যান ধারণা, নতুন মূল্যবোধ। আপন অন্তঃপুরের দিকে তাকিয়ে ভদ্রজন অতঃপর সঙ্গত কারণেই লজ্জিত। কখনও কখনও শিহরিত। নারীর এই বন্দীদশা মনুষ্যত্বের এই অপমান অতঃপর যদি তার বিবেক দংশনের কারণ হয় তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অন্তরের এই চাপের সঙ্গে ছিল বাইরের চাপও। বাঙালি ভদ্রলোককে সেদিন আর ঘরে বসে থাকলে চলে না। জীবন জীবিকার সন্ধানে তাঁরা তখন ছড়িয়ে পড়ছেন চারদিকে। কেউ কেউ যেমন গ্রাম থেকে পাড়ি জমাচ্ছেন শহরে, অনেকেই তেমনই আপন শহর থেকে দূরে, বাইরে। প্রবাসীরা কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে যেতেন স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের। নানা কারণে যাঁরা পারিবারিক ভদ্রাসন ছেড়ে বের হতে পারতেন না তাঁরাও সময় সুযোগ পেলে হানা দিতেন স্বামীর কর্মস্থলে। তাছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই মধ্য এবং উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে চালু হয় ঘরের বাইরে ছুটি কাটানোর নতুন রীতি। আত্মীয়তা রক্ষা নয়, তীর্থ দর্শন নয়, শুধু অন্য পরিবেশে অবকাশ যাপন। কিছু দিনের জন্য হাওয়া বদল। সেই বাবুয়ানার সূত্রেও অনেক বাঙালি মহিলা বাইরের দুনিয়ার মুখোমুখি। রেল কামরাই এক আশ্চর্য ভুবন। তারপর পাহাড়, বন, সমুদ্র। নতুন দিগন্ত।

কেউ কেউ পাড়ি জমালেন সাত সমুদ্রের ওপারে। গোবিন্দ দত্তের কন্যারা। ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তীর স্ত্রী। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্ত্রী। এঁরা যদি প্রথম যুগের অভিযাত্রী, তবে পরবর্তী দিনগুলোতেও বিদেশ যাত্রী অনেক। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রাজকুমারী (১৮৭১), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী (১৮৭৭), 'ইংলণ্ডে বঙ্গ মহিলার' লেখিকা কৃষ্ণভামিনী দাস (১৮৮২) এবং ১৮৯৩ সনে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। তাতে অবশ্য সমস্যাও দেখা দিয়েছে কখনও কখনও। বিশেষ করে প্রাচীন পরিবেশে যৌথ পরিবারে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা। একজন পর্যবেক্ষক লিখেছেন—বিদেশে গিয়ে ভারতীয় মেয়ে বিদেশী সংস্কার সংস্কৃতিতে 'অনূদিত' হয়ে যখন দেশে ফিরতেন তখন সনাতন সমাজ তখন আবার তাঁকে 'অনুবাদ' করে নিত ! তবু

সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়তো, বাঙালি ঘরের বউ ঝিদের কালাপাণি পাড়ি দেওয়ার ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্য বই কি! হিল্লি দিল্লি, লাহোর সিমলা, বোম্বাই আমেদাবাদ, গিরিডি সিমুলতলার মতো লণ্ডন প্যারিস থেকেও বাঙালি মেয়েরা কুড়িয়ে আনছেন তখন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা।

ইতিমধ্যে শিক্ষিত ভদ্রমহলে চালু হয়েছে অন্য এক ধরনের সামাজিকতা। পেশাগত কারণে, কাজের সূত্রে পুরুষের নূতন সমাজ গড়ে উঠছে। সে সমাজ বর্ণাশ্রম মেনে গড়ে ওঠেনি। তাতে হয়তো ওপরওয়ালা বিদেশীরা আছেন, হয়তো আছেন অন্য ধর্মের কিংবা অন্য রাজ্যের ভারতীয়রাও। সেখানে, এই নব্য সামাজিকতার দাবি মেনে স্বামীর হাত ধরে স্ত্রীকেও মাঝে মধ্যে যোগ দিতে হয়। মাঝে মাঝে নিজেদের বৈঠকখানায়ও আয়োজন করতে হয় অতিথি আপ্যায়নের। লাট সাহেবের বাড়িতে বড়লাট গিন্নির পার্টিতে যোগ দিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী একদিন সমাজকে চমকে দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ সনে মেরি কার্পেন্টারের বাড়িতে ষোল ব্রাহ্ম দম্পতির চায়ের আসরে যোগদানও ছিল নাকি চমকপ্রদ ঘটনা। অনুমান করতে অসুবিধে নেই, কলকাতা কিংবা দেশের অন্যত্র নানা শহরে তখন ইতস্তত চলেছে নতুন সামাজিকতার সূত্রে এ ধরনের চায়ের আড্ডা। মিশ্র বৈঠক। চলছে এমন কি মফঃস্বল শহরগুলোতেও। সেটাই স্বাভাবিক। ১৮৬০-এর দিনগুলোতে সমাজ মন্দিরে ব্রাহ্ম মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা ছিল। ১৭৮০-এ দেখি ভারত-আশ্রমে অনেক দম্পতির মিলিত এক বৃহৎ পরিবার। প্রার্থনা সভায় মেয়েরা অবশ্য তখনও চিকের আড়ালে। কিন্তু এ আড়ালটুকুও উঠে যায় অচিরেই। সাধারণ সভাকক্ষেই মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দিষ্ট করে দেন কেশবচন্দ্র সেন। প্রচলিত ছড়ায় রেলের সঙ্গে তাঁর নাম, বলাই বাহুল্য, অকারণে যুক্ত হয়নি।

যাঁরা সমাজে যাচ্ছেন, কিংবা স্বামীর কর্মসূত্রে তাঁর ওপরওয়ালা বা সহকর্মীর বাড়িতে, অথবা সংসার করতে দূরে কোথায়ও স্বামীর কর্মস্থলে, কিংবা নিছক 'বায়ু পরিবর্তনের' জন্য পাহাড় কিংবা সমুদ্রতীরে সেই মহিলারা অবশ্যই সংখ্যায় অসংখ্য। হয়তো আজকের তুলনায় তাঁদের জীবন ও জগৎও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। বৈচিত্র্যও কিছুটা কম। তবু তার মোকাবিলার জন্য সে কী সযত্ন প্রস্তুতি!

ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যবাবু আপন স্ত্রীকে মনের মতো করে গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষা। বিদ্যাকে তাঁরা ভূষণ বলে মেনে ছিলেন। বাইরে বের হতে গিয়ে মেয়েরা বুঝতে পারলেন পুরানো বসনভূষণেও আর চলে না। সেকালের বাঙালি মেয়ের বসন বলতে ছিল শাড়িমাত্র। শীতে তদুপরি বড়জোর একখানা চাদর। যে গৃহিণী যত সম্পন্ন তাঁর শাড়ি আবার তত মিহি। দশ হাত কাপড়েও সে-কারণে লজ্জা নিবারণ করা সম্ভব হয় না। ভদ্রজনের পরিবর্তিত রুচি এবং শালীনতাবোধ স্বভাবতই আহত। কেউ কেউ রসিকতা করে এসব শাড়িকে বলতেন—উলঙ্গবাহার শাড়ি। তা নিয়ে অন্তঃপুরে যদিবা জীবন চলে, বাইরে বের হওয়া দায়। সুতরাং মেয়েরা চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতে শুরু হয় পোশাক নিয়ে বিতর্ক। আমাদের এই আলোচনার পক্ষে হয়তো কিছুটা প্রক্ষিপ্ত, তবু বাঙালি মেয়ের রূপান্তরের সেই কাহিনীও প্রসঙ্গত শোনার মতো।

মিহি কাপড়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ১২৭৫ সালেও দেখি বামাবোধিনী পত্রিকার পৃষ্ঠায় আলোচনা অব্যাহত। সেখানে 'সূক্ষ্মবস্ত্র' নামে এক দীর্ঘ পদ্যে মেয়েদের কাছে প্রশ্ন তোলা হয়েছে:

'দেখ দেখি বামাগণ, এত সূক্ষ্ম যে বসন,
করে কি সে অঙ্গ আবরণ ?
বসনে উলঙ্গ হায় ! সভ্যতা কি থাকে তার ?
নহে সে কি লজ্জার কারণ ?

কবির স্পষ্ট কথা—পোশাক বদলানো চাই ।

'পরিচ্ছদ বিনিময়, যাবৎ নাহিক হয়,
যাহে এবে লজ্জার উদয় ;
তাবৎ অবলাগণ, বাহিরেতে পদার্পণ,
করিবার উপযুক্ত নয় ।'

এই পোশাকে, বলা নিষ্প্রয়োজন বাঙালি মেয়েরা তৎকালে বাইরেও বের হতেন । পুকুর কিংবা নদীর ঘাটে । কখনও জল আনতে । কখনও স্নান করতে । এই স্নানের ঘাটকে ঘিরে একদিন বাঙালির সমাজে এবং জীবনে কত না ঘটনা দুর্ঘটনা । 'ময়মনসিংহ গীতিকা' থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গল্প—সাহিত্যেও থেকে থেকে স্নানের ঘাট । জীবন যখন নিস্তরঙ্গ, সমাজ সংসার যখন বদ্ধ জলার মতো, হঠাৎ হঠাৎ জলের ঘাটে তখন ঢেউ উঠবে, সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয় । স্নানের ঘাট অবদমিত বাঙালি নারী পুরুষের জীবনে তা-ই দীর্ঘকাল ধরেই ছিল কেন্দ্রবিন্দুর মতো । নতুন যুগে অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন ওঠে 'স্ত্রীলোকদের স্নান প্রণালী' সম্পর্কেও । (বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭৬ সাল) । একজন লিখছেন—'পল্লীগ্রামবাসী কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল স্ত্রীলোকেই প্রকাশ্য জলাশয়ে পুরুষদের সহিত একত্রে অবগাহন পূর্বক অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্নান করেন । এটি কম জঘন্য ব্যাপার নহে । স্ত্রীলোকেরা লজ্জার মাথাটি খাইয়া পুরুষদিগের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অতি জঘন্য প্রণালীক্রমে গাত্র মার্জন ও বস্ত্র ধৌত করেন, এটি দেখিয়া কোন ভদ্রলোক ইহার প্রতিধ্বনি না করিয়া থাকিতে পারেন । আবার তাহারা যেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন তা পরিধান করিয়া তো লোকসমাজে বাহির হইবারই যোগ্য নহে, যখন আবার সেই বস্ত্র জলে আর্দ্র হইয়া সকল গাত্রে আবৃত্ত থাকে তখন বিবস্ত্রা ও বস্ত্র পরিধানে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকে না ।'

আধুনিক বাঙালি চিত্রকরদের অন্যতম হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩০১-১৩৫০) এই সিক্তবসনা বাঙালি রমণীকে অমর করে রেখেছেন তাঁর বিখ্যাত সব চিত্রাবলীতে । স্পষ্টতই তিনি তার মধ্যেও নারীর আর এক রূপের সন্ধান পেয়েছিলেন । আমাদের আধুনিক চিত্রকলায় 'ন্যুড' বা নিরাবরণ রূপ-চর্চার রীতি ছিল না, সম্ভবত সে কারণেই রূপসন্ধানী বিশেষ করে ঝুঁকেছিলেন ভেজাকাপড় জড়ানো নারীর অঙ্গ সৌষ্ঠব চিত্রায়নের দিকে । 'পটের বিবি' অধ্যায়ে মুদ্রিত তাঁর আঁকা ছবিটির আদর্শ যদি ইউরোপীয় ভাস্কর্য বা তৈলচিত্র, তবে সিক্তবসনাদের পেছনে মূল প্রেরণাও তা-ই । তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমকালের বাঙালির প্রায় নিত্য দেখা অভিজ্ঞতা । সে অভিজ্ঞতা শিল্পীর পক্ষে মূল্যবান, কিন্তু পরিবর্তিত পটভূমিতে সে বেমানান, 'বামাবোধিনী'র আলোচনাতেই তা স্পষ্ট ।

১৮৬৫ সনে তরুণ ব্রাহ্মদের সংঘ 'সঙ্গীত সভা' মেয়েদের পোশাক নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করেন । সদস্যরা এ-ব্যাপারে সবাই একমত, বাঙালি মেয়ের চলতি পোশাক বাড়ির ভেতরে যদিবা চলতে পারে, বাইরে একেবারেই অচল । ১৮৭১ সনে ব্রাহ্ম মহিলাদের সংগঠন 'বামা হিতৈষিণী সভা' মেয়েদের পোশাক নিয়ে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন । সেখানে 'সংস্কৃত পোশাক' কী হতে পারে তাই নিয়ে মহিলারা নিজেদের মতামত পেশ করেন । সৌদামিনী খাস্তগিরী বলেন—'ইংরাজ প্রভৃতি কয়েক জাতীয়

স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত ভাল বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণ মন্দ। সুতরাং তাহাদিগকে পরিচ্ছদে অনুকরণ করিতে গেলে কয়েকটি দোষ পরিত্যাগ করিতে গিয়া অপর কয়েকটি দোষ গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় আবশ্যক।' তাছাড়া 'স্বকপোলকল্পিত ও জাতিসঙ্গত কোন একটি সভ্যোচিত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিলে যত সুখানুভব হয়, অপরজাতীয়ের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিলে তত হয় না।' সভার বিবরণ থেকে মনে হয় আর একজন সদস্য রাজলক্ষ্মী সেনও তাঁর সঙ্গে এ-ব্যাপারে একমত। তিনিও মনে করেন 'ইংরাজ কি উত্তর পশ্চিমবাসী, কি মুসলমান, কি চীনদেশীয়, ইহাদিগের পরিচ্ছদ সুন্দর ও উত্তম হইলেও বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ পরিচ্ছদ-পরিধান করা উচিত নহে। যাহাতে দেশীয় ভাব বজায় থাকে, সকলে জিজ্ঞাসা না করিয়া বস্ত্র দেখিয়াই বঙ্গীয় কুলকামিনী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সম্যকরূপে শরীর আবৃত হয় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্তব্য।' রাজলক্ষ্মী সেন জানাচ্ছেন—'এক্ষণে কেহ কেহ কামিজ, জ্যাকেট, সাটী ও জুতা পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা উত্তম। তবে তাঁর মতে ওপরে 'একখানি আপাদমস্তক লম্বিত চাদর ব্যবহার করা উচিত।' কারণ, 'অনেক মন্দ স্ত্রীলোকেরাও ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে।' লক্ষণীয়, নগরের বারবিলাসিনীদের পোশাকে পর্যন্ত তখন আধুনিকতার হাওয়া। সন্দেহ কী, বাবুদের রুচি পালটাচ্ছে!

১০২. কোচবিহারের রানী সুনীতিদেবী এই পোশাকেই পাড়ি দিয়েছিলেন বিলাতে।

১০৩. সিক্ত-বসনা। শিল্পী : হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর ছবিতে বার বার ঘুরে এসেছে বাঙালি নারীর এই রূপ।
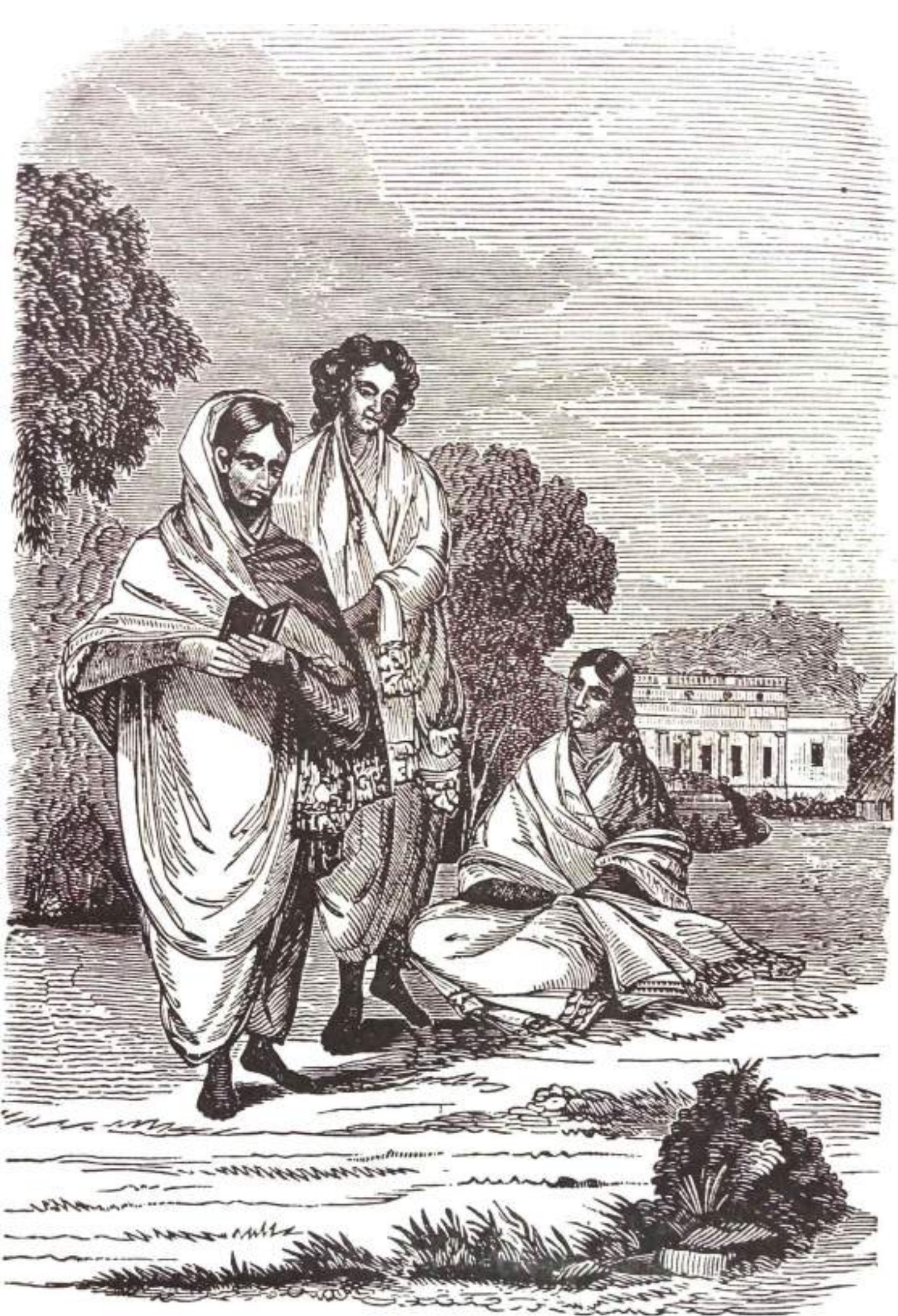
যাহোক, বামাবোধিনী সভার সদস্যদের মতামত শোনার পর সম্পাদক সম্ভাব্য নতুন পোশাক হিসাবে প্রস্তাব দেন—'বাটীতে ইজার, পিরাণ ও সাটী ; অথবা লম্বা পিরাণ ও সাটী । বাহিরে গমন করিতে হইলে—ইজার, পিরাণ, সাটী, চাদর, পাজামা ও জুতা । জুতা যাঁহারা পছন্দ না করেন, না পরিতে পারেন ।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দেন যে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয় । 'আমরা এ বিষয়ে চিরকালের জন্য অথবা বিশেষ করিয়া কোনও নিয়ম নির্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না ।...যাঁহারা এ বিষয়ে উৎকৃষ্টতর রীতি প্রদর্শন করিবেন তাহাদিগের প্রস্তাব আমরা সাদরে গ্রহণ করিব ।' (বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭৮ সাল)

এই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে 'এক বঙ্গীয় ভগিনী বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে' 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় একটি চিঠি পাঠান । 'ইহার সুন্দর হস্তাক্ষর বিশুদ্ধ লিখনপ্রণালী, ভাবগ্রহিতা এবং সহৃদয়তা—সকল নিতান্ত প্রশংসনীয় ।' তিনি লিখেছেন—'আমরা বাটীতে জুতা, মোজা, আঙ্গিয়া কাঁচলি, জামা এবং ইজার কিংবা ঘাঘরা পরিয়া তাহার উপর শাড়ি পরিধান করি আর বাহিরে যাইতে হইলে উপরি উক্ত প্রকার চাদর মাথায় দিই । 'সিংহগড় পাহাড়' থেকে পাঠানো এই চিঠিতে লেখিকার পুরো নাম ছিল না । শুধু ছিল—'শ্রী......দেবী ।' অনুমান করতে অসুবিধা নেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ গৃহিনী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী । কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর 'পুরাতনী'তে তাঁর স্মৃতিকথায় রয়েছে পোশাক প্রসঙ্গ । বোম্বাই যাত্রার আগে 'কোনো ফরাসী দোকানে ফরমাস দিয়ে' সত্যেন্দ্রনাথ তার জন্য কী ধরনের 'ওরিয়েন্টাল' পোশাক তৈরি করিয়েছিলেন ('সেটা পরা এত হাঙ্গাম ছিল যে উঁর পরিয়ে দিতে হত, আমি পারতুম না'), কেমন করে তিনি বোম্বাইয়ে মানেকজী করসেদজী পরিবারের মেয়েদের কাছে নতুন ঢঙে শাড়ি পরা শিখেছিলেন সেসব কথা বিস্তারিত বলেছেন তিনি সেখানে । ('ওরা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে শাড়ি পরে । পরে আমি সেটা বদলে আমাদের মত বাঁ কাঁধে পরতুম, সায়া পরতুম ।') 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় তাঁর পোশাকের বিবরণ দিয়ে তিনি লিখছেন—'কোন ভগিনী যদি এইরূপ পরিচ্ছদ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে এক প্রস্থ প্রস্তুত করিয়া কিংবা এই পরিচ্ছদ পরিধান-করা চিত্র তাঁহার নিকট আহ্লাদের সঙ্গে পাঠাইতে পারি ।' জ্ঞানদানন্দিনী জুতা মোজা পরা ইচ্ছাধীন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না । 'কারণ মোজা না পরিলে তত হানি নাই কিন্তু পরিষ্কারের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলে বোধহয় জুতা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক ।' (বামাবোধিনী পত্রিকা, ১২৭৮ সাল) ।

এভাবেই ক্রমে ভদ্রসমাজে চালু হয় প্রচলিত ভাষায় যাকে বলে—ব্রাহ্মিকা শাড়ি । কেশব সেন কন্যা সুচারু দেবী সেই ঢঙে কিছু পরিবর্তন ঘটান । আজও নাকি তা-ই চলেছে । (উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের পোশাক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : সংকোচের বিহ্বলতা, গোলাম মুরশিদ এবং ঔপনিবেশিকতা—শ্রীপান্থ, আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৩ ।)

ব্রাহ্মদের দেখাদেখি হিন্দু মহিলারা ব্যাপকভাবে পোশাক পাল্টাতে শুরু করেন শতাব্দীর শেষ দিকে । হিন্দু ভদ্র পরিবারে পরিবর্তন আসতে যে কিছুটা সময় লাগে তার আভাস মিলে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত একটি চিঠিতে । ১৩০৮ সালে একজন হিন্দু মহিলা লিখছেন—"আজকাল মধুপুর বৈদ্যনাথ অঞ্চলে বেড়াইতে যাওয়া বাঙালী বাবুদের একটা ঢং হইয়াছে । শরীরের জন্যই হউক, বা বাবুয়ানার জন্যই হউক, পূজার সময় অবস্থা কুলাক আর নাই কুলাক, অনেকে আর দেশে থাকেন না বা বাড়ি যান না । যাঁহারা হাওয়া খাইতে যান, তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে একলা না যাইয়া পরিবার সঙ্গে করিয়া গিয়া থাকেন । আমিও এই রঙ্গের একজন রঙ্গী ।...সকালে বিকালে, বিশেষতঃ বিকালে যে দিকে চাও দেখিবে স্ত্রীলোকেরা দলে দলে বিচরণার্থে বাহির হইয়াছে । ইহারা সব খাঁটি হিন্দু, ইহাদের মধ্যে মেমসাহেব বা ব্রাহ্মিকার আমেজমাত্র নাই । ইহাদিগকে বেড়াইতে দেখিয়া দুঃখ হয়, সুখও হয় । দুঃখ হয় হিন্দুর পর্দা ফাঁক দেখিয়া । হিন্দু মহিলা

**১০৪. স্কুল-ঘরের বাইরে । খোলামেলা পরিবেশে আলো হাওয়ায় বেরিয়ে পড়ত মাঝে মাঝে ছাত্রীরা । বর্ধমান অরফ্যান গার্লস স্কুল : ১৮৫০ ।**

আর নিছক অন্তঃপুরচারিণী নন, তাঁর ঘোমটার আর সে জাঁক নাই। সুখ হয়—বস্তুতঃ কি তবে হিন্দুসমাজেরও ক্রমে পরিবর্তন হইতেছে এই ভাবিয়া ; 'না দেখিতে দাও অবনী আকাশ'—এভাব কি সত্য সত্যই তিরোহিত হইতে চলিল, ইংরাজী শিক্ষার ফল কি সত্য সত্যই ফলিতে চলিল এই ভাবিয়া।" তবে তিনি মনে করেন—"যখন বাহির হইতেই হইল তখন পোশাকের প্রতি কিছু দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। পোশাকের প্রতি যে একেবারে দৃষ্টি নাই, তাহা বলি না। যাঁহারা বেড়াইতে যান, তাঁহাদের পোশাকের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়। তাঁহারা পরিষ্কার শাটী, সেমিজ ও জ্যাকেট বা বডিস পরিধান করেন এবং অল্প শীত বোধ হইলে আলোয়ান বা র‍্যাপার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম বা দেশীয় খ্রীষ্টান মহিলার পোশাকে যেরূপ পরিপাট্য ও শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় হিন্দু স্ত্রীলোকের পোশাকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।" তিনি মনে করেন—"হিন্দু মহিলার বেড়াইবার পোশাক অনেকটা সভ্য হইলেও অসুন্দর।"

মেয়েদের সৌন্দর্যচেতনাও যেন সেদিন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এই নব-নারী শিক্ষিত, সুরুচিসম্পন্ন, সৌন্দর্য সচেতন। তাঁরা একদিকে যেমন নামের পরে 'দাসী' বা 'দেবী' লেখার রীতি ত্যাগ করে পারিবারিক পদবী লিখতে আরম্ভ করেছেন, নামের আগে 'কুমারী' বা 'শ্রীমতী' জুড়ছেন, তেমনি নতুন ছাঁদে খোঁপা বাঁধছেন। রকমারি ঢঙে খোঁপা। তাঁর পোশাক অন্যরকম। অলঙ্কার অন্যরকম। পরিচিত স্বর্ণকারের পাশাপাশি সাহেবি কোম্পানি হ্যামিলটনেরও দিব্যি আদর তখন সম্পন্নের ঘরে। অন্তত তখনকার বিজ্ঞাপন দেখলে তাই মনে হয়। হ্যামিলটন কোম্পানি শুধু রাজরাজড়ার বাড়ির অলঙ্কার তৈরি করে ক্ষান্ত ছিল না, মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত বাঙালি বাবু বিবিদের জন্যও ছিল তাদের বিচিত্র পসরা। বাঙালি ঘরে প্রসাধনের উপচারও তখন পরিবর্তিত। সমসাময়িক বাংলা প্রহসনের বক্তব্য শুনলে মনে হয় 'ম্যাকেসার' 'ল্যাবেণ্ডার', 'ব্লুম অব রোজ'—এসব শিক্ষিত বাঙালি সংসারে আর অপরিচিত বস্তু নয়। নবযুগে নতুন মহিলাদের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলদের অন্যতম অভিযোগ ছিল ওঁরা বিলাসিনী। 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় ১৩০৮ সালে ওই হিন্দু মহিলাই প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—'অনেক হিন্দু বলেন, ব্রাহ্ম সমাজের বিলাসিতা হিন্দু সমাজে যত কম প্রবেশ করে, ততই ভাল। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যে বিলাসিতা আজকাল খুব প্রবল। তাঁহাদের কুন্তলীন ও দেলখোস, অটো-ডিরোজ ও ওডিকোলন, পাউডার ও কথ্‌গেটের সাবান কিনিতে কিনিতে ব্রাহ্মভ্রাতারা নাজেহাল হইয়া গেলেন।' এসব হয়তো যাকে বলে—ফেনিয়ে বলা। তবে শিক্ষিত শহুরে মেয়েরা যে উনিশ শতকের শেষের দিকে পোশাকে-প্রসাধনে তাঁদের মা-দিদিমাদের থেকে সম্পূর্ণ অন্যরকম তা পুরানো ফটোগ্রাফের অ্যালবামের পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। সাধারণ ভদ্র বাঙালি ঘরের মেয়েদের পোশাক কেমন ছিল তার কিছু নমুনা দেখিয়েছেন মার্গারেট এম আর্কুহার্ট (Margaret M Urquhart) তাঁর 'উইমেন অব বেঙ্গল/এ স্টাডি অব দি হিন্দু পর্দানসিনস অব ক্যালকাটা' (১৯২৫) বইয়ে। 'কিশোরী ভবনায়' মুদ্রিত ছবির মেয়েদের সঙ্গে তাঁদের দূরত্ব যোজন যোজন। ঐরা হয়তো বিশ শতকের প্রথম দিককার বাংলার কিশোরী তরুণী। কিন্তু বলতে গেলে উনিশ শতকের শেষ দিকেই ধার্য হয়ে গেছে তাদের মানসলোক। সেই সঙ্গে রূপসজ্জাও। চোখে মুখে নতুন আত্মপ্রত্যয়। এ মেয়েদের সামনের দিকে তাকাতে যেন আর বিন্দুমাত্র ভয় নেই।

বাঙালি মেয়েদের প্রথম সংগঠন—ব্রাহ্মিকা সমাজ। প্রতিষ্ঠা ১৮৬৫ সন। তার আগে ১৮৬৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বামাবোধিনী সভা। তার উদ্যোক্তা পুরুষরা। লক্ষ্য ছিল 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয় বামাহিতৈষিণী সভা, নারী হিতৈষিণী সভা, বঙ্গীয় মহিলা সমাজ, সর্বনারী সমাজ, বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় মহিলা সমাজ, সখী সমিতি, ভারত মহিলা সমিতি। ১৮৬৩ থেকে ১৮৯৫ সনের মধ্যে মহিলাদের বেশ কিছু

**১০৫. চুঁচুড়ার মাথাঘসার দিন ফুরিয়েছে। তখন জলে-ভাসা বিলিতি সাবানের যুগ। নতুন যুগে মেয়েদের প্রসাধনী অন্যরকম। শিক্ষিত, সম্পন্ন ঘরের অনেক মেয়ের আদর্শ তখন পশ্চিমী সুন্দরীরা। কলকাতার সাহেবি দোকান হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন-এর ক্যাটালগ থেকে।**

r freshness charm
'sweet attractiveness
Use
GOODWIN'S
Toilet Soap

# Silver-Mounted Scent Bottles

## Cut Crystal Scent Bottles

R328 Crystal Scent Bottle, Silver Mounts, 6 ins. Rs. 10-15

R316 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts, 4½ ins. Rs. 4-12 each.

R6272 Cut Crystal Pump Action Scent Spray, Silver Mounts. Height closed, 5½ ins. Rs. 18-8 each.

R170 Cut Crystal Salts Bottle, 3 ins., with Silver Cap. Rs. 7-12 each.

R6286 Cut Crystal Pump Action Scent Spray, with Silver Mounts. Height 5½ ins. Rs. 17-8 each.

R314 Cut Crystal Scent Bottles, Silver Mounts. Height 6½ ins. Rs. 12-8 each.

R334 Cut Crystal Scent Bottle, 3½ ins. with Silver Mounts. Rs. 2-15 each.

R326 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts, 6½ ins. Rs. 10-8 each.

R337 Cut Crystal Scent Bottle, 5½ ins. Silver Mounted. Rs. 5-8 each.

R8016 Cut Crystal Salts Bottle, with Silver Cap, similar to sketch. Height— 2½ 2¾ ins. Rs. 5-15 6-15 ea. 2½ 2¾ ins. Rs. 7-15 8-15 ea.

R1237 Crystal Scent Bottle, unmounted, 5½ ins. Rs. 3-15 each.

R315 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts. Height 3¾ ins. Rs. 2-15 each.

R313 Cut Crystal Scent Bottle, 7 ins. high. Silver Mounted. Rs. 7-8 each.

R305 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts, 5½ ins. Rs. 6-15 each.

R5613 Baby's Sterling Silver Rattle, with bone Teething Ring. Rs. 8-15 each.

R309 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts. Height 5½ ins. Rs. 10-8 each.

R3099 Crystal Pump Spray, New Midget Size. 8-15 each.

R155 Clear Crystal Powder Bowl, with Sterling Silver Rim and Cover and fitted with Puff. Diam. 4½ 5 ins. Rs. 21-8 29-8 each.

R338 Cut Crystal Scent Bottle, 4½ ins. Silver Mounted. Rs. 2-15 each.

R292 Scent Spray, Decorated Crystal. Height 5 5½ ins. Rs. 9-15 12-8 each.

R3719 Cut Crystal Powder Box, plain Silver lids. Height 3½ ins. Rs. 15-8 each.

R3087 Cut Crystal Scent Spray, Silver-plated Mounts. Height 5 ins. Rs. 15-8 each.

R76 Crystal Scent Bottle, unmounted. Height 5 5½ ins. Rs. 4-8 5-12 each.

R319 Cut Crystal Scent Bottle, Silver Mounts. Height 4½ ins. Rs. 4-15 each.

সমিতি গড়ে ওঠে কলকাতায় । কিছু কিছু জেলা শহরেও । যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সব সংঘ গড়ে তোলার কাজে তৎপর ছিলেন পুরুষরা, ক্রমে নিজেদের সভা সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরাই । ১৯০৫ সনের পর দেখা গেল রকমারি নারী সংগঠন গড়ে তুলছেন হিন্দুরাও ।

একই সময়ে মেয়েরা হাতে তুলে নেন কলমও । বিশেষত উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে কাগজে কাগজে প্রকাশিত হতে থাকে নানা বিষয়ে তাঁদের মতামত । অনেক মেয়েদের কাগজ তখন । বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, বঙ্গমহিলা, ভারতী । ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৭ সনের মধ্যে এদের আত্মপ্রকাশ । তাছাড়া ছিল পরিচারিকা, দাসী, অন্তঃপুর—ইত্যাদি । এসব কাগজে সমাজ সংসার, সংস্কৃতি—সব বিষয়েই বিস্তর লেখালেখি করেছেন মেয়েরা । অনুপাতে রাজনীতি অবশ্য প্রায় অনালোচিত ।

তার মানে এই নয়, সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষিত মেয়েরা উনিশ শতকে সম্পূর্ণ উদাসীন । বাঙালি ভদ্রলোকেরা রীতিমত রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন ছয়ের দশক থেকেই । ক্রমে ক্রমে অন্তঃপুরেও তার হাওয়া । ঔপনিবেশিক শাসনে এই সচেতনা খুবই স্বাভাবিক । ইংরেজি শিক্ষিত বাবুরা অনিবার্যভাবেই ক্রমে উপলব্ধি করছিলেন—রাজা আর প্রজার মধ্যে ব্যবধান দুস্তর । বাঙালি বিবিদেরও সেটা অজানা থাকার কথা নয় । কেননা, তাঁরা ইতিমধ্যে স্বামীদের কাজের জগৎ এবং ভাবনার জগতে উঁকি দিতে আরম্ভ করেছেন । তাঁদের কর্মজীবনে সাফল্য ব্যর্থতা, পুরস্কার তিরস্কার, লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর পুরোপুরি থাকছে না । ফলে ১৮৭১ সনেই শোনা গেল টাউন হলের এক ছাত্র সভায় কিছু মেয়ের উপস্থিতির কথা । ১৮৮২ সনের খবর বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে বেশ কিছু পর্দানসীন মেয়ে গাড়ি চড়ে এসে ভোট দিয়ে গেছেন । ১৮৮৩ সনে 'ইলবার্ট বিল' উপলক্ষে উত্তেজনা । সংবাদ : সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কামিনী সেনের নেতৃত্বে হাতে কালো ফিতে বেঁধেছে বেথুন স্কুলের মেয়েরা । ১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেসের যাত্রারম্ভ । প্রথম দিকে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলোতে মেয়েদের প্রায় দেখাই যায়নি । ১৮৮৯ সনে বোম্বাই কংগ্রেসে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উৎসাহে ছয়জন মহিলা যোগ দিয়েছিলেন । দু'জন বাংলা থেকে । কাদম্বিনী গাঙ্গুলি আর স্বর্ণকুমারী দেবী । ১৮৯০ সনে কলকাতা কংগ্রেসে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র একজন,—স্বর্ণকুমারী দেবী । ১৯০১-এ এই কলকাতাতেই প্রথমবারের মতো পর্দা-মহিলাদের পর্যবেক্ষকের অধিকার মেনে নেওয়া হয় । দু'শ ভদ্রমহিলা হাজির ছিলেন সেই অধিবেশনে ! তখন কংগ্রেসের পাশাপাশি ছিল আরও একটি প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল সোস্যাল কনফারেন্স (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৭) । কংগ্রেসে অধিবেশন শেষে একই মঞ্চে সভা বসত ওঁদের । সেখানেও যোগ দিতেন মেয়েরা । তবে সংখ্যায় খুব বেশি নয় । ১৯০২-এর অধিবেশনে এক হাজার পুরুষের মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র পঞ্চাশজন । তবু বুঝতে অসুবিধা নেই, শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে অতি দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছে জাতীয়তাবোধ । এই স্বাদেশীকতা পুষ্টিলাভ করেছে আরও নানা সূত্রে । যথা : হিন্দুমেলা ।

ফলে ১৯০৫ সনে দেখা অবাক-করা সব দৃশ্য । সে বছর যুবরাজের আগমন উপলক্ষে বাংলার ছোটলাট অ্যাণ্ড্রু ফ্রাসার-এর স্ত্রী বেলভেডিয়ারে একটা 'পর্দা-পার্টি'র আয়োজন করেছিলেন । অনেক বিতর্কের পর সে-আসরে যোগ দিয়েছিলেন পঁচিশজন ভদ্রমহিলা । সে-বছরই বেনারস কংগ্রেসে আলাদা সভা করেন মেয়েরা । তাতে যোগ দিয়েছিলেন ছ'শ মহিলা । অনেকেই বাংলা থেকে । বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে বলতে গেলে সমগ্র বাংলা সেদিন আলোড়িত, উত্তেজিত । সেই উত্তেজনায় বুঝিবা কম্পমান চিকের শেষ আড়ালটুকুও । ১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ । কার্জনের ধৃষ্টতার প্রতিবাদে কলকাতায় স্থাপিত হচ্ছে নতুন ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর । প্রায় পাঁচশ' ভদ্রমহিলা উপস্থিত সেই মঙ্গল অনুষ্ঠানে ! যুগের হাওয়ায় শন শন উড়ছে বাঙালি ঘরের পর্দা । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দশকে গান্ধীজির ডাকে ঝড় । সে ঝড়ে চিরকালের মতো উড়ে গেল,

১০৬. **কুন্তলীন আর দেলখোস যথেষ্ট নয়, নতুন যুগের সুখী শৌখিন বাঙালি মেয়ের চোখ তখন হয়তো বা সাহেবি দোকানের বিচিত্র পসরার দিকে । এমন কি স্বদেশী সুগন্ধিরও নাম তখন অটো ডিরোজ, ফরগেট মি নট, বিউটি অব দি নাইট ! হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন-এর ক্যাটালগ থেকে ।**

The Ear-ring
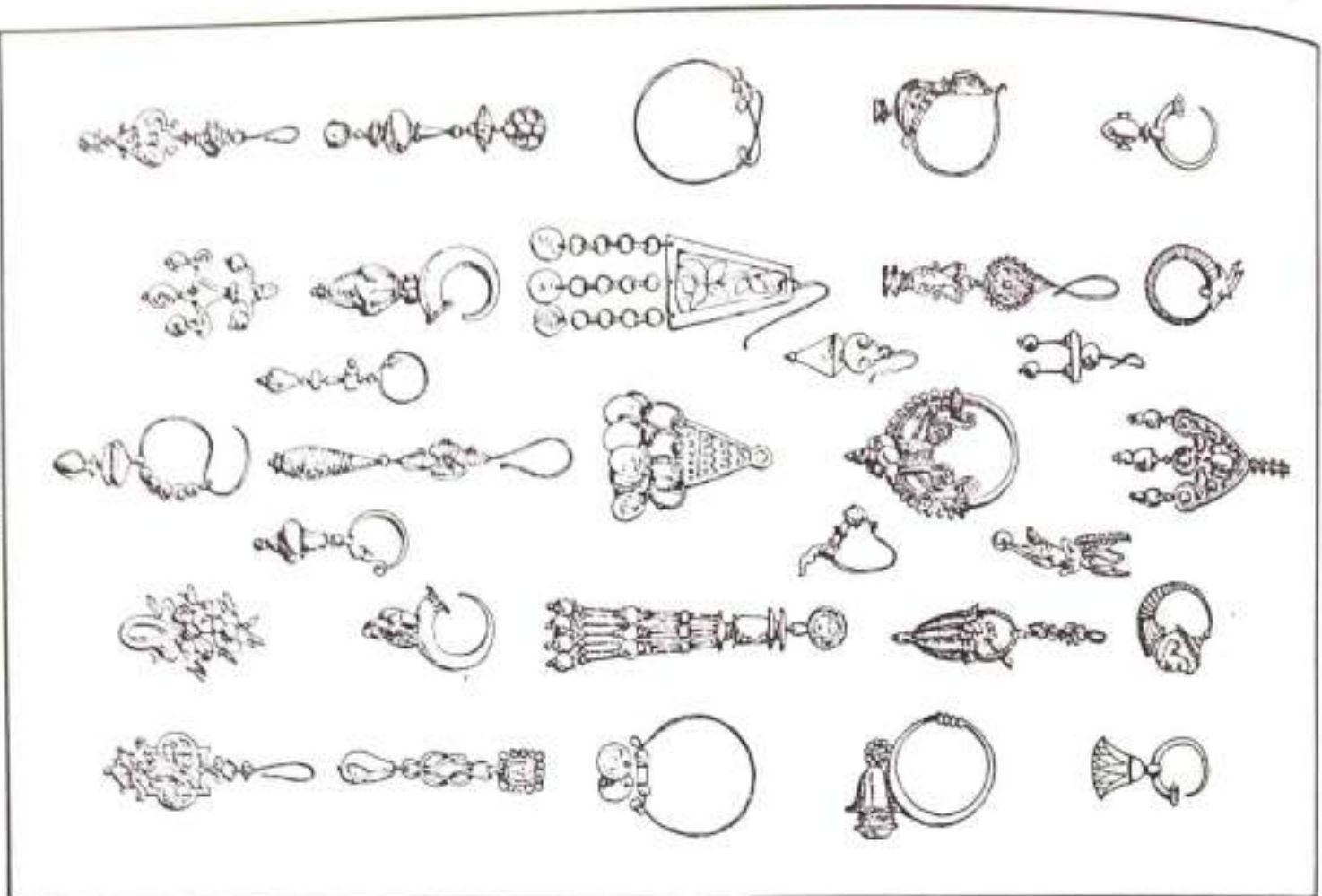
The Pin.
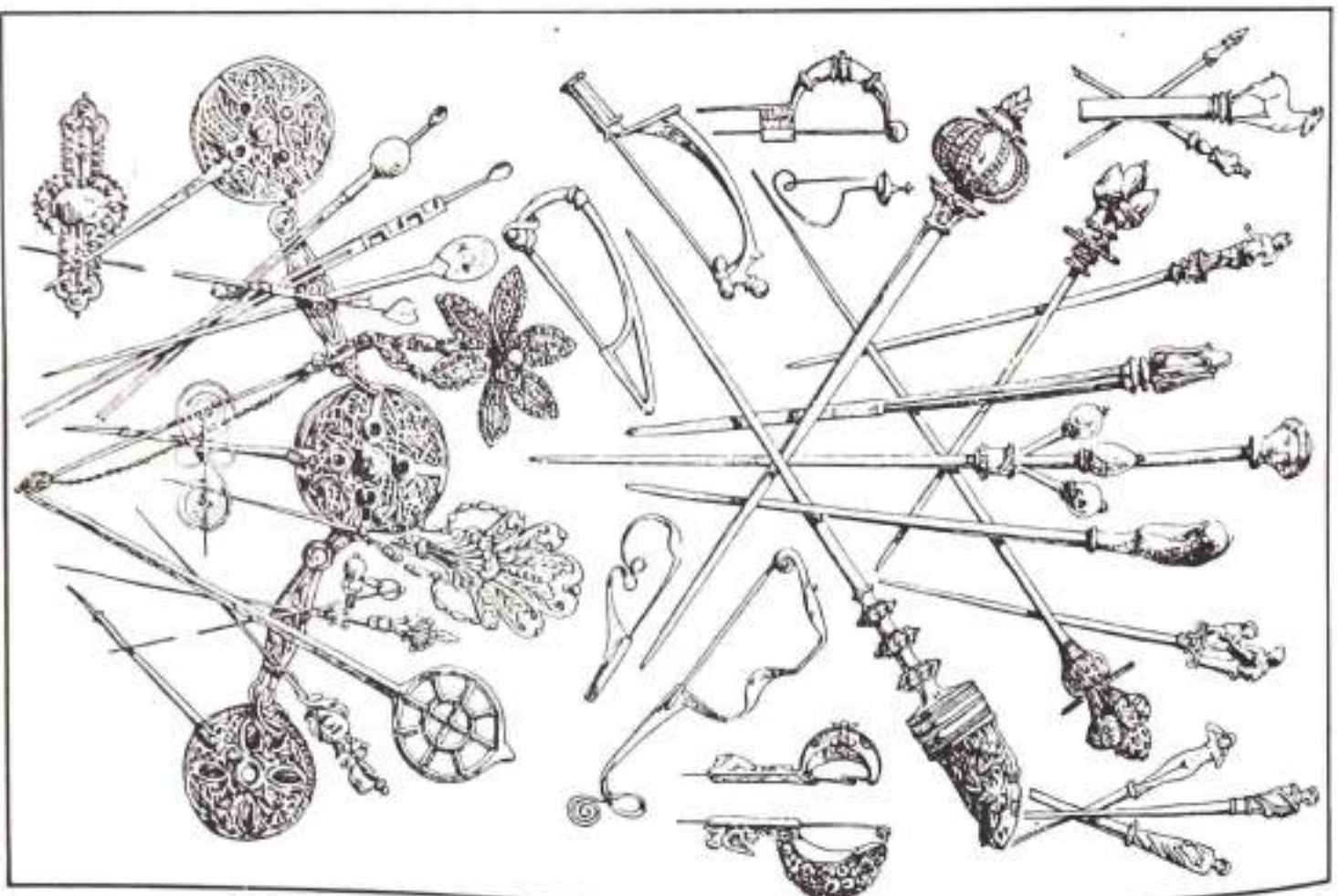
ইতিমধ্যেই যা ছিল ফুটোফাটা, সেই মলিন পর্দা—আব্রু। রাজপথে কলকল্লোল। জনতরঙ্গে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা। কখনও কখনও তাঁরা আগে।

এই প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের পুরানো সম্পর্ক অটুট কিংবা অপরিবর্তিত থাকার কথা নয়। সেটা এক অসম্ভব কল্পনা। অথচ 'পরিণয়ে প্রগতি'র লেখক গান্ধী-আন্দোলনের পরও পুরানো পৃথিবী ফিরে পেতে চান। উনিশ শতকের সেই সব প্রহসন রচয়িতার মতোই তিনিও চান ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘোরাতে। সনাতন ধর্ম, সামাজিক স্থিতি, এবং পারিবারিক শান্তির নামে মেয়েদের আবার অন্তঃপুরের বন্দীশালায় ফেরত পাঠাতে। তা আর কেমন করে সম্ভব ? পুরুষ কি বাধ্য হয়েই নিজের হাতে খুলে দেয়নি খাঁচার দরজা ?

একটি প্রহসনে (সুরুচির ধ্বজা, রাখাল দাস ভট্টাচার্য, ১৮৮৬) নায়ক লালচাঁদ বলছে সে তার সেকেলে বউ নিয়ে আর ঘর করতে পারছে না। কেননা, বউ 'সারাদিন কেবল রসুই নিয়ে পড়ে থাকে আর বুড়োর পায়ে হাত বুলয়। জেন্টলম্যান-এর সোসাইতে মুভ করতে আদৌ জানে না।' তার বন্ধু চারুচন্দ্রও মনে করে—'অ্যাকমপ্লিসড ওয়াইফ ভিন্ন এই পার্থিব জীবনই বৃথা। মানুষের প্রোগ্রেস-এর অর্ধভাগ ওয়াইফ হেলপ করেন। বিশেষত সভ্যসমাজে আজকালকার দিনে ওয়াইফ নিয়েই পসার।' সে আরও বলে—'আমার একটি সেকেলে বন্ধু কেবল অ্যাকমপ্লিসড ওয়াইফ-এর জোরে বড় বড় অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর হচ্ছেন, প্রধান প্রধান সোস্যাল মুভমেন্ট-এ লিডিং পার্ট নিচ্ছেন। প্রোগ্রেসিভদের মধ্যে তাঁর ভারি পসার।' সনাতনপন্থীদের এই আক্রমণ যত হীনই হোক, এতে কিছু পরিমাণে সত্যেরও আভাস রয়েছে। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি যুবক আর সেকেলে বউ নিয়ে ঘর করা পছন্দ করতে পারছেন না। তিনি এমন স্ত্রী চান যাঁকে নিয়ে বাইরের সমাজেও মেলামেশা চলে। প্রহসনটিতে বলা হয়েছিল লালচাঁদ 'সোসাইটির এ মিয়ার গার্ল অফ টুয়েন্টিফাইভ সুরুচিকে' বিয়ে করতে চায়। আর, সুরুচিও 'স্বামী ত্যাগ করে' তাকে বিয়ে করতে রাজি।

যতদিন অবরোধ প্রথা ছিল, পর্দা ছিল ততদিন লালচাঁদের সঙ্গে সুরুচির দেখা হওয়াই ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তখন আর সেটা অসম্ভব নয়। কারণ, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উৎসবে যোগ দিচ্ছেন। সমাজ সূত্রে এক পরিবারের সঙ্গে অন্য পরিবারের সামাজিকতা গড়ে উঠেছে। কর্মসূত্রেও নানা পরিবার কাছাকাছি আসছেন। বিয়ে অবশ্য তার পরও প্রথম দিকে, যাকে বলে 'সম্বন্ধ করে', তা-ই হত। কিন্তু প্রথম দেখা সেসব ক্ষেত্রেও সমাজেই। স্বনামধন্য নীলরতন সরকার তাঁর ভবিষ্যতের স্ত্রী নির্মলা মজুমদারকে প্রথম দেখেছিলেন সমাজের উৎসবে। হেমন্তকুমারী দেবী তাঁর স্বামী খুঁজে পেয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈঠকখানায়। শিবনাথ ছিলেন এই মেয়েটির অভিভাবক। রাজনারায়ণ বসুর চতুর্থ কন্যা লীলাবতী এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রও বিয়ের আগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। আইনমাফিক বিয়ে হবে না সমাজের নিয়ম মতো, তাই নিয়ে রাজনারায়ণ বসুর প্রশ্ন ছিল। লীলাবতী বাবার অমত মানতে রাজি হননি।

ধীরে ধীরে রোমান্সের সুবাসিত আবহাওয়া। শিক্ষিত ভদ্রসমাজে 'কিশোরী ভজনা'র দিন চলে যাচ্ছে। শিক্ষিত মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ছে। কিছু কিছু মেয়ে স্বাধীন জীবিকা সন্ধানী। মেরেডিথ বর্থউইক ১৯০১ সনের 'আদম সুমারি' উধৃত করে জানাচ্ছেন কলকাতায় তখন ৭২৫ জন মেয়ে নিজেদের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত করে ঘোষণা করেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষকতায় (প্রিন্সিপাল, প্রফেসর, টিচার) নিযুক্ত ৫৮৭ জন, প্রশাসক এবং পরিদর্শক ৬ জন, চিকিৎসক ১২৪ জন, ফটোগ্রাফার ৪ জন, লেখক-সম্পাদক ৪ জন। ১৮৯১ সনের তুলনায় সংখ্যাটি প্রায় দ্বিগুণ। লেখিকার মন্তব্য—ধরে নেওয়া যায় এই মহিলা চাকুরিজীবিরা

**১০৭. কানের গহনা আর মাথার কি পোশাকের কাঁটা। পশ্চিমী গহনার ডিজাইনও সেদিন জনপ্রিয় কলকাতার বাঙালিটোলায়।**

প্রধানত অবিবাহিত ও বিধবা। এবং তাঁদের প্রায় সকলেই খ্রিস্টান অথবা ব্রাহ্ম।

বেশি বয়সে বিয়ে করা বা আদৌ বিয়ে না-করা তখন আর বাঙালি মেয়ের পক্ষে লজ্জাকর নয়। পরিবারের পক্ষেও নয় কলঙ্কজনক। তার মানে এই নয় যে, বাঙালি সমাজে মেয়েদের বিয়ের বয়স সব পরিবারেই বেড়ে গিয়েছিল বেশি বয়সে বিয়ে দেওয়া পরিণত হয়েছিল সর্বজনীন আচারে। তবে কেউ কেউ অবশ্যই বেশি বয়সে বিয়ে করছিলেন। গোলাম মুরশিদ তাঁর 'সংকোচের বিহ্বলতা' বইয়ে এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন। সরলা দেবী বিয়ে করেন তেত্রিশ বছর বয়সে। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী। ঠাকুরবাড়ির বউদের বিয়ের বয়সের কথা ভাবলে এ ঘটনা যুগান্তকারী নয় কি? কেশব সেনের কন্যা সুচারু দেবী যখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স তিরিশ। চন্দ্রমুখী বসু একচল্লিশ বছর বয়স অবধি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর ছোটবোন, প্রথম দুই মহিলা এম-এ'র একজন, বিধুমুখী মোটে বিয়েই করেননি। আর একজন উচ্চশিক্ষিত মহিলা ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র বিয়ে করেন উনচল্লিশ বছর বয়সে। তাঁর ছোটবোন পড়াশুনা করতে বিদেশে গিয়েছিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত। জগদীশচন্দ্র বসুর বোন হেমপ্রভা, রাজনারায়ণ বসুর আর এক কন্যা লজ্জাবতী,—এঁরাও বিয়ে করেননি। তার জন্য এঁদের কারও মানহানি হয়েছিল এমন শোনা যায় না।

প্রেম করে বিয়ে করলেও যে চতুর্দিকে ঢি ঢি পড়ে যেত তা নয়। সরলা দেবীর বড় বোন হিরণ্ময়ী দেবী প্রেমের ডোরেই বাঁধা পড়েছিলেন ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তার মামাতো বোন ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রেমের কাহিনী তো সকলের জানা। বিয়ে ঠিক হয়েছে শুনে বাংলা প্রহসনে (ছবি বা বড়দিনের পঙ্ক রং—দুর্গাদাস দে, ১৮৯৬) নায়িকা মিস বঙ্কিম বিনোদিনী (বি এ অনার্স) বলেছিল—'প্রণয়ে যুদ্ধ হলো না, বিদ্রোহ হলো না, বিচ্ছেদ হলো না, যাতনা হলো না, আমার হিস্টিরিয়া হল না, আমার সহজ বিবাহ হবে?' পটভূমিতে বাস্তব প্রেমোপাখ্যান তখন পুরোপুরি দুষ্প্রাপ্য নয়।

১৮৭২ সনে ব্রাহ্মদের উদ্যোগে রচিত হয় নতুন বিবাহ আইন। এই আইনে কনের বয়স ধার্য হয় কমপক্ষে চৌদ্দ, বরের আঠারো। ১৮৬১ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সুকুমারীর বিয়ে দেন আপন 'সংস্কার' নীতি অনুসারে। সে অনুষ্ঠান ছিল হিন্দু আচার মুক্ত। ১৮৬৬ সনে কিশোরীলাল মৈত্রের কন্যা বেথুন কলেজের ছাত্রী রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে প্রসন্নকুমার ঘোষের বিয়ে হয় ধর্মীয় আচার মুক্ত এক অনুষ্ঠানে। কারণ, রাজলক্ষ্মী ছিলেন ব্রাহ্মণকন্যা, আর প্রসন্নকুমার বৈদ্য। ১৮৭২-র আইনে এ-ধরনের বিয়ের পথ সুগম হয়। তবু 'তত্ত্ববোধিনী' কাগজ এই বিয়েকে আখ্যা দেয়—'নিরিশ্বর বিবাহ' (পৌষ, ১৭৯৮ শক)। কেন না, 'উক্ত আইনে এতদ্রূপ বিধান আছে যে, কোন ব্যক্তির ধর্মমত যাহাই হোক না কেন, এমন কি নাস্তিক পর্যন্ত, ঐ আইন অনুসারে বিবাহ করিলে সেই বিবাহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ আইন-বিহিত বিবাহ প্রণালীতে কোন স্থানে ঈশ্বরের নাম গন্ধ নাই। বাটী কিম্বা ভূমি সংক্রান্ত দলিল রেজিস্ট্রারের সম্মুখে রেজিস্টরি করিয়া দিতে হয়, তেমনি ঐ বিবাহে স্ত্রীকে এবং স্বামীকে রেজিস্ট্রারের সম্মুখে রেজিস্টরি করিয়া দিতে হয়। এতদ্রূপ বিবাহকে নিরীশ্বর বিবাহ বলিলে অযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হয় না। (সম্পূর্ণ বক্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য: সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজচিত্র, বিনয় ঘোষ, চতুর্থ খণ্ড)। এই আইন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের তীব্র বিরোধ। গোঁড়া হিন্দুরা স্বভাবতই ক্ষিপ্তপ্রায়। অনেক প্রহসন লেখা হয়েছে এই আইনকে উপলক্ষ করে। জয়ন্ত গোস্বামী তাঁর 'সমাজচিত্রে উনিশ শতকের বাংলা প্রহসন' বইতে তার বেশ কিছু নমুনা দিয়েছেন। বস্তুত এই আলোচনায় যে সব বটতলার প্রহসন উল্লেখিত কিংবা উধৃত তার অধিকাংশ তাঁর ওই বিশাল বইখানির সুবাদে। একটি প্রহসনে (বক্কেশ্বর, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ১৮৮৯) বিলাত ফেরত নায়ক অজ্ঞান খাস্তগীর বলছেন—'হায়, না জানি কবে—আর কত বৎসর পরে ঘৃণিত বিবাহ প্রথা উঠিয়া গিয়া নরনারীর

**১০৮. ইন্দিরাদেবী। মেয়েদের তখন বিয়ের বয়স বাড়ছে। ক্রমে বাড়ছে ভালবাসার-বিয়ের ঘটনাও। শিল্পী: অতুল বসু।**

মধ্যে স্বাধীন সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে ।....তাহারা প্রেমলীলার চূড়ান্ত অভিনয় দেখাইবে !"

১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সন—এই এক দশকে নতুন আইনে ১৪৯ জন ব্রাহ্ম বিয়ে করেন । তার মধ্যে স্বর্ণ, অসবর্ণ, সব ধরনের বিয়ের ঘটনাই ছিল । ব্রাহ্ম রেজিস্টার অনুযায়ী ওই সব বিয়েতে অন্তত পঞ্চাশ জন কনেই ছিলেন বিধবা । ওই আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থাও ছিল । উনিশ শতকে তার সুযোগ নিতে পেরেছিলেন একটি মাত্র মেয়ে । কোন্ রীতিতে তার বিয়ে হয় তা জানা নেই । 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৯ পৌষ, ১২৮৩) অনুযায়ী দশম বর্ষীয় সেই বালিকা স্বামীর শারীরিক অক্ষমতার জন্য বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেন । তা মঞ্জুর হয় । মেয়েটির আবার বিয়েও হয় । সুতরাং, প্রহসন রচয়িতারা আর চুপ করে থাকেন কেমন করে ? তারকনাথ পালিতের কন্যা লিলিয়ানের বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেক পরের ঘটনা । ব্রাহ্ম সূত্র অনুসারে ১৯০৯-এর আগে নতুন আইনে কোনও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেনি । প্রহসনে তবু দেখি অহরহ স্বামী পাল্টাচ্ছে আধুনিক বাঙালি মেয়ে । একটি মেয়ে চকোরিনী, পর পর পাঁচ জন স্বামীকে ছেড়েছে । (আজব কারখানা বা বিলাতী সং, অপূর্বকৃষ্ণ মিত্র, ১৮৯৪) । 'ফ্যান্সি ফেয়ারে' চকোরিনীর হাতে বোনা কার্পেট দেখে নায়ক অবিদ্যাপ্রকাশ বেশি দাম দিয়ে সেটি কিনে নেয় । তারপর শুরু হয় ওদের প্রেমলীলা । ওদের একটি ক্লাব আছে । নাম—'ভালবাসা ক্লাব' ! কোনও কোনও প্রহসনে ব্রাহ্মদের সংঘ, সমিতি, সব কিছুই চিত্রিত উদ্দাম ভালবাসার ক্লাবে । একটিতে (লণ্ডভণ্ড, সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ১৮৯৬) গান—'আমার কোথায় ছিল কালাচাঁদ ?/ আমি চশমা নাকে বসে আছি/ পেতে প্রেমের ফাঁদ !' মনে পড়ছে অমৃতলাল বসু 'বাবু' (১৮৯৪) প্রহসনে কন্দর্পের বাড়ির সামনে 'স্বাধীন মহিলাদের' গান—'আমরা সবাই বিদ্যাবতী/আসলে পরে দোস্রা পতি/টানলে প্রাণ তার পানে সই,/ কেন চল্‌ব না লো চল্‌ব না !'

সুতরাং ১৮৭৮ সনে বসু বনাম বসু মামলা উপলক্ষে বটতলার লেখকরা যে তৎক্ষণাৎ কালি-কলম নিয়ে বসে পড়বেন তাতে আর বিস্ময় কী । নটবর দাস লিখলেন 'মক্কেলমামা' । মহেশচন্দ্র দাস দে—'মামা ভাগ্নীর নাটক' । সংক্ষেপে মূল ঘটনা : ক্ষেত্রমণি ইংরেজি-পড়া মেয়ে । তাঁর স্বামী মুন্সেফ । তিনি কলকাতার বাইরে থাকেন । অভিযোগ স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ক্ষেত্রমণি তাঁর মামার সঙ্গে প্রেম করেন । মধ্যস্থ ছিলেন ক্ষেত্রমণির সখী এবং নিকট আত্মীয় বিনোদিনী । তিনিও স্কুলে-পড়া মেয়ে । স্বামী মামার বিরুদ্ধে পরদারগমনের অভিযোগ আনেন । ক্ষেত্রমণি অভিযোগ অস্বীকার করেন । বিনোদিনীও । ওঁরা সাক্ষী দিয়েছিলেন পালকিতে বসে । ক্ষেত্রমণি বলেন—স্বামী ঈর্ষাকাতর । তিনি চান না ক্ষেত্রমণি কোনও পুরুষের, এমন কি নিকট আত্মীয়দের সামনে বের হন বা তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন । যা হোক, আদালত ওঁদের দোষী সাব্যস্ত করে । মামার এক বছরের মেয়াদ হয় । ক্ষেত্রমণিকে তুলে দেওয়া হয় স্বামীর হাতেই । এই মামলা উপলক্ষে সেদিন আরও চাঞ্চল্য, কারণ, ক্ষেত্রমণি এবং বিনোদিনী লেখাপড়া জানা মেয়ে বলেই । আদালতে ক্ষেত্রমণির লেখা চিঠিপত্রও পেশ করা হয়েছিল ।

নতুন কালের নবীনার আর এক লক্ষণ তারা শুধু প্রেম করে না, প্রেমের চিঠিও লিখতে জানে । আদর্শ প্রেমপত্রের নমুনা দিয়ে বটতলা থেকে প্রেমপত্রের সংকলনও প্রকাশিত হত । যথা : সচিত্র প্রেমপত্র । নমুনাগুলো, বলাইবাহুল্য নিতান্তই কাল্পনিক । অধিকাংশই পয়ারে কিংবা স্বামী স্ত্রীর সাংসারিক কথাবার্তায় বোঝাই । তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরা দেবী, কিংবা প্রিয়ম্বদা দেবী আর ওকাকুরার পত্রালাপের মতো রোমান্টিক নারী পুরুষেরা কাগজ কলম ব্যবহারে পিছিয়ে ছিলেন না । উল্লেখ্য : প্রথম দৃষ্টান্তটি প্রাক-বিবাহ প্রেমের, দ্বিতীয়টি বিয়ের বাইরে । প্রিয়ম্বদা বিধবা, ওকাকুরা ঠাকুরবাড়িতে বিদেশী অতিথি । ক্ষেত্রমণি আর তাঁর মাতুলের সম্পর্কও বিয়ের পরিধির বাইরে । সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও তখন নর-নারীর মধ্যে প্রাক-বিবাহ বা বিয়ের পর পরপুরুষের সঙ্গে নারীর বা পরনারীর সঙ্গে

বিবাহিত পুরুষের সম্পর্ক ঠাঁই পাচ্ছে। বাঙালি সমাজে, বলা নিষ্প্রয়োজন, এসব মোটেই নতুন নয়। যখন বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহের সুবর্ণযুগ, যখন বিধবা বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত ব্যাভিচার বলে গণ্য তখন কিন্তু পর্দার আড়ালে বাঙালি সমাজ এক বিশাল পঙ্ককুণ্ড। ভ্রূণ হত্যার কথা বাদই দেওয়া গেল। বাদ দেওয়া গেল গাঁয়ে গঞ্জে শহরে বারবণিতাদের বসতিগুলোর কথাও। কুলবধূর কুলত্যাগ, স্বামী নেয় না—অপবাদ এসব কি তখন বহুশ্রুত নয়? তখন 'ভাদ্দর বউয়ের সঙ্গে নষ্ট', শাশুড়ি-জামাই, শ্বশুর-পুত্রবধূ ভৃত্য-গৃহিণী—সম্ভব অসম্ভব কোন সম্পর্কের কথা না শোনা গেছে এ পাড়ায় ও পাড়ায়? লেখাপড়া-জানা, অনেকাংশে কুসংস্কার মুক্ত নতুন কালের নতুন নারী পুরুষ কিন্তু পূর্বসুরীদের তুলনায় অনেক বেশি সভ্য, সুরুচিসম্পন্ন। তাঁরা অনেক বেশি সহজ, স্বাভাবিক এবং সাহসী। প্রয়োজনে নোংরা কাপড় প্রকাশ্যে কাঁচতেও পিছুপা নন তাঁরা। একদিক থেকে 'পরিণয়ে প্রগতি' তারই প্রমাণ।

সাধারণভাবে বাঙালি সমাজে সেদিন নারী পুরুষের যৌবন ঘিরে নানা অসম্ভবের প্রাচীর। জীবন সে কারণেই চরিতার্থতা খুঁজতে গিয়ে অহরহ তলিয়ে গেছে অজস্র সহস্রবিধ বিকৃতিতে। ব্রাহ্ম সংস্কারকরা তাকে শোধন করতে চেয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু ভিক্টোরীয় নৈতিকতার আবর্তে পড়ে তাঁরাও সব সময় পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁদের সমাজে নীতিবাগীশরা নিষিদ্ধের তালিকা বাড়িয়েই চলেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের চোখে নিন্দনীয়—জুয়া, বারবণিতা গমন, মদ্যপান, এবং থিয়েটার দেখা। ভিক্টোরীয় ইংরেজ সমাজ প্রমাণ করেছে নৈতিকতার বিধান যত কঠোর, গোপনে তার ব্যাভিচার ততই ব্যাপ্ত। বাঙালি সমাজেও অতএব কখনও কখনও যদি আধুনিক নরনারীর পদস্খলন ঘটে থাকে তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। লক্ষ্য করার বিষয় এই, আধুনিকতার হাওয়া যত বেগবান, ধর্মীয় গোষ্ঠীগত উদ্যোগ ছাপিয়ে আন্দোলের বৃত্ত যত আয়তনে বেড়েছে ততই সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে নারী পুরুষের আচরণ। ১৯০৫-এ পৌঁছে দেখি কুলবধূ বিমলা (ঘরে-বাইরে, ১৯১৬) অকুতোভয়। পরপুরুষের দিকে তাকাতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সন্দীপ বক্তৃতা করছেন। ধর্মকথা নয়, স্বাদেশিকতার তেজী আহ্বান। মন্ত্রমুগ্ধ বিমলা শুনছেন। তাঁর হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে। তারপর? 'আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম আমার মনে পড়ে না।....কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁস ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর।'....

পরবর্তীকালে গান্ধী-আন্দোলনে কিংবা সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়াসের দিনগুলোতে হয়তো এমনই আরও অনেক বিমুগ্ধ বিমলাকেই দেখা গেছে। হয়তো বিমলার চেয়েও সাহসী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। হয়তো বিমলার দ্বিধা দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ আতঙ্কের লেশ মাত্র ছিল না তাঁদের মধ্যে। তা-ই বলে কেন পাতক হবেন তাঁরা? কেন হবেন ব্যঙ্গের উপলক্ষ? 'পরিণয়ে প্রগতি'র নায়িকারা বরং ইতিহাসের বিচারে সকলেই—কেয়াবাৎ মেয়ে।

# চিত্রসূচি

## কেয়াবাৎ মেয়ে

১. স্বামী ভক্তি বা পাতিব্রত্য চিত্র। সতীর সার কথা : 'পতি ধর্ম্ম, পতি কর্ম্ম, পতিসারাৎসার।/ পতি ভিন্ন রমণীর গতি নাই আর॥'— শ্রীচণ্ডীচরণ ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। আর্য্যচিত্রালয়, ৩৮ নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। Printed by- S. C. Dhur Co. 1/6 Halliday Street, Calcutta. রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ। গৃহস্থঘরের দেওয়ালে একসময় শোভা পেত এ-ধরনের ছবি। কখনও বা একই বাণী প্রচারিত হত মেয়েদের সুচের ডগায়, রঙিন সুতোয়। যথা : 'পুরুষ তমাল তরু প্রেম অধিকারী, নারী যে মাধবীলতা আশ্রিতা তাহারি।'

২. 'কেয়াবাৎ মেয়ে' প্রহসনের নায়িকা। কাঠখোদাই। মূলত ছাপাখানার অলঙ্করণ। অর্থাৎ, এই ছবিটি অন্য বইয়ে ব্যবহৃত হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বইটির লেখক— পঞ্চানন রায়চৌধুরী। প্রকাশক— ভিক্টোরিয়া পুস্তকালয়, কলিকাতা। ১৩১১। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

৩. বেথুন স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ৬ নভেম্বর, ১৮৫০। 'Bethune College and School Centenary Volume, 1849-1949 Ed. Kalidas Nag.' বই থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৪. নায়ক-নায়িকা। কালীঘাটের শিল্পীদের আঁকা রেখাচিত্র। উনিশ শতক। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহ। কলকাতা।

৫. 'মডেল ভগিনী'র নায়িকা কমলিনী। কাঠখোদাই। মডেল ভগিনী। শ্রী—। সপ্তম সংস্করণ। কলিকাতা। ৩৪/১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৩০৪ সাল। বইটির লেখক আসলে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। বইটি প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১২৯৩ সাল। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সংগ্রহ।

৬. 'মডেল ভগিনী'র একটি ছবি। কাঠখোদাই। দুটি ছবিরই অলঙ্করণ দর্শনীয়।

৭. সেন্ট্রাল স্কুলের অভ্যন্তর। Priscilla Champan লিখিত Hindoo Female Education (1839) থেকে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার স্ত্রী শিক্ষা' (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী) গ্রন্থে মুদ্রিত। সেখান থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৮. 'পাসকরা মাগ'-এর আখ্যাপত্র। কাঠখোদাই। ছাপাখানার সাধারণ অলঙ্করণ। 'পাশকরা মাগ'-এর লেখক— রাধাবিনোদ হালদার। গ্রেট টাউন প্রেস। ১৫ উমেশ দত্তের লেন, কলিকাতা। ১৩০৯ সাল। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সংগ্রহ।

৯. রঙ্গিণী। লুকোচুরি খেলা। রঙিন ছবি। কালীঘাট। উনিশ শতক। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

১০. কিরণশশী ও কৃষ্ণবাবু। 'পাশকরা মাগ'-এর একটি অলঙ্করণ। কাঠখোদাই। লেখকের মতোই শিল্পীও বলতে চান, আধুনিক শিক্ষা আর নির্লজ্জ যৌনতা যেন সমার্থক।

১১. বাবু-বিবি। এ-বাবু উনিশ শতকের কলকাতার বাবু। বিবি সম্ভবত শহরের রঙ্গিণীদের একজন। কালীঘাটের রেখাচিত্র। উনিশ শতক। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহ। এই সংগ্রহে কালীঘাটের শিল্পীদের আঁকা এমন কিছু কিছু ছবি রয়েছে যেগুলি বলতে গেলে কাম-দীপিকা। বস্তুত রতিশাস্ত্রের এমন বইও রয়েছে যার পাতায় কালীঘাটের আদলে আঁকা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে অলঙ্করণ হিসাবে। যথা : 'সচিত্র সম্ভোগ-রত্নাকর অর্থাৎ নারীবেদ। 'কোকাপণ্ডিত কর্ত্তৃক বিরচিত ; ১৯০০ সনে শ্রীনন্দের চাঁদ পাইন কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত' এই বইটি আমার গোচরে আনেন অমিত রায়।

১২. কালীঘাটের আর একটি রেখাচিত্র। উনিশ শতক। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহ। দৃশ্যটি দেখে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের 'নববিবিবিলাস'-এর (প্রথম প্রকাশ ১৮৩২) বিবির প্রতি প্রাচীনার উপদেশ— 'তোমার ঘরে নগরবাসী কিম্বা পল্লীবাসী কোন বাবু আইলে তাঁহাকে বহু সমাদরে ঘরে বসাইয়া চাকর ও চাকরানীকে কহিয়া দিবা যে উত্তম ২ তামাকু ভেলসা অম্বুরী, কড়া, মিঠেকড়া সাজিয়া আলবোলা গুড়গুড়ি হুকা বিবিধপ্রকার সোনাবান্ধা রূপাবান্ধা পিতলবান্ধা বিদরী পাথরী ইত্যাদি মুহুর্মুহু যোগাইতে থাকিবে।' এই পরিবেশেই একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন নবযুগের পুরুষ আর নারী।

১৩. কামরূপ কামাখ্যা যেন সেদিন খাস কলকাতায়ও। নগর সম্পূর্ণ এ নাগরিকা গোলাপসুন্দরীর। কালীঘাটের আর একটি রেখাচিত্র। উনিশ শতক। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহ।

১৪. 'The Modern Krishna'। বাঁশিতে লেখা— 'Female Education.' বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকে উপলক্ষ করে এই ব্যঙ্গচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার সাহেবি কাগজ— 'The Indian Charivari or Indian Punch'-এ। মার্চ ৫, ১৮৭৫ সন।

১৫. এমন একদিন আসছে যেদিন স্বামীকেই সাতসকালে চা তৈরি করে পেয়ালাটি এগিয়ে দিতে হবে স্ত্রীর দিকে। সভয়ে এই সম্ভাবনা কলম এবং তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন তাঁর সচিত্র রচনা 'নারী বিদ্রোহ'-তে। রচনাটি প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রে। ২য় খণ্ড, ১৪ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৬ সাল।

১৬. বিদ্যা। ভারতচন্দ্রের এই নায়িকার সামনে দোয়াত কলম, বই কাগজ। ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বইয়ের অলঙ্করণ। বিদ্যাসুন্দর নাটক, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ; ঈশ্বরচন্দ্র বসু এণ্ড কোং, স্টানহোপ প্রেস, ১৮২ বহুবাজার রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ। ১৮৬৫ সন। ইন্দ্রনাথ মজুমদারের সংগ্রহ।

১৭. 'ওন্ট লিভ এ স্টোন অনটার্ণড্! — কেরাণী? —কেরাণী কি হাতী ঘোড়া? ফুঃ— পুঁটি মাছ, পুঁটি মাছ! এতদিন করিনি তাই।' অফিসযাত্রী মেয়েদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র। 'মেয়েমহল'। বিনয়কুমার বসু অঙ্কিত। মনে হয় শিল্পীই বইটির লেখক। প্রকাশকাল ১৩৩৪ সাল।

১৮. উল্লেখিত 'নারী বিদ্রোহ' থেকে যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা আর একটি তির্যক ছবি : 'কেহ কেহ উকিল হইয়া আদালতে বক্তৃতা করিতেছেন।' কেরানীর মতো উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার মেয়ে সেদিনও অনেক বাঙালি পুরুষের চিন্তার বাইরে।

## কিশোরী ভজনা

রচনার সঙ্গে ছবির সরাসরি যোগ নেই। তবে যে কিশোরীদের নিয়ে এই রচনা ছবির মেয়েরা তাঁদেরই বোন। তার মানে এই নয় যে, ওঁদেরও বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। খেলাঘর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ওঁদেরও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বয়স্ক স্বামীর সংসারে। তবে অনুমান করতে অসুবিধা নেই আজকের তুলনায় ওঁদের কারও কারও বিয়ে হয়েছিল বেশ কম বয়সে। কেননা, যদিও ওঁরা সকলেই শহর এবং শহরতলির বিখ্যাত সব পরিবারের সন্তান, তবু প্রায় সকলেরই জন্ম উনিশ শতকের শেষ পর্বে, অথবা এই শতকের প্রথম দিকে। যদিও মেয়েদের বিয়ের বয়স তখন ধীরে ধীরে বাড়ছে, তবু কম বয়সে বিয়ে দেওয়াই তখনও রেওয়াজ। রচনায় ছবি ব্যবহার করা হয়েছে প্রধানত তিনটি পরিবারের অ্যালবাম থেকে। এক, রামবাগানের দত্ত পরিবার তথা রমেশচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্র দত্তের পরিবার ; দুই, শিবনাথ শাস্ত্রী-বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পরিবার এবং পরিমণ্ডল ; তিন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-নীলরতন সরকারের পরিবার-পরিজন। বাংলা তথা ভারতের নানা সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে এই সব পরিবারের ভূমিকা রীতিমত গৌরবের। ওঁদের তরফে অতএব সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতার প্রশ্নই ওঠে না। ধরে নেওয়া যায় ওই আন্দোলন এবং আইনের আবহমণ্ডলেই কেটেছে ছবির মেয়েদের কৈশোর। কেননা, আইন চালু হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। আর, সবচেয়ে নতুন ছবিগুলোও এই শতকের প্রথম দিকে তোলা। সুতরাং, বলতে গেলে সমকালের আলেখ্যলহরী। এই মেয়েরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ পরিচয়ে বিশিষ্ট। তখনই, অথবা পরবর্তী কালে। তবু ইচ্ছা করেই তাঁদের পরিচয় দেওয়া হল না। অবশ্য ছবি ব্যতিক্রম। পরিচয় উহ্য রাখার কারণ, রচনাটি ওঁদের নিয়ে নয়। ওঁরা এসেছেন তৎকালের প্রগতিশীল পরিবারের প্রতিনিধি হিসাবে, নিছক আসর সাজাতে নয়, সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। লক্ষণীয় ওঁদের পোশাক-আশাক, গয়নাপত্র, চুলের ছাঁদ, শাড়ি পরার

ভঙ্গি, এমনকি চোখের দৃষ্টিও। বোঝা যায়, বাঙালি মেয়েদের একাংশ তখনই সোজাসুজি সামনের দিকে তাকাতে শিখেছেন। স্বামীকে পেছনে দাঁড় করিয়ে রেখে চেয়ারে বসতে পারছেন, কিংবা তাঁর পিঠে হাত রেখে সেজেগুজে পাশে দাঁড়াতে।

১৯, ২০, ২৪, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ নম্বর ছবি বামবাগানের দত্তবাড়ির পুরানো অ্যালবাম থেকে। অভীক সরকারের সংগ্রহ।

২১, ২২, ২৫, ২৬, ২৭ নম্বর ছবি শিবনাথ শাস্ত্রী-বিজয়চন্দ্র মজুমদারের পরিবার এবং পরিমণ্ডল। সেবতি মিত্রের সৌজন্যে।

২৩, ২৮, ৩৫ নম্বর ছবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-নীলরতন সরকার পরিবার-পরিমণ্ডল। পারমিতা বিশ্বনাথনের সৌজন্যে।

২৯. হালিশহরের গুপ্ত পরিবারের রাধাপ্রসাদ গুপ্তের বাবা-মা ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং সাবিত্রীময়ী দেবী। ১৯০৯ সনে বিয়ের সময় ওঁদের বয়স যথাক্রমে ২০/২১ এবং ১২/১৩ বছর। ছবি তুলেছিলেন চিৎপুরের টি· পি· সেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সৌজন্যে।

৩৪. টাকির বসু পরিবারের এক নব-দম্পতি। পার্থ বসুর সৌজন্যে।

## পটের বিবি

৩৬. অনামা ভারতীয় সুন্দরী। কোম্পানি আমল। উত্তর ভারত। লক্ষ্ণৌ অথবা দিল্লি এলাকার ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা। কাঠের ওপর টেম্পারা। ছবির ফ্রেমিং, বিন্যাস, গড়ন এবং বর্ণপ্রয়োগে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। এমনও অসম্ভব নয় যে, ছবিটি কোনও বিদেশী চিত্রকরের প্রতিকৃতি চিত্রের অনুসরণে আঁকা। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

৩৭. কালীঘাটের শিল্পীদের আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি। রঙিন। কাগজের ওপর জলরঙ। উনিশ শতক। কালীঘাটের শিল্পীদের তুলিতে মেয়েরা কেন 'প্রায়শ বিশেষ ভাব এবং ভঙ্গিমায় চিত্রিত সে-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কলির শহর কলকাতায় এঁদের অধিকাংশই প্রমোদ-কন্যা। 'নব বিবি বিলাস'-এ নবীনার প্রতি প্রাচীনার পরামর্শ— 'বেশ্যার শরীরের শোভা শুধু পরের মনোরঞ্জনের নিমিত্তেই, নতুবা তাহার আপন স্বার্থ কেবল বাবুকে কাবু করা মাত্র, অতএব বাবুগণে যাহাতে মোহিত হয়েন তাহাই তুমি করিবা, হাবভাব কটাক্ষ লাবনা দেখাইয়া যাহার যেমন ইচ্ছা হয়।' নববিবি বিলাস; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১৮৩২ সন। এই নাগরিকরা হাসালাসা, কটাক্ষ সাজপোশাক, গীতবাদ্য দেখাইয়া কেমন করিয়া নববাবুদের বশ করত স্ত্রী-শিক্ষা প্রসঙ্গে তার আলোচনা করে গিরিশচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন— 'স্বামীর সহিত আলাপে স্ত্রীর, স্পষ্টাক্ষরে বলিলে দোষ হয়, বেশ্যার ন্যায় আচরণই কর্তব্য। ইহাই হিন্দুশাস্ত্র, যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাঙালি শিক্ষিতা স্ত্রীকে ঘৃণা করেন। এই শাস্ত্র অবহেলাই বঙ্গ যুবকবৃন্দের ব্যভিচারের কারণ।' ('স্ত্রী-শিক্ষা', গিরিশচন্দ্র ঘোষ। সৌন্দর্য, (সংকলন) সম্পাদক—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৩২১ সাল। অমিত রায়ের সংগ্রহ।

৩৮. মর্মর সুন্দরী। ইতালিয়ান মার্বেল। ভাস্কর্য। উনিশ শতক। শ্যামপুকুরের মিত্র বাড়ির সংগ্রহ। আলোকচিত্র : বিপুল গুহ। উনিশ শতকে ইউরোপ থেকে এদেশে অন্যান্য চারু ও কারুশিল্পের নমুনার মতো বাশি বাশি ভাস্কর্যও আমদানি করা হত। কলকাতা ছিল ওই সব পসরার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই শহরে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল সারা ইউরোপিয়ান স্টাইলে এখানেই ভাস্কর্য করাত।

৩৯. ক্যানভাস-এ তেলরঙ। শিল্পী : হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। নীহার চক্রবর্তীর সংগ্রহ।

৪০. রাজস্থানের শিল্পীর কাজ। মতান্তরে বারানসীর। এ-ধরনের কিছু কিছু ছবি নাকি শৌখিন বাঙালি বাবুদের বাগানবাড়িতে ঠাঁই পেত। 'একজন বাঙ্গালী সেই জনশূন্য প্রান্তরস্থিত রম্য অট্টালিকা ক্রয় করিয়া তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পুষ্পে, প্রস্তরপুত্তলে, আসনে, দর্পণে, চিত্রে গৃহ বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার অভ্যন্তরে দ্বিতলস্থ বৃহৎ কক্ষমধ্যে আমরা প্রবেশ করি। কক্ষমধ্যে কতকগুলি রমণীয় চিত্র— কিন্তু কতকগুলি সুরুচি বির্গহিত— অবর্ননীয়।' কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিমচন্দ্র। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহ। সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সৌজন্যে।

৪১. কোম্পানি আমলের প্রতিকৃতির একটি সুন্দর নমুনা। সম্ভবত মুর্শিদাবাদের শিল্পীর কাজ। অথবা উত্তর ভারতের কোনও কেন্দ্রের। পাটনা বা লক্ষ্ণৌর। উনিশ শতক। কাঠের ওপর টেম্পারা। ছবিতে পশ্চিমের প্রভাব স্পষ্ট। স্পষ্ট বোধহয় অ্যালবেট্রিয়ের প্রভাবও। ছবিটি রয়েছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংগ্রহশালায়। এখানে মুদ্রিত Great centres of Art, Calcutta, Ed. Heinz Mode, Halle, 1977 থেকে। এই ছবিটি প্রচ্ছদপটেও মুদ্রিত।

৪২. নায়িকা। অথবা অপ্সরা। পাথর, মেদিনীপুরে পাওয়া। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক। পূর্ণাকৃতি। কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালা। এখানে মুদ্রিত উল্লেখিত Great Centres of Art, Calcutta' থেকে। বিদেশী রসিকেরা এই নারী-প্রতিকৃতিটিকে আখ্যা দিয়েছেন—'ভেনাস অব বেঙ্গল।'

৪৩. সহচরী পরিবৃত রাধাকৃষ্ণ। উনিশ শতকের বাঙালি শিল্পীর আঁকা। কাপড়ের ওপর টেম্পারা। গড়নে, ভঙ্গিমায়, বর্ণপ্রয়োগে এই ছবিতে ইউরোপিয় প্রভাব সুস্পষ্ট। লক্ষণীয়, একজন সহচরীর হাতে রয়েছে বেহালা! রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

৪৪. কালীঘাটের আদলে আঁকা। কাপড়ের ওপর তেলরঙ। উনিশ শতক। কলকাতার বাঙালি শিল্পীর কাজ। এ-ধরনের কাজের আরও কিছু কিছু নমুনা রয়েছে এখানে ওখানে। কানোরিয়া-সংগ্রহ। সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সৌজন্যে। পেছনের মলাটে একই ঘরানার আর একটি ছবি ছাপা হয়েছে। সেটি সুরেশ নেওটিয়ার সংগ্রহ।

৪৫. কোম্পানি আমল। এই বিলাসিনী রাজস্থানের, মতান্তরে বারাণসীর কোনও শিল্পীর কাজ। কলকাতার কাজ হওয়াও সম্ভব। কেননা, অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় এ-ধরনের কাজের নমুনা রয়েছে। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহ। সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সৌজন্যে।

৪৬. সুশীলা সুন্দরী। ইংরেজিতে—'মডেস্টি'।

৪৭. প্রমোদা সুন্দরী।

৪৮. অনুরাগিনী। ইংরেজিতে— 'পিটি'।

৪৯. গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

৫০. গোলাপ সুন্দরী।

৫১. রানী সুন্দরী। চিৎপুরের রঙিন লিথোগ্রাফ। উনিশ শতকের শেষ থেকে এই শতকের প্রথম দিক। চিৎপুরের কাঠ খোদাইয়ের মতোই এসব ছবির অন্যতম প্রেরণা কালীঘাটের পট। বিলিতি 'পিন-আপ'-এর প্রভাবও স্পষ্ট। ছবি ছাপা হত প্রধানত দুটি প্রেসে। চোরবাগান এবং কাঁসারিপাড়ায়। ঠিকানা : Chorbagan Art Studio, 24 Bhoobun Banerjees Lane, Calcutta এবং Kansaripara Art Studio, 26 Kristo Das Pal Lane, Calcutta. জয়পুরের রূপনারায়ণ শাস্ত্রীর সংগ্রহ।

৫২. পরী। কালীঘাটের রেখাচিত্র। উনিশ শতক। রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সংগ্রহ।

৫৩. রাধাকৃষ্ণ। বাংলার মন্দিরে পোড়ামাটির ফলক। লোয়াড়া (Loada)। উনিশ শতক। The Hindu Temple, George Michell, London, 1977 থেকে মুদ্রিত।

৫৪. 'বঙ্গের গৃহলক্ষ্মী'। শিল্পী : বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯৩২) ইংরেজিতে দ্বিতীয় পরিচয়লিপি— 'A daughter of rural Bengal.' পেন্সিল স্কেচ। সম্ভবত কোনও তৈলচিত্রের জন্য প্রাথমিক খসড়া। ১৯১৪ সন। রূপনারায়ণ শাস্ত্রীর (জয়পুর) সংগ্রহ।

৫৫. সেতারবাদিকার মতো এই বীণাবাদিনীও কালীঘাটের শিল্পীদের সৃষ্টি। কাগজের ওপর জলরঙ। উনিশ শতক। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

৫৬. মনে হয় ৩৬ নম্বর ছবির নায়িকারই বোন ইনি। অন্তত ছবির করণ-কৌশল, গড়ন এবং ভঙ্গিমায়। বিদেশী চিত্রকরদের আদলে আঁকা ভারতীয় শিল্পীর কাজ। একটি ছবি রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ। অন্যটি নীহার চক্রবর্তীর।

৫৭. সখীপরিবৃত বিদ্যা ও সুন্দর। লেখা রয়েছে—'শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রা'-এর কৃত/ শ্রীসুন্দর সিদ কাটিয়া বিদ্যার ঘরে উপস্থিত।' চিৎপুরের কাঠখোদাই। উনিশ শতক। সংগ্রাহক—Wieckhorst Karim, Leipzig. Indian Folk Art, Heinz Mode & Subodh Chandra, Newyork, 1985 থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৫৮. বাগানের অলঙ্করণ। উনিশ শতকে এবং এই শতকের প্রথম দিকে ঢালাই লোহার তোরণ, আসন থেকে শুরু করে নানা ধরনের বাহারি সাজ পাওয়া

যেত বাগানের জন্য। এমনকি লোহা এবং ব্রোঞ্জের মূর্তিও। কলকাতায় বাড়ি এবং বাগানবাড়ির এসব সাজসজ্জা বিক্রির জন্য অনেক দোকান ছিল। ছবিটি একটি দোকানের ক্যাটালগ থেকে। W. Leslie Co. Household Hardware, Calcutta, 1914. অমিত রায়ের সংগ্রহ।

৫৯. দুই গোলাপবালা। ক্যানভাস-এ তেলরঙ। কালীঘাটের স্টাইলে আঁকা। কলকাতা। উনিশ শতক। Great centres of Art, Calcutta. Ed Heinz Mode, Halle, 1977.

৬০. অনেকটা একই ধরনের ছবি। কালীঘাটের রূপকল্প অনুসারী। কাপড়ের ওপর তেলরঙ। কলকাতা। উনিশ শতক। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের সংগ্রহ।

৬১. বিরহিনী রাধা। অথবা হারেম-সুন্দরীর অঙ্গরাগ। কুঁড়েঘর, লাউগাছে বাংলার পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা। মিনিয়েচারের আদলে কাঠখোদাই। বাংলা। উনিশ শতক। মনে হয় ছবিটি ছিল কোনও বইয়ের অলংকরণ। মেটাল এনগ্রেভিং। জয়পুরের রূপনারায়ণ শাস্ত্রীর সংগ্রহ।

## বিবাহ করিব সুখে ইংরাজ-ললনা

৬২. সাহেব মেমদের আপ্যায়ণের জন্য এদেশের ধনী এবং সম্ভ্রান্তরা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে মাঝে মাঝে যেসব নাচের আসরের আয়োজন করতেন সে-উপলক্ষে ছদ্মনামা ইংরেজ কবির লেখা ব্যঙ্গাত্মক কবিতার অলংকরণ। প্রাসঙ্গিক ছত্রগুলো হচ্ছে— 'The Rajah, he bowed, and bowed, and he bowed,/ Shaking hands as they came with whole of the crowd,/ and he led the Commissioner's wife,/ and said. 'twas the happiest hour of his life...' Lays of Ind, Aliph Cheem, 1888 (Illustrated by the Author, Lionel Inghis, R. A. Sterndale and others.)

৬৩. একই বই থেকে আর একটি অলংকরণ। এ-ছবির নায়কও একজন রাজা, —'Rajah Kistnamah Howdie Doo' বিলিয়ার্ড খেলার পরবর্তী দৃশ্য ছিল— মেম তাঁকে ফুল উপহার দিচ্ছেন।

৬৪. কল্পনা ও বাস্তব। বিদেশিনী তরুণীর স্বপ্নের রাজকুমার। সুবেশ যুবা। স্বাস্থ্যবান সুন্দর চেহারা। মাথায় তাজ। হাতে বর্শা। সুসজ্জিত ঘোড়া। এই ছবির নীচে আর একটি ছবিতে দেখানো হয়েছিল বাস্তব পরিস্থিতি। নেংটি-পরা প্রিন্স খাটিয়ায় পড়ে আছেন। পাশে লোটা, হুকো। দরজায় বসে ঢোলক বাজাচ্ছে আর একজন খালি-গা লোক। মেম সাহেবদের সতর্ক করে দিচ্ছিলেন উদ্বিগ্ন অভিভাবক এবং ইংরেজটোলার সমাজপতিরা। The Indian Charivari or The Indian Punch, May 28, 1875.

৬৫. এ-ছবির বিষয়বস্তুও একই— খবরদার, নেটিভদের কাছে কখনও হৃদয়-মন সমর্পণ করো না। করলে কী ধরনের গার্হস্থ্যজীবন অপেক্ষা করে আছে তারই নমুনা। খালি-গা, খাটো ধুতি, পায়ে চটি, হাতে হুঁকো। এই স্বামীকে নিয়ে বিপন্ন বিদেশিনী স্ত্রী। ছবির পরিচয়— 'A Native Idea of a married Life.' ব্যাখ্যা— 'The experience which Natives had of their married life with English Ladies will, without meaning any offence to these ladies, be a sufficient warning for us.' Vide Hindoo Patriot. The Indian Charivair or The Indian Punch, May 31, 1876.

৬৬. ইংরেজ এবং ভারতীয়দের সামাজিক মেলামেশার এই কাল্পনিক চিত্রটির পরিচয় —'A vision of the Future.' ব্যাখ্যা— 'When Native women are emancipated and educated, Young Bengal will not be Bumptious, and English men and women will be charmed to meet him and his wife on equal terms.'— Daily News. এ-ছবিটিও উল্লেখিত 'ইন্ডিয়ান পাঞ্চ' থেকে (১৬ আগস্ট, ১৮৭৮) নেওয়া।

৬৭. মিস জেসমিনাকে নিয়ে বাইরে যেতে যাচ্ছেন বাবু হরিবংশ জব্বরজি। পথে একজনের সঙ্গে দেখা। বাবু ভাবছেন— 'Some naughty masculine might insult her under my very nose!' Baboo hurry Bungsho Jabberjee, B. A. F. Anstey (Author of Vice Versa, The Tinkel Venus, The Black Poode etc.), Newyork, 1897.

৬৮. মেমসাহেবদের জন্য। অনেক বিজ্ঞাপনের একটি। এই সব সাজে সেজে ছবির মেয়েরা একদিন ঘুরে বেড়াতেন কলকাতার পথে ঘাটে মাঠে। দার্জিলিঙে, সিমলায়। বাঙালিবাবু থেকে থেকে আনমনা। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের মেম-দর্শনের অভিজ্ঞতা। 'এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই! শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার বিশ্বাস, ইংরাজ মেয়ের মত সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। ননীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা, এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র— দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।' (য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি) এখানে অনেক বাঙালি-বাবুও হয়তো একদিন মনে মনে এমনই রূপসাগরে ভাসমান। সাহেবি দোকানের ক্যাটালগ থেকে। Army and Navy Store Ltd, 41 Chowringhee, Calcutta. 1936-37. অমিত রায়ের সংগ্রহ।

৬৯. মর্মর-সুন্দরী। এককালে ধনী এবং শৌখিন বাঙালির বাড়ি এবং বাগানে এইসব মূর্তি ছিল বলতে গেলে অপরিহার্য। মার্বেল প্যালেস, কলকাতা। ছবি: তারাপদ ব্যানার্জি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ শুকিয়ে যাওয়া বাগানের বিবরণ মনে পড়ে। 'লতামণ্ডপ সব ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে— প্রস্তর-মূর্তিসকল দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে— তাহার উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা বা ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে।— একটা ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির পদতলে গোবিন্দলাল বসিলেন।' অনেক বাগানই আজ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু উনিশ শতকের স্মৃতি এখনও ধরে রাখতে পেরেছেন কেউ কেউ। যথা: মার্বেল প্যালেস-এর উত্তরাধিকারীরা।

৭০. মিস উই-ই উই-ইকে নিয়ে জব্বরজি। ওঁরা শেক্সপিয়রের বাড়ি দেখতে চলেছেন। জব্বরজির উক্তি— 'It was here, I said, reverently that the swan of Avon was hatched.' উল্লেখিত 'বাবু হরিবংশ জব্বরজি বি. এ'-র আর একটি অলংকরণ।

৭১. মেম এবং মহারাজার এই ছবিটি টপহাম পিকচার লাইব্রেরির সৌজন্যে ছাপা হয়েছে একটি বিদেশী বইয়ে। সেখান থেকে পুনর্মুদ্রিত। ছবির পরিচয়— Maharajah of Baroda with Showgirl 'Lovelies'. প্রসঙ্গত লেখিকা ভারতীয় রাজা-রাজড়াদের মেম ঘরনী সংগ্রহের অনেক খবর দিয়েছেন। যথা: যেমন কাপুরথালার যুবরাজ বিয়ে করেছিলেন ফরাসি-শিক্ষিত বিদেশিনী বৃন্দাকে। কোচবিহারের মহারাজার ঘরনী হয়েছিলেন জিনা এগান। যোধপুরের মহারাজার দ্বিতীয়পক্ষ ছিলেন সানড্রা ম্যাকব্রাইড। পাতিয়ালার এক মহারাজা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য— 'To English women he was an Arabian Nights figure. In his heyday he liked a virgin a day, but in old age cutdown to one a week.' Highness, The Maharajahs of India, Ann Morrow, London, 1986.

## সেদিনের দিশি মেমরা

৭২. ছবির পরিচয় লিপিতে বলা হয়েছে: "রং কোঅপারেশন/ Colour Scream/ Wrong Co-operation/ The times are changed and we are changed with them." নব হল্লোড়/ Reform Screams. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। Published for the Artist By Thacker Sprink & Co, 1921. এই ছবিটির রকমফেরও দেখা যায়। কোনওটিতে পুরুষটির গায়ের রঙ কালো, মেয়েটির ফর্সা, কোনওটিতে ঠিক তার উল্টো।

৭৩. মৃণালিনী সেন (১৮৭৯-১৯৭২) নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন— 'I was married at 13 and became a widow at 15. After the appearance of my first book I took seriously ill and many things happened afterwards. Eventually I left my home and purdah and married again before I was 26... At last my wish was fulfilled. Life with different kinds of activities and interest preventing me from pursuing my literary carrier... I had three daughters and a son, Sreelata, Arati, Anjali, and Nirmalaya and they all went to England with us, where we stayed for sixteen years." Knocking at the Door/ Mrinalini Sen, Calcutta, 1954.

বাঙালি মেয়েদের মধ্যে ইনিই প্রথম উড়োজাহাজে (এরোপ্লেন) চড়েছিলেন ১৯১০ সনে। মৃণালিনী সেনের ছবিটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (১৩৫৭) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

৭৪. তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) ছবি Life and Letters of Toru Dutt, Harihar Das, London, 1921 থেকে নেওয়া। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

৭৫. কামিনী কুন্তল, লেখক ও চিত্রকর যতীন্দ্রকুমার সেন। মানসী ও মর্মবাণী, ১১ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২৬। মূল রচনায় আরও কিছু কিছু খোঁপার ছবি রয়েছে। ছাপা হয়েছে নির্বাচিত কুড়িটি।

৭৬. যতীন্দ্রকুমার সেনের উল্লেখিত রচনার একটি অলংকরণ। পরিচয়লিপিতে বলা হয়েছে : 'বব্‌ছাঁটা চুল। কি সুন্দর আহা মরি/ ইচ্ছে হয় যে বিয়ে করি।'

৭৭. 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদী পিসী/ তার under-এ কলম পিষি।' (তাজ্জব ব্যাপার)। মেয়েদের চাকুরি-করা নিয়ে যতীন্দ্রকুমার সেনের এই ব্যঙ্গাত্মক ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায়। নারীবিদ্রোহ, যতীন্দ্রকুমার সেন, মানসী ও মর্মবাণী, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৬ সাল।

৭৮. চুরুট মুখে আধুনিকার এই ছবিটিও ছিল যতীন্দ্রকুমার সেনের উল্লেখিত রচনার অলংকরণ। আধুনিক বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে চুরুট খান নাকি দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং প্রসন্নকুমার রায়ের স্ত্রী সরলা রায়।

## কালা বিবি

৭৯. ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডির এই তৈলচিত্রটি আঁকা হয় কলকাতায়, ১৭৮৭ সনে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৮০. টমাস হিকিও ওই ছবিটি আঁকেন কলকাতায়, ১৭৮৭ সনে। ছবিটি এখন রয়েছে ডাবলিনের ন্যাশনাল গ্যালারি অব আয়ার্ল্যান্ড-এ।

৮১. লাহোরে কোনও ভারতীয় শিল্পীর আঁকা। ছবিতে আরবি হরফে যা লেখা রয়েছে তার মর্ম : 'Painted at Lahore, 1838 AD./ General Allard Sahib Bahadur, formerly a Commander of France, assigned to the Army of Maharaja Ranjit Singh, may he rest in peace./ To the most generous Maharaja Ranjit Singh Bahadur in Province of Punjub.' ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৮২. বিবি অম্বর কাউর-এর এই প্রতিকৃতিটি ১৭৯২ সনের। আঁকা হয় পুনে শহরে। এখন রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে।

৮৩. লন্ডনে কলোনিয়াল অ্যান্ড ইন্ডিয়া এগজিবিশন হয় ১৮৮৬ সনে। ১৮৯৩ সনে ওসবোর্নে আয়োজিত হয় আর এক উৎসব। তাতে ভারতীয় গায়ক নর্তকীরাও যোগ দিয়েছিলেন। মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ার আগে তাঁদের একদলকে বিশ্রাম করতে দেখা যাচ্ছে। অনেক কৌতূহলী দর্শক নাকি ছিল সেদিন এই সুন্দরীদের ঘিরে। ছবিটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল 'ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ'-এ। India in Britain, Kusoom Vadgama, London, 1984 থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত।

৮৪. ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডির আঁকা এই ছবিটি রয়েছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দেওয়ালে। এটি আঁকা হয়েছিল সম্ভবত লক্ষ্ণৌতে, ১৭৯৪-৯৫ সনে।

৮৫. এই ছবিটিও আঁকা হয় লক্ষ্ণৌতে, ১৭৮৬ সনে। ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৮৬. ফ্রান্সেকো রেনাল্ডির আঁকা পামার-পরিবারের এই প্রতিকৃতি-চিত্র এখন রয়েছে লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে।

৮৭. বাংলার মন্দির অলংকরণ। রাজরাজেশ্বর মন্দির। কড়ুলপুর, হুগলি। অষ্টাদশ শতক। ছবি : হিতেশরঞ্জন সান্যাল।

৮৮. পোড়ামাটির ফলক। রাধাগোবিন্দ মন্দির, আটপুর, হুগলি, ১৭৮০। ছবি : হিতেশরঞ্জন সান্যাল।

৮৯. নাচের আসরে ডেভিড অক্টারলনি (১৭৫৮-১৮২৫)। ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা। দিল্লি, ১৮২০। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লন্ডন।

৯০. ক্লদ মার্টিনের পুত্র জেমসকে নিয়ে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছেন জেনারেলের প্রিয় সঙ্গিনী বোলন। ছবিটি আঁকা হয় ১৭৯৪-৯৫ সনে। এখন রয়েছে লক্ষ্ণৌর লা মার্টিন কলেজে।

৯১. ঢাকার এই রূপসীও ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডির আঁকা। ১৭৮৯ সন। ইয়েল সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্ট, পল মেলন কালেকশন।

৯২. টিলি কেটল এর আঁকা তৈলচিত্র অনুসরণে ভারতীয় শিল্পী। সাহেবদের নকল করবার এ ধরনের আরও অনেক নমুনাই রয়েছে। বিদেশী শিল্পীরা প্রতিকৃতি আঁকতেন সাধারণত তেলরঙে ক্যানভাস-এর উপর। ভারতীয় শিল্পীরা কাগজে টেম্পারা বা গুয়াশ এ। লক্ষ্ণৌ, ১৮৮০।

৯৩. টিলি কেটল এর অনুকরণে ভারতীয় চিত্রকরের আঁকা আরও একটি ছবি। মিলড্রেড আর্চার এর সংগ্রহ।

৯৪. কনের হাট। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ব্রিটেনের কন্যাদায়গ্রস্ত বাবা-মা তাঁদের মেয়েদের ভারতে পাঠিয়ে দিতেন বর খোঁজার জন্য। ওই সব জাহাজকে রসিকতা করে বলা হত 'ফিশিং ফ্লিট'। তা নিয়ে সমসাময়িক কালে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছে। আঁকা হয়েছে কিছু কিছু ছবিও। যেমন এই ছবিটি। এই রঙিন লিথোগ্রাফটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮০০ সনে। পরিচয়লিপি ছিল 'Sale of English beauties.' লেডি ফকল্যান্ড নামে সমসাময়িক কালের এক মহিলা দৃশ্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন— 'the arrival of a cargo (If I dare term it so) of young damsels from England is one of the exciting events that mark the advent of cold season.' Festival of India in the United states 1985-1986, Ed. Lory Frankel, Newyork, 1985 থেকে।

৯৫. ছবিটি নেওয়া হয়েছে Indian Folk Art, Heinz Mode and Subodh Chandra, Newyork, 1985 থেকে। শিল্পীর নাম বলেছেন ওঁরা গোবিন্দচন্দ্র রায়। দৃশ্যটিকে বলা হয়েছে গ্রামীণ চড়ুইভাতি, 'এ রুরাল পিকনিক'। মনে হয় দুটি তথ্যই ভুল। লিপি অবশ্য পুরোপুরি পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। শিল্পী সম্ভবত গোবিন্দ কর্মকার। আর দৃশ্যটি— 'কলি রাজার সভা'। সাহেববেশে কলি রাজা এবং তাঁর সম্মানে দেশীয় রাজন্যবর্গ আয়োজিত নৃত্যগীত সভা। চিৎপুরের কাঠখোদাই। উনিশ শতক। লাইপজিগ-এ একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

৯৬. উনিশ শতকে তো বটেই, এই শতকের প্রথম দিকে ইউরোপের নানা দেশ থেকে আমদানি করা হত চিনেমাটির বাহারি সব পুতুল। বিষয়বস্তু হিসাবে ভারতীয় দেবদেবীরাও বাদ পড়েননি। এখানকার চাহিদার কথা চিন্তা করে ভারতীয় নকশা অনুযায়ী সেসব তৈরি হত। ইউরোপীয় বাহারি পুতুলের বিশেষ ব্যবহার ছিল ধনী এবং শৌখিনের গৃহসজ্জায়। দ্বিতীয়, বড় ঘরে কম বয়সের কনেদের খেলার সঙ্গী ছিল এইসব পুতুল। শোনা যায় বিয়েতে উপহার দেওয়ারও রেওয়াজ ছিল। আলমারিতে চিনেমাটির বিদেশিনী সুন্দরীদের সাজিয়ে রাখার মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগের প্রজাকুলের অন্য কোনও মানসিকতা ক্রিয়াশীল ছিল কি না কে জানে! বীনা মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

৭৯, ৮০, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯০, ৯১ নম্বর ছবি পুনর্মুদ্রিত India and the British Portraiture, Mildred Archer, London, 1979 থেকে। ৮১, ৮৯, ৯২, ৯৩ নম্বর ছবি নেওয়া হয়েছে Room For Wonder, Indian Painting during Brish period 1760-1880, Stuart Cary Welch, Newyork, 1978 থেকে।

## পরিণয়ে প্রগতি

৯৭. বাংলার শাড়ি যেন বাংলার নদী। শাড়ির পাড় দুটি নদীর দুই কূল, আঁচলটি মোহনা। উনিশ শতকে বাঙালি মেয়েদের পোশাক নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চললেও শাড়ির মর্যাদা ছিল বলতে গেলে অপরিবর্তিত ; নদীর ধারা দিকবদল করেছে, এই যা। সুভো ঠাকুরের সংগ্রহ। সিদ্ধার্থ ঠাকুরের সৌজন্যে।

৯৮. 'কসাইয়ের ব্যবসা, পুত্রগণ। বর তৌলে সোনারূপা, তৈজসপত্র লইলেন, চুক্তি, কন্যাকর্তা যথাসর্বস্ব দিয়াও কুলাইতে না-পারায় ছেঁড়া জুতা ঝাঁটা বাহির করিয়াছেন।' ব্যঙ্গচিত্র। বঙ্গনিবাসীর ক্রোড়পত্র। ২ চৈত্র, ১৩০১ সাল।

৯৯. 'ইয়েস, দ্যাটিস লাইক এ গুড বয়।— হাঁ, ইহাই ঠিক সুবোধ বালকের মত।' মেয়েমহল, বিনয়কুমার বসু অঙ্কিত, ১৩৩৪ সাল। বইটির লেখকও শিল্পী নিজেই। মেয়েদের জবানিতে তিনি লিখছেন— 'তোমরা কনে দেখিতে গিয়া আমাদের বড় কষ্ট দিতে, এখন হইতে আমরা বর দেখিতে যাইব।— তোমরা আমাদের বিবাহ করিয়া হড় হড় করিয়া

টানিয়া আনিতে, ··· তাহা আর হইবে না, এখন হইতে আমরাই পুরুষ-রূপ অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বিজয় গর্বে গৃহে ফিরিব।'

১০০. 'দেবী দর্শন/ Respecting Women.' বিরূপ বজ্র/ শ্রীগগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।/ Birupa Bajra/ G. Tagore./ Published By Preonath Dasgupta/ The Indian Publishing House.

১০১. Women in Bengal, Margaret M. Urquhart, Calcutta, 1925 থেকে পুনর্মুদ্রিত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে বসা এই তিন ভদ্রমহিলার পরিচয় আমাদের জানা নেই। তবে বোঝা যায় বাইরে বের হবার এই স্বাধীনতাটুকু তাঁরা পুরোপুরি উপভোগ করছিলেন। মায়াসুন্দরী নামে এক মহিলা প্রশ্ন তুলেছিলেন— নারীর জন্ম কি অধর্ম? (বঙ্গ মহিলা, শ্রাবণ, ১২৮২) তাঁর খেদ— 'স্ত্রীলোকের কিছু লেখিবার হুকুম নাই। কলিকাতায় গঙ্গার উপর পুল নির্মান হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিন্তু আমাদের শোনাই সার হইল, একদিনও চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারিলাম না। গোলাম মুরশিদের 'সংকোচের বিহ্বলতা'য় (ঢাকা, ১৯৮৫) উদ্ধৃত।

১০২. সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২)। কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা। কোচবিহারের রানী। ভিক্টোরিয়ার জুবিলিতে (১৮৮৭) স্বামীর সঙ্গে বিলাত গিয়েছিলেন এই পোশাকে। ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে তিনি প্রথম সি-আই-ই। তাঁর সম্পর্কে ভিক্টোরিয়ার উক্তি— 'She is very pretty and attractive... such a dear, gentle woman!' ওঁর বোন ময়ূরভঞ্জের রানী সুচারু দেবী (১৮৭৪-১৯৬৭) নাকি শাড়ি পরার ব্যাপারে জ্ঞানদানন্দিনীর উদ্যোগকে স্থায়িত্ব দিয়েছিল ঢঙে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে। India in Britain, Kusoom Vedgama, London, 1984 থেকে সুনীতি দেবীর ছবিটি পুনর্মুদ্রিত।

১০৩. 'সিক্তবসনা' শুধু হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার নন, তৎকালে আরও অনেক বাঙালি শিল্পীর কাছে ছিল প্রিয় রূপকল্প। ১২২১ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সৌন্দর্য' নামে একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। বইটি আমার নজরে আনেন অমিত রায়। আলোচ্য বিষয় নারীর রূপ। এমনকি রূপচর্চাও বাদ পড়েনি। লেখকরা সবাই বিশিষ্ট এবং সুপরিচিত। শিল্পীরাও যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। শিল্পী তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন কে· ভি· সেন, এন· সরকার, হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বি· দত্ত, পি· জি· দাস, ভবানীচরণ লাহা এবং বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের আঁকা ছবির মধ্যে রয়েছে স্নানার্থী নারীর ছবি। সেটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পুকুর এবং নদীর ঘাটে রূপপিয়াসী চোখ অপলক তাকিয়ে আছে সেই কবে থেকে। মনে পড়ে বিদ্যাপতিকে, —'আজু মঝু শুভদিন ভেলা/ কামিনি পেখল সনানক বেলা।' ইত্যাদি। কিংবা চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত ছত্র— 'চলে নীল শাড়ি/ নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি/ পরাণ সহিতে মোর।' হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের এই ছবিটি শীতল চৌধুরীর সংগ্রহ।

১০৪. 'Three Hindu Students, Anna, Raji and Rabi. The two girls Anna and Raji are students of Orphan Girls school, Burdwan, 1850. উড এনগ্রেভিং। রূপনারায়ণ শাস্ত্রীর (জয়পুর) সংগ্রহ। মনে হয় ছবিটি আসলে ছিল কোনও বইয়ের অলংকরণ।

১০৫. কলকাতায় বিদেশী সাবানের বিজ্ঞাপন। নতুন যুগের প্রসাধনীর হাতছানি। আধুনিকা বঙ্গনারী বোধহয় সেদিন মনে মনে চঞ্চল। তেল, হলুদ, বেসম, চন্দন যোগে সাবানের সঙ্গে লড়াইয়ের চেষ্টা হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু পরাজয় এড়ানো যায়নি। উল্লেখিত 'সৌন্দর্য' শীর্ষক সংকলনটিতে অমৃতলাল বসু একটি রচনায় প্রশ্ন তুলেছেন— "তেল হলুদকে 'গো টু হেল' করিয়া ভেল মিশন সাবান মাখিব।' কিন্তু একই বইয়ে পদ্য রচনায় তিনি লিখছেন— 'কেশে কুন্তলীন গন্ধ/ বাতাসে ভাসিবে মন্দ,/ গীত ছন্দ সনে হবে মধুর মিলন/ যাপিব যামিনী সারা করে জাগরণ।' কেশে যদি কুন্তলীন তবে অঙ্গেই বা কেন নয় গুডউইনস!' ছবিটি কলকাতার সাহেবি দোকানের ক্যাটালগ থেকে। Hall & Anderson Ltd, Calcutta. Price List No- 75, Season 1929-1930, অমিত রায়ের সংগ্রহ।

১০৬. 'ভাল কথা, chypre ছাড়া তোমার কি সুগন্ধ পছন্দ হয় বল দেখি। আমার নিজের ওর চেয়ে অসলে White Rose ভাল লাগে বোধহয়। কিন্তু শাস্ত্রে বলে আপ রুচি খানা, পর রুচি পেননা, তাই জিজ্ঞেস করছি। তাছাড়া আমি কোন পুরনো স্মৃতি উদ্রেক করতে চাইনে, সুখের হলেও।' বিয়ের আগে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন ইন্দিরা দেবী। বড়ঘরে, বোঝা যায় চন্দন আতর মাখামাখা গোলাপজলের দিন ফুরিয়েছে। আধুনিকারা পশ্চিমের প্রসাধনীর পৃষ্ঠপোষণা করছেন। কিছু কিছু দিশি কোম্পানিও তখন অবতীর্ণ হয়েছিল আমদানি করা পশ্চিমী প্রসাধনীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায়। পশ্চিমী এই সুগন্ধীর বিজ্ঞাপনও উল্লেখিত ওই ক্যাটালগ থেকে।

১০৭. যার অঙ্গে যত বেশি গহনা সে তত সুন্দরী, কিংবা গরবিনী, ক্রমে এ-ধারণাও বদলাতে শুরু করে। উনিশ শতকের শেষদিকে আধুনিক বাঙালি মেয়েরা মেনে নেয়, সোনার ওজনে নয়, অলংকারের সৌন্দর্য তার সুচারু ডিজাইনে। 'Newspapers were filled with advertisements for the new type of jewelry, Hamiltons the most famous jewelers in Calcutta, had illustrated advertisements of latest fashions, including dangling gold earrings from 20 to 40 rupees, broad gold band bracelets from 120 to 200, and engroved gold lockets from 16 to 50 rupees.' The changing role of women in Bengal, 1849-1905, Meredith Borthwick, Princeton, 1984 এসব উনিশ শতকের আটের দশকের সমাচার। সমসাময়িক ইউরোপীয় কানের গহনা এবং পিন-এর নমুনাগুলো হ্যামিলটন-এর ক্যাটালগ নয়, অন্য একটি বই থেকে সংগৃহীত। Hand Book of Ornament, Franz Sales Meyer, London, 1888.

১০৮. ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)। পেন্সিল স্কেচ। শিল্পী অতুল বসু (১৮৯৮-১৯৭৭) তাঁর এই প্রতিকৃতিটি আঁকেন ১৯২৩ সনে। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর বিয়ে ১৮৯৯ সনে। বিয়ের আগে ওঁরা পরস্পরকে চিঠি লিখতেন। চিঠিতে যেসব সম্বোধন ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে ছিল— Mon Ami, Romes Mis, Mia Carisima, Romio Mio, বিবি, বাবু, বি, সখি, বঁধু, তোমার বঁধু, এমনকি চণ্ডি! বোঝা যায় রোমান্টিক প্রেমের উন্মেষ শুধু বাংলার সাহিত্যে নয়, বাঙালি জীবনেও ঘটছে। এই চিঠিগুলো সেদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্রষ্টব্য— ইন্দিরা দেবী প্রমথ চৌধুরী পত্রাবলী— সংকলন ও সম্পাদন সুভাষ চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৮৫। সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রিয়ম্বদা দেবী-ওকাকুরা পত্রাবলীও। কিছুকাল আগে জাপানে পত্রগুলোর জাপানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। Ho seki-No- Koetaru Hito-E, Tr. Makato Ohoka, Tokyo, 1982. তাতে ৩১টি চিঠি রয়েছে। ১২টি ওকাকুরার লেখা, ১৯টি প্রিয়ম্বদার। প্রিয়ম্বদা ওকাকুরাকে সম্বোধন করতেন 'ডিয়ার ফ্রেন্ড' বলে, ওকাকুরা চিঠি শুরু করতেন— 'ডিয়ার জুয়েলভয়েসড' দিয়ে। এই চিঠিগুলোর গুরুত্ব: প্রিয়ম্বদা দেবী বিধবা, এবং ওকাকুরা যখন কলকাতায় (১৯১৩) তখন তিনি বিবাহিত ও কন্যার জনক। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। সন্দেহ কী, এই সনাতন সমাজে সেদিন শন্ শন্ বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। এই পত্রাবলী এবং তার অনুবাদ সম্পর্কে আমাকে টোকিও থেকে এক চিঠিতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩) বিস্তারিত অবহিত করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অমলেন্দু দে। প্রকাশ কেজরিওয়ালের সংগ্রহ।

## মলাটের ছবি

সামনে: Great Centres of Art, Calcutta. Ed. Heinz Mode, Halle, 1977 থেকে নেওয়া। দ্রষ্টব্য ৪১ নম্বর ছবি। বইটিতে এই ছবি সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'She is shown in reposeful contemplation as if lost in a reverie while posing before the painter. Such idealization of a woman vividly envisaged recalls the creation of European masters like Ingres and Bacciarelle—choing the style of Lucknow and Patna'। মূল ছবি রয়েছে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি সংগ্রহশালায়। ছবি: বিবেক দাস।

পিছনে: কালীঘাটের পটের আদলে কাপড়ের ওপর টেম্পোরায় আঁকা বাঙালি সুন্দরী। এ-ধরনের আর একটি নমুনা ৪৪ নম্বর ছবি। উনিশ শতক। কলকাতা। সুরেশ নেওটিয়ার সংগ্রহ। ছবি: বিবেক দাস।

# নির্ঘণ্ট

পাসকরা মাগ।

( সামাজিক প্রহসন )

কলকাতা একটিই, তা বলে সারাক্ষণ, সর্বত্র সে আর সে একই রকম নয়। পল্লীতে পল্লীতে, মরশুমে মরশুমে, যুগে যুগে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার নানান চেহারা। আর কলকাতার এই বিচিত্র ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতির দালানকোঠায় আপন মনে আপন বশে ও আনন্দে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁদের উজ্জ্বল একজনের নাম, তাবী মুক্তপুরুষ কারণেই — শ্রীপান্থ।

শ্রীপান্থ পেশায় সাংবাদিক, নেশায় সমাজ-ঐতিহাসিক। যেহেতু কলকাতাই তাঁর প্রকাশ, তাই দু আড়াইশ বছরের ইতিহাসের মধ্যে তাঁর ঘোরাফেরা। তাঁর যাতায়াতের সীমা উপসীমাও বলা যেতে পারে, চিৎপুর থেকে টালিগঞ্জ। এবং, বড়জোর, বারুইপুর থেকে ব্যারাকপুর। কিন্তু এই সীমাকেই তিনি অসীম করেছেন পনের বিশটি স্মরণীয় গ্রন্থে। কথায় বলে 'শ্রীপান্থর কলকাতা'। আসলে এটি তাঁর একটি বইয়ের নাম। অন্য বইয়ের মধ্যে — 'যখন ছাপাখানা এলো', 'এলোকেশী মোহন্ত সম্বাদ'। বটতলার কাঠখোদাই নিয়ে দীর্ঘ রচনা আছে তাঁর। লিখেছেন প্রথম মুদ্রিত বই হালেদের ব্যাকরণ নিয়েও। সে সব রচনা বাঙালির কলকাতাচর্চাকেও কোনও না কোনও ভাবে উপকৃত, প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু কলকাতার বাইরেও সময় সময় যাতায়াত করেছেন 'ঠগী', 'দেবদাসী', 'হারেম', 'মঙ্গল পাণ্ডের বিচার' ইত্যাদি গ্রন্থে। কী কলকাতা, কী অন্যের ইতিহাস, শ্রীপান্থ যা নিয়েই লিখুন তিনি তাতে তত্ত্ব ও তথ্যের একটা অসাধারণ অন্বয় গড়ে তোলেন। আর লেখেন এক নিপুণ, অননুকরণীয়, রসাল কলমে। তাঁর প্রথম যৌবনে লেখা প্রথম বই 'আজব নগরী' থেকেই তিনি কলকাতাপ্রেমী ও ইতিহাসমনস্ক পাঠকসমাজকে জয় করে রেখেছেন। কালে কালে বিষয়গাম্ভীর্য বৃদ্ধি পেলেও তাঁর রচনাকৌশল থেকে গেছে পূর্ববৎ — সরস, নিপুণ। সাতটি রচনা সম্বলিত বর্তমান গ্রন্থটিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর মননের ফল।

শ্রীপান্থর জন্ম ১৯৩২ এ, ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরে। লেখাপড়া ময়মনসিংহ ও কলকাতায়। লেখালিখির শুরু কলকাতায়, ছাত্রজীবনেই। কলকাতা ও ইতিহাসের বাইরে আরও চারটি প্রকট নেশা — বই, সিগারেট, আড্ডা আর শিল্পকলা।

প্রচ্ছদ
সামনে : বঙ্গ সুন্দরী। উনিশ শতকের রঙিন ছবি। হাজারদুয়ারি, মুর্শিদাবাদ।
পেছনে : বঙ্গ সুন্দরী। কালীঘাটের পটের আদলে রঙিন ছবি। উনিশ শতক। কলকাতা।
আলোকচিত্র : বিবেক দাস।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা : সন্তোষ দত্ত, বিপুল গুহ